কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৪৫
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৪৫

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1448-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি ও বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-45
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

পঁয়ত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩০/-

বড়দিনের ছুটি

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

টেলিফোনে কথা বলছেন রবিনের আম্মা মিসেস মিলফোর্ড। কিশোরের চাচীর সঙ্গে। এবারকার বড়দিনে বড় করে একটা পার্টি দিতে চান কয়েক জন বান্ধবী মিলে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শ'খানেক মাংসের বড়া হলেই চলবে,' মেরিচাচীকে বললেন মিসেস মিলফোর্ড। 'মুসার আম্মাকে বলেছি অ্যাপল পাই আর কেক আনতে। মুরগী-টুরগী আর বাকি যা যা দরকার, আমি ব্যবস্থা করব।'

ফোনে কথা বলতে বলতে অবচেতন ভ াবেই তাঁর আঙুলগুলো খেলা করছে বসার ঘরের কোণে বসানো ক্রিস্টমাস ট্রী'র একটা ডেকোরেশন নিয়ে।

'রবিন তো বলছে, গাঁয়ের সব লোককে দাওয়াত করতে।'

বিরাট ডেস্কটার ওপাশে বসে থাকা ছেলের দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি হাসলেন তিনি। 'কিন্তু সেটা কি আর সম্ভব? যাই হোক, যত বেশি সম্ভব মানুষকে দাওয়াত করব। চেনাজানা কাউকে বাদ দেব না। ঠিক আছে, রাখি এখন। মুসার আম্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

লাইন কেটে দিয়ে মুসাদের নম্বরে ডায়াল করলেন তিনি। 'কে, মিসেস আমান? ...'

লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। বসে আছে। বাইরে বেরোনোর অপেক্ষায়। কিন্তু সেই যে তখন থেকে বলেই চলেছেন মা, চলেছেনই। থামাথামি আর নেই। তারপর রবিনের মতে অনন্তকাল পার করে দিয়ে রিসিভার রেখে যেই সরে আসতে যাবেন, ওর দুর্ভাগ্য—আবার বাজল টেলিফোন। ছোঁ মেরে তুলে নিলেন তিনি। 'কে? ও, মিসেস ডানকান...হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি তো পার্টি...'

আবার চলল কথা।

রবিন অপেক্ষা করছে বাজারে যাওয়ার জন্যে। পার্টির জন্যে প্রচুর জিনিসপত্র কিনতে হবে। লম্বা লিস্ট করেছেন মা। টাকাও দিয়ে দিয়েছেন। টেবিলে পড়ে আছে ওগুলো। তালিকায় কিছু বাদ পড়ল কিনা শেষ মুহূর্তে আরেকবার চেক করতে হবে। মা না বললে আর বেরোতে পারছে না রবিন।

মিসেস ডানকানের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, এই সময় আবার বাজল টেলিফোন। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে হাতের ইশারায় রবিনকে অপেক্ষা করতে বললেন তিনি।

আর কোন কাজ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে টেবিলে রাখা একটা কয়েন তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে ঘোরানো শুরু করল রবিন। কতটা বেশি সময় ধরে ঘোরাতে পারে সেই চেষ্টা।

অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো-বুড়ি যাঁরা দাওয়াতে আসবেন, তাঁদের কাকে কি উপহার দেয়া যায়, মা এখন সেই আলোচনা করছেন ফোনে।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওজন মাপার ছোট যন্ত্রটার দিকে নজর দিল রবিন। টেবিলের একপাশে রাখা আছে ওটা। বাবার জিনিস। পোস্ট করার আগে চিঠিপত্র কিংবা পার্সেল মেপে দেখে নেন ওজন কত। সময় কাটানোর জন্যে প্রথমে একটা পেন্সিল মাপল রবিন, অ্যাডেসিভ টেপ মাপল, তারপর একের পর এক কয়েনের ওজন দেখতে শুরু করল–বাজারে নেয়ার জন্যে যেগুলো দিয়েছেন তাকে মা।

সব ধরনের মুদ্রাই রয়েছে, দোকানদারকে ভাঙতি দেয়ার সুবিধের জন্যে। পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ পেন্স–একেকটার ওজন একেক রকম। মাপতে মাপতে হঠাৎ থেমে গিয়ে স্কেলের দিকে তাকিয়ে রইল ভুরু কুঁচকে। দুটো পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা মাপতে গিয়ে তফাৎটা লক্ষ করেছে।

'ঘটনাটা কি!' আনমনে বিড়বিড় করল সে। 'এটার ওজন বাকিগুলোর চেয়ে কম কেন?'

নিশ্চিত হবার জন্যে পঞ্চাশ পেন্সের অন্য মুদ্রাটা আবার মেপে দেখল সে। কোন সন্দেহ নেই। দুটোর ওজন দুই রকম। প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা চার গ্রাম কম। এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। দুটোই অবিকল এক রকম দেখতে। একই রকম নতুন, চকচকে।

বিস্মিত ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না মুখে। মা'র দিকে তাকাল। আশা করল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে তার ছোট্ট এই পরীক্ষাটা নজরে পড়বে না তাঁর। মিসেস ডানকানের সঙ্গে পার্টি নিয়ে আলোচনায় মশগুল।

তার দৃঢ় বিশ্বাস, অদ্ভুত কিছু রয়েছে মুদ্রা দুটোর মধ্যে। কোন রহস্য।

দুই

সেদিন বিকেলে কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে জমায়েত হলো সবাই। কিশোর, মুসা, রবিন, ফারিহা, টিটু তো রয়েছেই–দলে নতুন যুক্ত হয়েছে আরও তিনজন: বব, অনিতা ও ডলি। গ্রীনহিলস স্কুলে পড়ে। মুসা আর রবিনের বন্ধু। গোয়েন্দাগিরির বেজায় শখ। বহুদিন ধরে চাপাচাপি করছে মুসা আর রবিনকে। ওদের অনুরোধে প্রথমবারের মত ওই তিনজনকে দলে নিতে রাজি হয়েছে কিশোর। তবে শর্ত আছে, ওদের আচরণ বা কাজকর্ম তার পছন্দ না হলে কোন রকম কৈফিয়ত ছাড়াই দল থেকে বাদ দিয়ে দেবে। বব, অনিতা আর ডলি শর্তে রাজি।

সকাল বেলা রবিনের আম্মা ফোন সেরে বাজারের লিস্টে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে রবিনকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়েছিল কিশোরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। মুদ্রা সম্পর্কে তার দুর্দান্ত আবিষ্কারের খবরটা জানাতে। দলের সবাইকে খবরটা জানানোর দায়িত্ব নিয়েছে এরপর কিশোর, রবিন চলে গেছে

বাজারে। খবর জানিয়ে বিকেল বেলা জরুরী মীটিং ডেকেছে কিশোর। সেই মীটিঙেই হাজির হয়েছে এখন ওরা।

শীতকালে ছাউনির মধ্যে আরাম নেই। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে গরম কাপড়-চোপড় পরে জবরজং সেজে বসেছে একেকজন। সবাই এসে গেছে, একজন বাদে, নতুন সদস্য ডলি।

'ডলি!' মুখ বাঁকাল বব। 'জীবনে কোনদিন সময় ঠিক রেখেছে?' বাকি সবার মতই অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। আলোচনা শুরু করার জন্যে তর সইছে না।

এই সময় থাবা পড়ল দরজায়।

'কে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল বব।

'ডলি!' ফিসফিস করে এমন ভঙ্গিতে বলল, যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে।'

'অকারণে এমন করছে।' হাত নাড়ল বব, 'দেখবে, কিছুই হয়নি।'

'হুঁ!' তার কথায় মনে হলো কান নেই কিশোরের। 'পঞ্চাশ যোগ পঞ্চাশ সমান আটাশ!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে।

'সেরেছে! শুরু হলো ল্যাটিন ভাষা!' মুখ বাঁকাল মুসা। 'বলা যায় না, এখুনি হয়তো বলে বসবে পঞ্চাশ মিনিটে এক ঘণ্টা হয়।'

'কি বললে?' মুসার মন্তব্য শুনে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। 'আসলেই তো তাই–পঞ্চাশে পঞ্চাশে আটাশই তো হওয়ার কথা।'

'অঙ্ক ভুলে গেলে নাকি তুমি?'

'না, ভুলিনি।'

দরজা খুলে দিয়েছে বব। ঘরে ঢুকল ডলি।

'এত দেরি করলে যে?' জিজ্ঞেস করল বব।

ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করে ডলিকে বসতে ইশারা করল কিশোর।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল রবিন। কিশোরের কথা বুঝে ফেলেছে। 'ঠিকই বলেছে ও! পঞ্চাশে পঞ্চাশে তো আটাশই হওয়ার কথা। কারণ পঞ্চাশ পেন্সের একটা মুদ্রার ওজন যদি চোদ্দ গ্রাম হয়, দুটোর হবে আটাশ। কিন্তু আজ সকালে একটা মুদ্রা পেয়েছি, যেটার ওজন চার গ্রাম কম, অর্থাৎ দশ গ্রাম। ওরকম দুটো হলে দশে আর দশে দাঁড়াবে বিশ। এতক্ষণে বুঝেছ নিশ্চয় সবাই?'

'খাইছে!' কপাল চাপড়াল মুসা। 'এটার ভাষা তো আরও ভারী, প্রাচীন গ্রীক। কিছুই বুঝিনি আমি।'

'আমিও না!' ফারিহা বলল। 'রবিন, একটা বর্ণও বুঝিনি আমি তোমার কথা।

'আমিও না,' ফারিহার সঙ্গে সুর মেলাল অনিতা। 'আমার বিশ্বাস টিটুও কিছু বোঝেনি। কি রে, টিটু?'

'খোলসা করে বলো না সব,' মুসা বলল, 'তাহলেই তো হয়ে যায়। এত কথা বলা লাগে না আর।'

'বলছি, বলছি,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কিশোর, তুমিই বলো না।'

'ঠিক আছে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকাল কিশোর। 'সকাল বেলা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছে রবিন।'

'সেটা কি?' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা। 'তাই তো জানতে চাচ্ছি। অত ভূমিকা না করে বলে ফেলো না।'

কিশোরের পায়ের কাছে বসেছে টিটু। মাথা চাপড়ে তাকে আদর করে দিল সে। সবাই শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে । ঘরে পিনপতন নীরবতা। সবাইকে একটা অস্থিরতায় রাখার জন্যে যেন ইচ্ছে করে সময় নিচ্ছে কিশোর।

'হ্যাঁ, শোনো,' অবশেষে মুখ খুলল সে। 'সকাল বেলা বাজারে যাওয়ার জন্যে রেডি হয়ে বসে ছিল রবিন। আন্টি তখন টেলিফোনে কথা বলছেন। ও শুনছে আর অপেক্ষা করছে। সময় কাটছে না দেখে শেষে কতগুলো মুদ্রা নিয়ে ওজন মাপতে শুরু করে ওজন মাপক যন্ত্রে। বুঝলে কিছু?'

মাথা নাড়ল সবাই। বোঝেনি।

'গুড,' বলল কিশোর। না বোঝাতে 'গুড'-এর কি হলো বোঝা গেল না। 'অনেকগুলো মুদ্রা মেপেছে সে। আন্টি ওকে বাজার করার জন্যে দিয়েছিলেন ওগুলো। তার মধ্যে পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা ছিল দুটো। মজার ব্যাপারটা হলো, দুটোর ওজন এক রকম নয়।'

'বলো কি!' এমন ভঙ্গি করে বলল ডলি, যেন কি ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটে গেছে।

'হ্যাঁ, তাই,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'সে-জন্যেই তোমাদেরকে এখানে ডাকলাম,' কিশোর বলল। 'জিজ্ঞেস করার জন্যে তোমাদের কার কাছে কয়টা পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা আছে।'

'যাতে ওগুলো নিয়ে মেপে দেখতে পারি আমরা,' কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন।

'এই যে আমার কাছে দুটো আছে,' সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিল ফারিহা। 'আর নেই। আমার মানি-বক্সে দুটোই ছিল।'

'আমার কাছে পাঁচটা আছে,' গর্বের সঙ্গে বলল অনিতা। 'এখনও ক্রিস্টমাসের বাজার করিনি তো, তাই রয়ে গেছে।'

বাকি সবাইও তাদের যার কাছে যতগুলো পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা আছে বের করতে লাগল। মহা হই-চই, হট্টগোল। একসঙ্গে কথা শুরু করে দিয়েছে সব।

'আরে আস্তে, আস্তে!' তাড়াতাড়ি সাবধান করল কিশোর। 'এত চেঁচামেচি করলে চাচী চলে আসবে দেখতে।...রবিন, তোমার গবেষণাটা আরেকবার চালাও তো দেখি আমাদের সামনে।'

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল রবিন। একটা কমলার বাক্সের ওপর ওজন মাপক যন্ত্রটা রাখল সে। বাক্সটাকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। পকেট থেকে মুদ্রা দুটো বের করে দেখাল সে। 'মায়ের বাজারের পয়সা থেকে সরিয়ে ফেলেছি এ দুটো। অবশ্য মেরে দিইনি, এক ডলারের একটা নোট দিয়ে দিয়েছি তাকে।'

ছোট মাপক যন্ত্রটার থালায় একটা মুদ্রা রাখল সে। কাঁটার দিকে তাকিয়ে

বলল, 'দেখো, ওজন ঠিক চোদ্দ গ্রাম।' প্রথমটা তুলে নিয়ে দ্বিতীয়টা রাখল থালায়।' এবার এটা দেখো। দশ গ্রাম। চার গ্রামই কম।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,' কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। এদিক ওদিক কেঁপে কেঁপে আস্তে করে স্থির হলো এক জায়গায়।

'এখন ফারিহারগুলোর অবস্থা দেখা যাক,' রবিন বলল।

মুদ্রা দুটো তার হাতে তুলে দিল ফারিহা।

দুটোই দেখা হলো।

'চোদ্দ গ্রাম এবং চোদ্দ গ্রাম,' কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল।

'দেখি, তোমারগুলো দাও তো এবার, বব,' হাত বাড়াল কিশোর।

তিনটে মুদ্রা তার হাতে ফেলে দিল বব।

'চোদ্দ, চোদ্দ, এবং চোদ্দ,' ওজন দেখে ঘোষণা করল রবিন।

এরপর অনিতার পালা। তার কাছে আছে পাঁচটা মুদ্রা। সবগুলো চোদ্দ গ্রাম। কিশোরের চারটে আর মুসার দুটোর একই ওজন।

কিন্তু ডলির তিনটে মুদ্রার শেষটাকে ওজন দিয়েই চিৎকার করে উঠল রবিন, 'দেখো, ওজন কম! আমার দ্বিতীয়টার সমান!'

কান পেতে শব্দ শুনল সবাই।

তারপর মুসা হঠাৎ তার একটা ভারী মুদ্রা আছড়ে ফেলে দিয়ে শুনে বলল, 'শুনলে? এক রকম না কিন্তু।'

একমত হয়ে মাথা নাড়াল সবাই।

'ভেতরে কি আছে দেখা দরকার,' মুসা বলল তখন।

'কি করে?' ডলির প্রশ্ন।

'অবশ্যই একটাকে কেটে ফেলে!' জবাব দিল রবিন।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'একটা নয়, দুটোকে। বেশির ভাগ মুদ্রাই যেহেতু চোদ্দ গ্রাম, ওগুলোকেই স্বাভাবিক ধরব আমরা। স্বাভাবিক একটাকে কাটব প্রথমে, তারপর হালকা একটাকে। দুটোর তুলনা করতে পারব তাহলে।'

মুহূর্ত দেরি না করে দেয়ালের হুকে ঝোলানো একটা লোহাকাটা করাত খুলে নিয়ে এল সে। আরও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঝোলানো রয়েছে ওখানে। ওগুলো রাখার সময় কিশোর বলেছিল, 'কোনটা যে কখন দরকার হয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। সে-জন্যেই রাখলাম।'

'প্রথমে ভারীটা কেটে দেখা যাক,' বব বলল।

'ভাইসে আটকে নেয়া উচিত না?' রবিন বলল। 'ধাতব জিনিস। হাত দিয়ে ধরে কাটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে।'

ভাইসও একটা আছে। কোন অসুবিধে নেই। রীতিমত একটা ওঅর্কশপ এই ছাউনিটা। চোদ্দ গ্রামের একটা মুদ্রা ভাইসে আটকে নিয়ে কাটা শুরু করল কিশোর।

জোরাল ঘ্যাচর ঘ্যাচর আওয়াজ। ঘুমিয়ে পড়েছিল টিটু। চমকে একটা কান খাড়া করে ফেলল। কিন্তু চোখ মেলল না সে। খাওয়ার আগে আর মেলবে বলেও মনে হয় না।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাকি সবাই। কিশোরের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিনিটের পর মিনিট পার হয়ে যাচ্ছে। কাটা আর শেষ হয় না।

করাতের দাঁতের ঘষায় ধোঁয়ার মত উড়ছে ধাতুর সূক্ষ্ম কণা।

'শেষ হয়ে এসেছে, তাই না?' তর সইছে না আর রবিনের।

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে মুদ্রাটা দুই টুকরো হয়ে একটা টুকরো মাটিতে পড়ে ঠন করে উঠল।

'যাক, হলো শেষ পর্যন্ত!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাটি থেকে টুকরোটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। তারপর বাড়িয়ে দিল রবিনের দিকে। হাতে হাতে ঘুরতে থাকল ওটা। সবাই দেখল।

করাতে কাটা সমান, মসৃণ ধারটায় আঙুল বোলাল ডলি। 'কিশোর, কি বোঝা যাচ্ছে এতে? আমার তো মনে হচ্ছে খামোকা কাটা হলো, মাঝখান থেকে পঞ্চাশ পেন্স গরীব হয়ে গেলাম আমি।'

'একটু ধৈর্য ধরো,' মুসা বলল, 'বাকিটারও একই গতি করা যাক। তারপর বোঝা যাবে লাভটা কি হলো। কি বলো কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কেবল কিশোর।

নিজের দুটো মুদ্রার মধ্যে হালকা মুদ্রাটা বের করে ডলিকে দেখাল রবিন। 'এই যে, তোমার মত আমিও পঞ্চাশ পেন্স গরীব হতে চলেছি।' মুদ্রাটা নিজেই ভাইসে লাগিয়ে কাটা শুরু করে দিল সে।

এবার আর আগেরটা কাটার মত এত শব্দ হলো না, কাটাও অত কঠিন হলো না।

'যে রকম তাড়াতাড়ি কেটে ফেলছ,' ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'মনে হচ্ছে ধাতুটাই নরম, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। কোন সন্দেহ নেই তাতে। আগেরটার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এটা কেটে ফেলল রবিন। কিশোর যেটা কেটেছে তার অর্ধেক সময় লাগল।

ভাইসে আটকানো টুকরোটার দিকে এক নজর তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'দেখো, ধাতুর দুটো স্তর!'

'হ্যাঁ, তাই তো,' মাটিতে পড়ে যাওয়া টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল অনিতা। 'বাইরের আস্তরটা একেবারে পাতলা। ভেতরেরটা পুরু, তবে অন্য রকম, কালো রঙের।'

'হালকা, সস্তা কোন ধাতু দিয়ে তৈরি,' গম্ভীর মুখে কিশোর বলল।

'কেন, সস্তা কেন?' প্রশ্ন করল ফারিহা।

'কারণ, এই মুদ্রাগুলো জাল!' জবাব দিল কিশোর। 'আসল মুদ্রার মত দামী ধাতু দিয়ে তৈরি করে জালিয়াতদের কোন লাভ নেই, সে-জন্যে সস্তা ধাতু ব্যবহার করে।'

'জালিয়াত?' স্তব্ধ হয়ে গেল ডলি। 'কিন্তু আমার কয়েনটা জাল হতেই পারে না!' নিজের হাতের হালকা মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল সে, 'আমার আপা

এটা দিয়েছে আমাকে।'

'তোমার আপার কোন দোষ নেই, ডলি,' তাকে বোঝাল রবিন। 'এটা তো আর তিনি নিজে বানাননি। অন্য কেউ তাঁকে দিয়েছে। যে দিয়েছে সে আবার কারও কাছ থেকে পেয়েছে, সেই জন আবার অন্য কারও কাছ থেকে—এ ভাবেই হাত বদল হতে থাকে কয়েন। আমার প্রশ্ন, প্রথম কার হাত থেকে বেরোল এটা?'

'হ্যাঁ, ঠিক—আমারও প্রশ্ন সেটা,' উত্তেজিত স্বরে কিশোর বলল। 'এবং প্রশ্নটার জবাব খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। রবিন আর ডলির প্রথম কাজ হলো এখন মুদ্রা দুটো কার কার হাত ঘুরে এসেছে যতটা সম্ভব সেটা জানার চেষ্টা করা। আমরাও ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখব কিছু জানা যায় কিনা। আপাতত এটাই আমাদের প্রথম কাজ।'

মীটিং শেষ হলো। ছাউনি থেকে বাগানে বেরিয়ে এল সবাই। চারটেও বাজেনি, কিন্তু এখনই দিনের আলো মুছে যেতে আরম্ভ করেছে। ধূসর আকাশটা যেন অনেক নিচে নেমে এসে ঝুলে রয়েছে।

'তুষার পড়া শুরু হবে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, পড়বে,' কিশোর বলল।

সাইকেলে চেপে সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে চলে গেল বব।

একে একে সবাই চলে গেল বিদায় নিয়ে। বাগানের গেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার সে। বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হচ্ছে রহস্য আরেকটা পেয়ে গেলাম!'

বাড়ি ফিরে সোজা মা'র দিকে এগিয়ে গেল রবিন। আগের দিন যে মুদ্রাটা তাকে দিয়েছেন তিনি, সেটার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। কার কাছ থেকে নিয়েছেন, বলতে পারলেন না। তবে তার আগের দিন কোন্ কোন্ দোকানে জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন, সেটা মনে করতে পারলেন। যত্ন করে নোটবুকে তালিকাটা লিখে নিল রবিন।

ডলিও একই কাজ করল। তার বড় বোনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল গত চব্বিশ ঘণ্টায় কোথায় কোথায় গিয়েছিল। ডলির বড় বোন জানাল, পাশের শহরটাতে হেয়ারড্রেসারের দোকানে গিয়েছিল চুল ঠিক করতে। তারপর গিয়েছিল একটা পোশাকের দোকান আর কেমিস্টের দোকানে। গাঁয়ে ফিরে যায় পোস্ট অফিসে, সেখান থেকে মুদীর দোকান আর বেকারিতে।

পাঁচটার সময় ডলির সঙ্গে দেখা করল রবিন, তালিকা দুটো মিলিয়ে নেয়ার জন্যে। কিন্তু দু'জনের তালিকায় একটা দোকানের নামও পেল না যেগুলো মিলে যায়। অর্থাৎ রবিনের আম্মা যেখানে যেখানে গিয়েছেন, তার কোনটাতেই যায়নি ডলির বোন। এর দুটো মানে হতে পারে। হয় ভিন্ন ভিন্ন দিনে যে কোন এক জায়গা থেকে মুদ্রা দুটো তাদের হাতে এসেছে, নয়তো দুই জায়গা থেকে ওগুলো পেয়েছে তারা। কোন্খান থেকে এসেছে, বের করা অসম্ভব বলে মনে হলো ওদের কাছে।

বাকি গোয়েন্দারাও চুপ করে বসে রইল না। যার যার মানি-বক্স খালি করে টাকা-পয়সা যা আছে সব নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেগুলো ভাঙিয়ে পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা জোগাড়ের জন্যে। ভাগ্যিস স্কুল এখন ছুটি, নইলে এ সব করার সময়ই পেত না কেউ। রহস্যটা হাতছাড়া হয়ে যেত।

কিশোর, ফারিহা আর টিটু গেল পোস্ট অফিসে। কাউন্টারে বসা মেয়েটা উৎসাহের সঙ্গেই ওদের টাকা-পয়সা ভাঙিয়ে পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা দিয়ে দিল।

বব দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। পথচারী দেখলেই একটা করে ডলার বাড়িয়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগল পঞ্চাশ পেন্সের দুটো মুদ্রা দেয়ার জন্যে।

মুসা গেল বাজার করতে। টুকিটাকি জিনিস কিনতে লাগল। এমন করে কিনল, যাতে প্রচুর পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা জোগাড় হয়। যেমন, এক টিউব পেপারমিন্ট লজেন্স কিনলে দিতে হবে বিশ পেন্স, দোকানিকে এক ডলার দিলে খুশি হয়েই সে বাকি পয়সার সঙ্গে একটা পঞ্চাশ পেন্স দিয়ে দিল। প্রতি দোকান থেকে একটার বেশি জিনিস কিনল। আর এই কাজটা করতে গিয়েই একটা মজার আবিষ্কার করে বসল সে।

মুদী দোকান থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে, টাকা দিয়ে দোকানির বউকে জিজ্ঞেস করল পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা দিতে পারবে কিনা।

'পারব।' তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে যোগ করল মহিলা, 'বুঝলাম না লোকের কি হয়েছে আজ! সবাই এসে খালি পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা চাইছে!'

খানিক দূরে একটা বেকারিতে অনিতার বেলায়ও প্রায় একই ব্যাপার ঘটল। একটা লোক কেক কিনে দাম মিটিয়ে দেয়ার পর মহিলাকে কয়েকটা ডলার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এগুলোর বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা দিতে পারবে কিনা।

তিন

'লোকটা অনেক লম্বা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল অনিতা। 'মাথার হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে রেখেছিল। কোটের কলার তুলে দিয়ে চিবুক ঢেকে দিয়েছিল এমন ভাবে, যাতে তার চেহারা বোঝা না যায়। কিন্তু তার বাঁ গালের কাটা দাগটা ঠিকই দেখে ফেলেছি আমি।'

বেকারিতে যা যা শুনে এসেছে, সবাইকে জানাচ্ছে সে। ছ'টা প্রায় বাজে। কে কি করে এসেছে, বলার জন্যে আবার জমায়েত হয়েছে গোয়েন্দারা। মুসা আর অনিতা জরুরী খবর জেনে এসেছে। বাকি সবাই তেমন কোন খবর আনতে না পারলেও পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা নিয়ে এসেছে অনেকগুলো। তবে দুঃখের কথা, ওগুলোর কোনটার ওজনই চোদ্দ গ্রামের নিচে নয়।

'খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছি আমরা,' মুখ কালো করে ডলি বলল।

'জাল মুদ্রা পাইও যদি আরও,' তার সঙ্গে সুর মেলাল বব, 'তাহলেই বা জালিয়াতদের খুঁজে বের করব আমরা কি ভাবে? টাকা সর্বক্ষণ হাত থেকে হাতে

ঘুরে বেড়াচ্ছে–কার কাছ থেকে কখন কি ভাবে কার কাছে গেল, কিছুই বলার উপায় নেই।'

'তা ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'আজ বিকেলে যে ভাবে গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম আমরা, এ রকম করে ঘুরে কোন লাভ নেই।'

'তাহলে কি করব?' রবিনের প্রশ্ন। রহস্যটার ব্যাপারে তার আগ্রহই যেন সবচেয়ে বেশি। তার আশঙ্কা হচ্ছে বাকি সবাই ভোটাভুটি করে রহস্য উদ্ধারের চেষ্টাটা না বাদ দিয়ে দেয়।

'পুলিশকে জানাতে পারি আমরা,' মুসা বলল।

'পুলিশ জানে না, কি করে বুঝলে?' রবিন বলল। 'আমাদের আগেই হয়তো জেনে বসে আছে ওরা।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বব বলল। 'বেকারিতে যে লোকটাকে দেখে এসেছে ডলি, সে পুলিশের লোকও হতে পারে। সাদা কাপড়ে তদন্ত করে বেড়াচ্ছে হয়তো।'

'উঁহু, ওকে আমার মোটেও ডিটেকটিভ বলে মনে হয়নি,' মাথা নাড়ল ডলি। 'বরং কেমন রহস্যময় ভাবভঙ্গি। পুলিশ ওরকম করে না।'

'তারমানে তদন্তটা চালিয়েই যেতে হচ্ছে আমাদের,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'তাই না?'

কিশোর জবাব দেবার আগেই চিৎকার করে উঠল টিটু, 'খুফ! খুফ!'

হেসে ফেলল কিশোর, 'আমি আর কি বলব? টিটুই তো যা বলার বলে দিল। যাই হোক, গাঁয়ে যা দেখার দেখে নিয়েছি আমরা। এখানে আর কিছু দেখার নেই। শহরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে কিছু পেয়েও যেতে পারি ওখানে।'

ওর কথা যে কতখানি সত্যি, তখন যদি সেটা জানত!

পরদিন সকালে পাশের শহরে যেতে তৈরি হলেন ববের আম্মা । ববকে বললেন সঙ্গে যেতে। ববের ছোট বোন জুলিয়াও সঙ্গে যেতে চাইল। আপত্তি করলেন না তিনি। গেলে বরং ভালই। বড়দিনের বাজার করবেন। জিনিসপত্র প্রচুর। বহন করার জন্যেও লোক দরকার।

শহরের বড় রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে তিনজনে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল জুলিয়া।

'দেখো দেখো, মা!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল সে। 'দুজন ফাদার ক্রিস্টমাস!'

দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দুজন লাল কাপড় পরা লোককে। লম্বা, সাদা বড় বড় দাড়ি। ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। ক্রেতা আকৃষ্ট করার নতুন কায়দা। ভালই। দোকানের ভেতর ফাদার ক্রিস্টমাস সেজে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকাটা পুরানো হয়ে গেছে।

'মা, আমি ফাদার ক্রিস্টমাস দেখব! ফাদার ক্রিস্টমাস দেখব!' মা'র হাত ধরে টানাটানি শুরু করল জুলিয়া।

শিকারীর চোখ মেলেই ছিল ফাদাররা। দেখে ফেলল একজন। এগিয়ে এসে

বলল, 'আপনার মেয়েকে নিয়ে একটা ছবি তুললে কেমন হয়, ম্যাডাম? মাত্র এক ডলার দশ পেন্স লাগবে। চমৎকার একটা বাঁধানো ছবি পেয়ে যাবেন। যখন ইচ্ছে দেখে স্মরণ করতে পারবেন এবারের বড় দিনটাকে। কি বলেন?'

ববের আম্মা জবাব দেবার আগেই জুলিয়াকে টেনে নিয়ে গিয়ে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল দ্বিতীয় ফাদারের সামনে।

অনুমতি না দিয়ে আর পারলেন না ববের আম্মা। 'ঠিক আছে, তুলুন, তবে মাত্র একটা। তার বেশি না।'

খুব খুশি জুলিয়া। পেছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে পোজ দিয়ে দাঁড়াল ফাদার। সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলল তার সঙ্গী। হেসে বলল জুলিয়াকে, হয়ে গেছে।

মা আর ভাইয়ের কাছে ফিরে এল জুলিয়া। ছবি ডেভেলপ হতে দেরি হলো না। সেটা বাড়িয়ে ধরে প্রথম ফাদার ববের আম্মাকে বলল, 'এই যে ম্যাডাম, নিন। মাত্র এক ডলার দশ।'

ছবি দেখে খুশি হলেন ববের আম্মা। 'বাহ্, ভাল হয়েছে তো!' ছবিটা ববের হাতে রাখতে দিয়ে ব্যাগ থেকে দুই ডলার বের করে দিলেন তিনি লোকটাকে।

দশ পেন্স রেখে নব্বই পেন্স ভাঙতি দিল তাঁকে লোকটা। তার মধ্যে একটা পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাও রয়েছে।

পঞ্চাশ পেন্স! আরেকটু হলে হাত থেকে ছবিটাই ফেলে দিচ্ছিল বব। শুরুটা চমৎকার! পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাটা কি ভাবে মায়ের কাছ থেকে নেয়া যায় সেই চিন্তা করতে লাগল সে।

হঠাৎ করে নিতান্ত কাকতালীয় ভাবেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। মিনিট দশেক পর বব আর জুলিয়া একটা খবরের কাগজের স্ট্যান্ডের সামনে অপেক্ষা করছে। মা গেছেন ভেতরে, কাগজ কিনতে। খানিক পর বেরিয়ে এসে ববকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বব, তোর কাছে ভাঙতি পয়সা আছে? পঞ্চাশ পেন্স ভাঙিয়ে দিতে পারবি? তোর বাবার জন্যে একটা পত্রিকা কেনা দরকার। দোকানদার ভাঙতি দিতে পারছে না।'

হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেল বব। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ভাঙতি পয়সা বের করে গুঁজে দিল মায়ের হাতে। তবে মায়ের পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাটা নিয়ে নিজের পকেটে ভরতে ভুলল না। বাজিয়ে শোনার প্রবল ইচ্ছেটা চাপা দিল সে। শোনার জায়গা নয় এটা। লোকজনের অভাব নেই। কে কোন্খান থেকে নজর রেখেছে বলা মুশকিল।

কিন্তু বাড়ি ফিরে আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না সে। সিঁড়ির রেলিঙের ধাতব হাতলে বাড়ি মারল। উত্তেজনায় কেঁপে উঠল বুক, যখন শুনল শব্দটা আসল মুদ্রার মত মিষ্টি নয়। অন্য রকম। কেমন ভোঁতা ভোঁতা।

'খোদা! কি কপাল আমার!' ভাবল সে। গতকাল এ রকম একটা জিনিসের জন্যে পুরো গ্রীনহিলস গ্রামটা চষে বেড়িয়েছে ওরা। কিন্তু পায়নি।

'দশ গ্রাম! হুঁ, আরেকটা জাল মুদ্রা এটা, কোন সন্দেহ নেই তাতে,' মাপক যন্ত্র

দিয়ে মেপে দেখে বলল কিশোর।

'কোথায় পেলে এটা?' ববকে জিজ্ঞেস করল অনিতা। 'আজকেও সারাটা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি গাঁয়ের মধ্যে, কিছুই পাইনি। আর তুমি শহরে একবার গিয়েই পেয়ে গেলে!'

'হেনরির ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বাইরে পেয়েছি,' বব বলল। ফাদার ক্রিস্টমাস দু'জনের কথাও ওদের জানাল সে।

'দাঁড়াও দাঁড়াও!' হঠাৎ বলে উঠল রবিন। 'ফাদার ক্রিস্টমাস ! সেদিন আমাদের পাশের বাড়ির মিসেস ডগলাসও গিয়েছিলেন শহরে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে। ওই ছেলেটাও নাকি ফাদার ক্রিস্টমাসের সঙ্গে ছবি তুলেছে। মিসেস ডগলাস মাকে বলছিলেন। আমার মুদ্রাটা যেদিন পেয়েছি তার আগের দিন।'

'মজার ব্যাপার তো!' মুসা বলল। 'তারমানে খোঁজ-খবর পাওয়া যেতে শুরু করেছে।'

'কিন্তু আমি এ কথা মেনে নিতে পারছি না ' ডলি বলল। 'আমার বড় বোন তো আর ওদের সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তুলতে যায়নি।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও, ফাদার ক্রিস্টমাসরা ওই কয়েন দেয়নি?' এই মুদ্রা রহস্য নিয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আছে সে।

'হয়তো দিয়েছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'পয়সা তো হাতে হাতেই ঘোরে। স্বাভাবিক ভাবে চোখে না পড়লে কে আর গবেষণা করে দেখতে যায় কোনটা আসল কোনটা নকল। রবিন যদি ওভাবে হঠাৎ করে আবিষ্কার না করে ফেলত, ওটাও চলে যেত বাজারে, অন্য কারও কাছে। ডলির কয়েনটাও অন্য কারও কাছ থেকে ফাদার ক্রিস্টমাসের হাত ঘুরে, ডলির আপার হাত ঘুরে তার হাতে চলে এসেছে।'

'তা ঠিক,' ফারিহা বলল। 'তা ছাড়া ফাদার ক্রিস্টমাসরা পয়সা জাল করবে এটাও ভাবা যায় না।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

'যদিও সবাই জানে,' আবার বলল ফারিহা, 'দোকানের ফাদার ক্রিস্টমাসরা আসল হয় না।'

'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো, জাল কয়েন পাচারকারী যদি হয়ও ওরা,' বব বলল, 'অত বড় বড় দাড়ির আড়ালে কেউ চিনতে পারবে না ওদের।'

'হ্যাঁ, তাই তো। হাসিখুশি দু'জন ফাদার ক্রিস্টমাস বাচ্চাদের সঙ্গে এ ভাবে হেসে হেসে কথা বলে, কে সন্দেহ করবে তাদের!' রবিন বলল।

'আমরা করব!' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'এবং সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আজই শহরে যাব আমরা।'

চার

বাসে করে বিকেল চারটের সময় এসে ডগলাসের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনে নামল ওরা। বড় দিনের সময় এখন, সকালে যেমন ক্রেতার ভিড় ছিল, বিকেল বেলাও একই রকম ভিড়।

'ওই যে ওরা!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে দুই ফাদার ক্রিস্টমাসকে দেখাল বব।

'এ ভাবে চেঁচিও না,' সাবধান করল কিশোর। 'এসো আমার সঙ্গে।' সবাইকে নিয়ে চলে এল এক ক্রিস্টমাস ট্রী বিক্রেতার দোকানের কাছে। তৈরি করা ক্রিস্টমাস গাছের ছোটখাট একটা জঙ্গল হয়ে আছে। তার আড়ালে এসে দাঁড়াল ওরা কি করা-যায় পরামর্শ করার জন্যে।

'ওই যে ওই লোকটা জুলিয়ার ছবি তুলেছিল,' গাছের ফাঁক দিয়ে হাত তুলে দেখাল বব।

'সাথে পিস্তল-টিস্তল নেই তো?' অনিতা বলল।

'হ্যাঁ, তা তো আছেই,' মুসা বলল। 'দাড়ির মধ্যে লুকানো।'

'বাজে কথা একদম বলবে না আমার সঙ্গে!' রেগে উঠল অনিতা। 'ছাগল পেয়েছ নাকি আমাকে? কিছু বুঝি না মনে করেছ?'

চুপ করে থাকা কিংবা আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

'চুপ! আস্তে!' ধমক লাগাল কিশোর। 'কাজের কথা শোনো এখন, সমস্ত বিকেল এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে আসিনি আমরা। কিছু করতে হবে। ভাগ ভাগ হয়ে যাব। তোমরা গিয়ে দাঁড়াও উল্টোদিকের ওই চত্বরটাতে। খবরের কাগজের স্ট্যান্ডটার আড়ালে দাঁড়াবে, ওরা যাতে দেখতে না পায়। সাথে করে টিটুকে নিয়ে যাও। ফারিহা আর ডলিকে নিয়ে আমি যাচ্ছি দোকানের কাছে, জানালা দিয়ে চোখ রাখব লোকগুলোর ওপর।'

বলার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করল না কেউ। ঘুরতে বেরোনো অতি সাধারণ কয়েকটা ছেলের মত ভঙ্গি করে রইল ওরা। যার যার জায়গায় থেকে নজর রাখতে লাগল ফাদার ক্রিস্টমাসদের ওপর।

অন্য দোকানের ফাদারদের মতই এই দু'জনও স্বাভাবিক আচরণ করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ছবি তোলার জন্যে অনুরোধ করছে তাদের বাবা-মা'কে। বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আদর করছে। চওড়া হাসি হাসছে তুলার তৈরি দাড়ি-গোঁফের আড়াল থেকে।

'নাহ্, কোন কিছুই সন্দেহ করার মত নয়,' চাপা স্বরে মুসাকে বলল রবিন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'সে-রকমই তো লাগছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি কিছু একটা দেখে ফেলব, সে-আশাও আমি অবশ্য করছি না। তা

ছাড়া কিশোর তো বললই ফাদারদের কোন দোষ না-ও থাকতে পারে; হতে পারে ওদের অজান্তেই ওদের হাত দিয়ে হয়তো কেউ পাচার করে দিচ্ছে নকল মুদ্রাগুলো।'

'হ্যাঁ, তা পারে,' কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই জবাব দিল রবিন। 'আর ববের আম্মা যে কয়েনটা ববকে দিয়েছেন, সেটাও ফাদারদের কাছ থেকেই পাওয়া, সেটাও তো ঠিক না হতে পারে। অনেক বাজার করেছেন। আরও অনেকে পঞ্চাশ পেন্সের কয়েন তাঁকে দিয়ে থাকতে পারে।'

কিশোররা তখন দোকানের বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে। ভঙ্গিটা যেন দোকানের উইন্ডোতে সাজানো খেলনা আর অন্যান্য জিনিস দেখছে। রাস্তার দিকে পেছন করে আছে, উইন্ডোর কাছে দাঁড়ানো অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত। উইন্ডোর কাঁচে চত্বরের লোকজনকে দেখা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখছে ওরা। ফাদার ক্রিস্টমাসদেরও দেখা যাচ্ছে, কাজেই ওই দু'জনকে দেখার জন্যেও সরাসরি তাকানো লাগছে না ওদের।

দুই ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কল ফারিহা আর ডলি। বাজার করতে আসা ছেলেমেয়েরা দোকানে ঢুকছে বেরোচ্ছে, উত্তেজিত কলরব করছে; অস্বাভাবিক কোন কিছুই চোখে পড়ল না ওদের। কিছুই করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে গেল টিটু। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। ঘটনাটা ঘটল তখনই। তার থাবা মাড়িয়ে দিল একজন লোক। চিৎকার দিয়ে উঠল টিটু।

প্রায় একই সময়ে চিৎকার দিয়ে ববের হাত খামচে ধরল অনিতাও।

'আরে কি করছ!' হাতে নখ বসে যেতে চেঁচিয়ে উঠল বব।

'স্বপ্ন দেখছি নাকি আমি!' অনিতা বলল।

'তা কি করে বলব? কিন্তু আমার হাতের চামড়া যে তুলে দিচ্ছ এটা ঠিক।'

'ওই যে লোকটা—কালো ওভারকোট পরা,' ববের কথা যেন কানেই যায়নি অনিতার, 'রাস্তা পার হয়ে গেল এইমাত্র—দেখলে না?'

কাঁচের দিকে এমন করে তাকাতে লাগল বব, যেন পারলে কাঁচ থেকে খামচি দিয়ে বের করে আনে লোকটাকে। কালো কোট পরা একজন লোককে চত্বর থেকে নেমে যেতে দেখল সে-ও।

'ওই লোকটাকেই দেখেছিলাম আমি বেকারিতে, গালে কাটা দাগ,' উত্তেজিত স্বরে বলল অনিতা। 'ও গিয়ে কথা বলেছিল ফাদার ক্রিস্টমাসদের সঙ্গে। বুঝতে পারছি না কি ঘটবে এখন!'

উত্তেজনায় টানটান হয়ে কাঁচের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জনে। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে ছেলেমেয়ের দল, হই-চই হাসাহাসি করছে; কোন কিছুই যেন কানে ঢুকছে না বব বা অনিতার।

'কই, কিছুই তো করছে না!' হতাশ কণ্ঠে বলল বব। লোকটা থামছে না। রাস্তার ধার দিয়ে সোজা এগিয়ে চলেছে।

'আরে না না!' হঠাৎ দম আটকে ফেলল অনিতা। 'দেখো, কি করছে?…ঘুরে গেল…এগিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে!…আরে, কি কাণ্ড!'

জোরে চিৎকার দিয়ে নিজের অজান্তেই ঘুরে সরাসরি তাকিয়ে ফেলল

লোকটার দিকে। তার চিৎকার শুনে অন্য ছেলেমেয়েরাও ফিরে তাকাল। হাসির রোল উঠল। চত্বরে লম্বা হয়ে পড়ে গেছে কোটওয়ালা লোকটা। সঙ্গে নিয়ে পড়েছে একজন ফাদার ক্রিস্টমাসকে।

'আরি দেখো না অবস্থা!' বব বলল। 'চত্বরে কয়েনের ছড়াছড়ি! ফাদারের পকেট থেকে পড়েছে। কম করে হলেও দশটা পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা আছে ওর মধ্যে।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ পেন্সের কয়েকটা মুদ্রা তুলে নিল কোটওয়ালা লোকটা।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল ফাদার ক্রিস্টমাস । ছড়িয়ে থাকা পয়সাগুলো তুলে তুলে পকেটে ভরতে শুরু করল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ছেলেমেয়েরা। এই হট্টগোলের মধ্যে সবার অলক্ষে উধাও হয়ে গেল কোটওয়ালা লোকটা।

'আপনাআপনি পড়েনি ফাদার,' বব বলল। 'তাকে ফেলে দিয়েছে কোটওয়ালা লোকটা। পঞ্চাশ পেন্সের কয়েনগুলো হাতানোর জন্যে।'

'আমারও তাই ধারণা,' অনিতা বলল।

কিশোর, ফারিহা আর ডলি পুরো ঘটনাটাই ঘটতে দেখেছে। ওরাও পড়ে যেতে দেখেছে কোটওয়ালা লোকটাকে, দেখেছে তার গালের কাটা দাগ। গতকালের বেকারির সেই লোকটা বলেই তাকে চিহ্নিত করেছে ডলি।

'কয়েকটা কয়েন তুলে নিয়ে গেছে সে!' ঘন ঘন দম নিতে নিতে বলল ডলি। 'চট করে পঞ্চাশ পেন্সের কয়েনগুলো তুলে পকেটে ভরে ফেলেছে।'

'তারমানে আমাদের মত একই ব্যাপারে তারও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে!' কিশোর বলল। 'গুড। তারমানে সত্যি সত্যি এগোনো শুরু করেছি আমরা।'

'কিন্তু লোকটা গোয়েন্দা, না জালিয়াত?' ফিসফিস করে বলল ফারিহা।

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার, ওই দু'জন ফাদার ক্রিস্টমাসের মধ্যে গোলমেলে কিছু একটা রয়েছে।'

'আমি ভাবছি পড়ে যাওয়া পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রাগুলো আসল ছিল, না নকল?' ডলির প্রশ্ন।

'জেনে নিলেই তো পারি,' কিশোর বলল। পকেট থেকে টাকা বের করে দিল ফারিহাকে। 'ফারিহা, এই নাও দুই ডলার। একটা ছবি তুলে এসোগে ফাদার ক্রিস্টমাসদের সঙ্গে।'

'আমি!' আঁতকে উঠল ফারিহা।

'অসুবিধে কি?' কিশোর বলল। 'ফাদারদের পয়সা দরকার। তোমার ছবি তুললে পয়সা পাবে। তুলবে না কেন? তা ছাড়া তোমাকে মানাবেও। কারণ তুমি এখনও ছোট আছ। আমি তুলতে গেলে মানাবে না।'

বাচ্চাদের মত করে কিশোরকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছে একজন ফাদার ক্রিস্টমাস, আরেকজন তার ছবি তুলছে–দৃশ্যটা কল্পনা করেই হেসে ফেলল ডলি।

কিন্তু ফারিহা হাসল না। ফাদার ক্রিস্টমাসদের সঙ্গে ছবি তুলতে মোটেও

ভাল লাগছে না তার। কিন্তু উপায় নেই। গোয়েন্দাগিরিতে অত বাছবিচার করলে চলে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে হাসি ফুটিয়ে ছবি তুলতে গেল সে।

উল্টো দিকের উইনডোতে দাঁড়িয়ে ফারিহাকে ফাদার ক্রিস্টমাসদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল বব আর অনিতা। টিটু ওকে দেখেই ছুটে যাওয়ার জন্যে টানাটানি শুরু করল। এক জায়গায় বসে থেকে মহা বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে।

ফারিহাকে ফাদারদের সঙ্গে ছবি তুলতে দেখে কাগজের স্ট্যান্ডের ওপাশে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না মুসা আর রবিন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফারিহার হাতে তার ছবিটা ধরিয়ে দেয়া হলো।

টাকা বের করে দিল ফারিহা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন ফাদার ক্রিস্টমাসের হাত থেকে ফারিহাকে ভাঙতি পয়সা নিতে দেখল গোয়েন্দারা সবাই।

বেচারি ফারিহা! আষাঢ়ের আকাশের মত মুখ কালো করে তাকে ফিরে আসতে দেখল ওরা।

কাছে এসে কিশোরকে জানাল সে, 'একটা পঞ্চাশ পেন্সের কয়েনও দেয়নি আমাকে।'

'হুঁ,' মোটেও হতাশ মনে হলো না কিশোরকে। 'যাই, দেখি, আমার ভাগ্যটা পরীক্ষা করে আসি।'

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। খানিক আগে পড়ে গিয়েছিল যে লোকটা, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা ডলার বের করে বাড়িয়ে দিয়ে অনুরোধ করল সে, 'আমাকে দুটো পঞ্চাশ পেন্সের কয়েন দিতে পারেন? আমার ছোট বোনকে পঞ্চাশটা পেন্স দিতে হবে কার্ড কেনার জন্যে। আমার কাছে ভাঙতি নেই।'

'নিশ্চয়ই,' হাসিমুখে জবাব দিল ফাদার ক্রিস্টমাস। পকেট থেকে খুচরা বের করে কিশোরকে দিয়ে দিল। কিশোর সে-দুটো পকেটে ভরে, লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ফিরে এল দোকানের ভেতর।

ডলি আর ফারিহার কাছে এসে মুদ্রা দুটো বের করে বাজিয়ে শোনাল ডলি আর ফারিহাকে। নিজেও শুনল। তারপর বলল, 'শুনলে তো? আরও দুটো নকল কয়েন!'

পাঁচ

মিনিট পনেরো পরে আবার ক্রিস্টমাস গাছগুলোর পেছনে জমায়েত হলো গোয়েন্দারা। সাবধান রইল যাতে কারও চোখে না পড়ে।

ওরা এখন নিশ্চিত, ফাদার ক্রিস্টমাসের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভয়ানক দু'জন অপরাধী। কিন্তু দুটো বড় প্রশ্নের জবাব অজানা রয়ে গেল। এক, কি করে প্রমাণ করবে লোকগুলো অপরাধী? দুই, এদের সঙ্গে গালকাটা লোকটার

সম্পর্ক কি?

কি করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল। হেনরির ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আর অন্য সব দোকানপাট বন্ধ করার সময় হয়েছে। বড়দিনের সময় বলে এখন অনেক দেরি করে বন্ধ হয়, যাতে অফিস ফেরতা লোকজন বাজার করে যেতে পারে। দোকানগুলো থেকে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ক্রেতার দল। চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় নেমে যেতে লাগল। বিক্রি না হওয়া ক্রিস্টমাস গাছগুলো দোকানের ভেতর নিয়ে যেতে শুরু করল দোকানদার।

শেষবারের মত একটা বাচ্চার ছবি তুলল ফাদার ক্রিস্টমাসরা। তারপর যখন দেখল, আর একজন ক্রেতাও অপেক্ষা করছে না কোথাও, রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

'আজকের মত কাজ শেষ ওদের,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ, কাজ মানে তো মুদ্রা পাচার। একদিনের জন্যে যথেষ্ট পাচার-টাচার করে এখন গোপন আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে,' বব বলল।

'তাহলে ওদের পিছু নিলেই পারি,' ফারিহা বলল।

'চমৎকার প্রস্তাব!' লুফে নিল রবিন।

কেউ আপত্তি করল না। লোকগুলোর পেছন পেছন রওনা হলো।

মোড় নিয়ে মিল রোডে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো।

'জলদি এসো!' কিশোর বলল, 'কোন বাড়িটাড়িতে ঢুকে পড়লে আর দেখতে পাব না।'

দৌড়াতে শুরু করল ওরা। আগে আগে ছুটছে টিটু। মাটিতে নাক নামিয়ে গন্ধ নিচ্ছে। এতক্ষণ পর একটা কাজের মত কাজ পেয়ে গিয়ে মহাখুশি।

কিন্তু মোড় নিয়ে অন্য পাশে এসে হতভম্ব হয়ে গেল ওরা।

লোকগুলো উধাও!

'খাইছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বিমূঢ়ের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মুসা।

'আমরা যে পিছু নিয়েছি নিশ্চয় বুঝে ফেলেছে,' অনিতা বলল।

'কিংবা হয়তো গাড়িটাড়ি কিছু রাখা ছিল এখানে। তাতে উঠে চলে গেছে,' ডলি বলল।

'কিংবা হরিণে টানা স্লেজ,' ব্যঙ্গ করে বলল রবিন। 'যে গাড়িতে চড়ে চলাফেরা করে ফাদার ক্রিস্টমাস।'

কিন্তু এ মুহূর্তে এ রসিকতায় হাসতে পারল না কেউ। ভীষণ হতাশ হয়ে বব বলল, 'তারমানে ওদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। হেনরির দোকান যখন খোলে।'

কিন্তু হঠাৎ করেই জোরে হাত নেড়ে বন্ধুদের সাবধান করে দিল কিশোর। ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে সবাইকে নিয়ে চলে এল একটা পার্ক করে রাখা গাড়ির আড়ালে। 'ওই যে ওরা! তারমানে কয়েক মিনিটের জন্যে ওই অফিস বাড়িটায় ঢুকেছিল।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' নিচু স্বরে বলল বব। 'পোশাক খোলার জন্যে হবে

হয়তো।'

'দেখলে?' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ফারিহা। 'মোটেও অপরাধী মনে হচ্ছে না এখন ওদেরকে।'

অনিতাও হাঁ হয়ে গেছে। 'বয়েসও তো আমাদের চেয়ে তেমন বেশি না!'

খানিক দূরে একটা অফিস বিল্ডিঙের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দু'জন তরুণ। বগলে দুটো লাল-সাদা রঙের পোশাক।

'ওখানে ঢুকেছিল পরনের ফাদার ক্রিস্টমাসের আলখেল্লা খোলার জন্যে,' মুসা বলল। 'নিচে তো একেবারে সাধারণ পোশাক।'

'কিন্তু ওই পোশাক এ ভাবে খোলাখুলি নিয়ে যাচ্ছে কেন? মানুষে দেখলে যে চিনে ফেলবে সেই পরোয়াও করছে না নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার।'

'পিছু নেব নাকি ওদের?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তাহলে হয়তো আরও কিছু জানা যাবে। কি, নেব?'

অতএব রওনা হয়ে গেল ওরা। পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর আড়ালে আড়ালে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চলল লোকগুলোকে।

একের পর এক রাস্তা পেরিয়ে যেতে লাগল ওরা। শহরের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া নদীটার পাড় ধরে এগোল খানিক। তারপর একটা বাগানওয়ালা চত্বরে ঢুকল। এক সারি ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে গিয়ে কথা বলতে লাগল দু'জনে।

'বাগানে ঢুকে পড়া উচিত আমাদের,' কিশোর বলল। 'পাতাবাহারের আড়ালে আড়ালে ওদের অনেক কাছে চলে যেতে পারব।'

দ্রুত একটা ঝোপের আড়ালে এসে লুকাল ওরা, লোকগুলোর খুব কাছে।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে বলেই রাত কাবার করবে নাকি?' ফিসফিস করে বলল ডলি। 'উফ্, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি আমি!'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। হাত মেলাল লোকগুলো, তারপর দু'জন দু'দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সবে পা বাড়াতে যাবে ওরা, এই সময় বড় একটা কালো গাড়ি এসে ঘ্যাচ করে থামল ওদের পাশে। পাকা চত্বরে রবারের চাকা ঘষার শব্দ মিলানোর আগেই লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল দু'জন লোক।

'আরে, সেই গালকাটা!' দম বন্ধ করে ফেলল অনিতা।

এতটাই চমকে গেল দুই ফাদার ক্রিস্টমাস, বাধা দেয়ার কথাও যেন মাথায় এল না। সহজেই ওদের কাবু করে ফেলা হলো।

স্তব্ধ হয়ে গেছে গোয়েন্দারা। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে।

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পেল না ফাদার ক্রিস্টমাসেরা। তাদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেয়া হলো গাড়িতে। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে তোলার আগেই হঠাৎ ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় মারল সে। পালিয়ে গেল। দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলে যে লোকটা, এ সে-ই।

এক দৌড়ে গিয়ে ফ্ল্যাটগুলোর মাঝে ঢুকে হারিয়ে গেল সে। ওর আক্রমণকারীরা দ্বিধা করল। বুঝতে পারল, আর তাড়া করে লাভ নেই। গাড়িতে গিয়ে বসল দু'জনে। ইঞ্জিন চালু করেই রেখেছে ড্রাইভার। ওরা উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে মিনিটখানেকের বেশি লাগল না। আশেপাশে আর দ্বিতীয় কোন লোক নেই যে দেখবে। গোয়েন্দাদের চোখের সামনে নির্বিবাদে একজন ফাদার ক্রিস্টমাসকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে গেল ওরা।

দুই হাতে চেপে ধরে আছে কিশোর টিটুর চোয়াল। চিৎকার করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে কুকুরটা। গাড়িটা চত্বর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়া দিয়ে কিশোরের হাত থেকে মুখ ছুটিয়ে নিল টিটু।

হউ! হউ! হউ! হউ! টানাটানি করে শিকল ছুটানোর চেষ্টা করছে। পাকা চত্বরে তার নখ ঘষা লাগার শব্দ হচ্ছে।

'থাম, টিটু! চুপ কর! শান্ত হ! তুই গিয়ে আর এখন কিছু করতে পারবিনে!' কোনমতেই ছাড়ল না ওকে কিশোর। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মুসা আর বব।

অবশেষে শান্ত হলো টিটু।

ঘটনাটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেল গোয়েন্দারা।

'কোথায় নিয়ে গেল লোকটাকে?' মুসার প্রশ্ন।

'লোকটা কে?' রবিন জানতে চাইল।

কিন্তু কেউ ওদের কথার জবাব দিতে পারল না।

অন্ধকার হয়ে আসছে। চত্বরটা এখনও নির্জন। দুটো স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো পড়ছে রাস্তায়। দিনের আলো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি বলে উজ্জ্বল হতে পারছে না আলোটা। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডা।

ধস্তাধস্তিটা হয়েছে যে জায়গায় সেখানে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা। ফাদার ক্রিস্টমাসের একটা লাল-সাদা পোশাক পড়ে থাকতে দেখল ফারিহা পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের মধ্যে। বাতাসে উড়ছে তুলোর তৈরি সাদা লম্বা দাড়ি। তুলে নিল সে।

ডলির দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে। শীতে না যতটা, তারচেয়ে বেশি ভয়ে।

'আরেকজন ফাদার ক্রিস্টমাসের খোঁজে যেতে হবে এখন আমাদের,' কিশোর বলল। 'বিল্ডিঙের দিকে পালিয়ে গেছে যে লোকটা।'

লাল-সাদা আলখেল্লাটা তুলে নিল সে।

'কি ভাবে খুঁজে বের করব?' ববের প্রশ্ন। 'দরজায় দরজায় গিয়ে তো আর নক করে জিজ্ঞেস করা যাবে না—এই ভাই, একজন নকল ফাদার ক্রিস্টমাস আছে নাকি এখানে?'

'তা ছাড়া লোকগুলোর আসল পরিচয়ও জানি না আমরা,' ববের কথা সমর্থন করল মুসা। 'যারা ওদের আক্রমণ করল, তাদের সম্পর্কেও কিছুই জানি না। ওরা কি অপরাধী, না পুলিশের লোক, তা-ও জানা নেই। রহস্যটা বড়ই জটিল মনে হচ্ছে আমার কাছে।' অন্ধকারে ছায়াঢাকা অপরিচিত বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে

বলল, 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি এখন আমরা...'

'বাড়ি না গিয়ে বরং লোকটাকে খুঁজতে যাই,' মুসাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল রবিন।

'আমিও রবিনের সঙ্গে একমত,' কিশোর বলল। 'সবে জমে উঠতে আরম্ভ করেছে রহস্যটা, এ সময়ে এটাকে বাদ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল ফারিহা। ঠাণ্ডা, মোলায়েম কি যেন গালে লেগেছে। চিৎকার করে উঠল, 'আরি! তুষার পড়ছে!'

বলতে না বলতেই আরেক কণা তুষার উড়ে এসে পড়ল তার নাকে।

'তুষারই তো!' অনিতাও চিৎকার করে উঠল।

'তুষার! তুষার!' সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করল সবাই।

হঠাৎ করেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল ওরা। আনন্দে অস্থির। মনে হচ্ছে এবারের বড় দিনটা প্রচুর তুষার-পড়া 'সাদা বড় দিন'-এ পরিণত হবে। সেটা খুব মজার। আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে, হাত তুলে উন্মাদ নৃত্য জুড়ে দিল ওরা। মুসা আর কিশোরের জন্যে এটা ধর্মীয় উৎসব নয়, কিন্তু সামাজিক ভাবে তাতে আনন্দ করায় কোন বাধা নেই। সবার খুশি দেখে টিটুও চুপ করে থাকতে পারল না। প্রবল লাফালাফি জুড়ে দিল। পেঁজা তুলোর মত ভেসে ভেসে নেমে আসছে হালকা তুষার কণা। লাফিয়ে উঠে সেগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল সে।

কয়েকজন পথচারীকে দেখা গেল এতক্ষণে। কাজ শেষে বাড়ি ফিরছে। ছেলেমেয়েদের দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল। তুষার ওদের কোন আনন্দ দিতে পারল না। থুঁতনির কাছে অল্প কিছু দাড়িওয়ালা একজন লোক তো দাঁড়িয়েই গেল জ্ঞান দেয়ার জন্যে, 'তোমাদের কাছে যতই ভাল লাগুক, তুষার জিনিসটা মোটেও ভাল নয়। ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল, প্যাচপেচে! অতি জঘন্য!'

'ঠাণ্ডা দূর করাটা তো কঠিন কিছু না,' জবাব দিল অনিতা। 'আমাদের মত নাচাকুঁদো করুন। দেখবেন গা গরম হয়ে গেছে।'

যেন তার কথায় সমর্থন জানাতেই আরও জোরে লাফানো শুরু করে দিল টিটু।

ওপর দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল রবিন। চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখো দেখো! ওই বাড়িটার একেবারে ওপরতলার জানালাটা–ডান দিকের!'

হাত তুলে একটা আলোকিত জানালা দেখাল সে।

'কেন, তোমার কি মনে হচ্ছে ওই লোকটাই?' জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। হঠাৎ করেই আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। অন্ধকারে কোন কিছুই আর চোখে পড়ল না।

'ওই লোকটাই, কোন সন্দেহ নেই আমার,' রবিন বলল। 'ওকে চিনতে পেরেছি আমি। যে লোকটা ছবি তুলছিল। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে মনে হয় দেখছিল সে।'

'তারমানে আমাদের ওপর নজর রাখছিল,' ডলি বলল। 'উদ্দেশ্যটা কি তার? কি করতে চায়?' ভীত মনে হচ্ছে তাকে।

'অত ভয় পাচ্ছ কেন?' মুসা বলল। 'আমাদের চেঁচামেচি শুনে সাধারণ

কৌতূহল হয়েছিল, দেখতে এসেছিল। অন্য কিছু না।'

'তা ছাড়া আরেকটা কথা ভুলে যাচ্ছ,' বব বলল, 'ভয় পাওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে তারও।'

অনিতা ভয় পায়নি। রহস্যময় এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানার ইচ্ছে তার। কৌতূহল সামলাতে পারছে না। বলল, 'ওপরে গিয়ে দেখা যায় না?'

'সবার যাওয়া ঠিক হবে না,' জবাব দিল কিশোর। 'রবিন, মুসা—তোমরা আমার সঙ্গে এসো। ববের সঙ্গে মেয়েরা সব এখানেই থাকো।'

'তারমানে এ ক্ষেত্রেও মেয়েদের বেলায় অন্য বিচার,' রেগে উঠল অনিতা। 'তোমরা গিয়ে মজা করবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষি। বড় অন্যায়।'

'আমি তো মেয়ে নই, নাকি?' অনিতার কথার প্রতিবাদ করল বব। 'আমি তো থাকতে আপত্তি করছি না। অন্যায়ের কি দেখলে?'

জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল অনিতা।

'নাও, ধরো,' টিটুর শিকলটা বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'এর দায়িত্ব তোমার।' অনিতার কথায় কিছু মনে করেনি সে। দলে নতুন এসেছে। আস্তে আস্তে শিখে যাবে।

কিন্তু কোনমতেই হাসি ফুটল না অনিতার মুখে। মুখ গোমড়া করে রইল। কিশোরদের সঙ্গে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছে তার।

বাড়িটায় ঢুকে লিফটে উঠল কিশোর। ড্রেনে পড়ে থাকা ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাকটা সাথে নিয়ে এসেছে।

বোতাম টিপে দিল মুসা।

টপ ফ্লোরে লিফট থেকে নামল ওরা।

এখন? কোনদিকে যাবে?

ছয়

'ডানে যেতে হবে!' রবিন বলল। 'ভাল করে দেখে রেখেছি আমি।'

'তা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল। 'কিন্তু দরজা তো দুটো। কোনটায় টোকা দেব?'

প্রথম দরজাটায় গিয়ে কান পাতল মুসা। 'রেডিও বাজছে,' জানাল সে। 'পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে।'

হঠাৎ মেয়েমানুষের কণ্ঠ শুনতে পেল। দরজার একেবারে কাছে। চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল।

'জন, তোমার ওষুধ রাখলে কোথায়?' বৃদ্ধার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ। 'টেবিলেই রেখেছিলে? ঠিক মনে আছে?'

'এ ঘরে থাকবে না,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

সরে এসে দ্বিতীয় দরজাটায় গিয়ে কান রাখল মুসা। খানিকক্ষণ কান লাগিয়ে রেখে জানাল, 'কোন শব্দই আসছে না।'

'তারমানে আছে এটাতেই,' মাথা দোলাল রবিন। 'হয়তো ভয় পাচ্ছে কিডন্যাপকারীরা ফিরে আসবে আবার। আলো নিভিয়ে চুপ করে আছে।'

'বেল বাজালেই বোঝা যাবে,' কিশোর বলল। এমন করে হাতে নিল পোশাকটা, যাতে শুরুতেই লোকটার চোখে পড়ে। তারপর টিপে দিল বেলপুশ।

তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠল বেল। দরজার দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনে। যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে এখন।

কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া বা কোন রকম শব্দ এল না।

'রবিন, এ তলাটাই তো?' মুসার প্রশ্ন। 'ভুল হয়নি তোমার?'

'নিশ্চয়ই না!'

আবার বেল টিপল কিশোর। আবার শোনা গেল বেলের শব্দ।

'বাজাতে থাকো,' রবিন বলল। 'থেমো না। দেখা যাক কতক্ষণ না খুলে থাকতে পারে। ঘণ্টা বাজানো থামাতে হলে দরজা তাকে খুলতেই হবে। ও এই ঘরেই আছে।'

হাসল কিশোর। রবিনের পরামর্শটা পছন্দ হয়েছে তার। বাজাতেই থাকল।

অন্তত বিশবার বাজানোর পর দরজার ওপাশে হুক থেকে শিকল খোলার শব্দ পাওয়া গেল।

'বললাম না আছে!' উত্তেজিত স্বরে রবিন বলল। 'টিপতে থাকো।'

অবশেষে, খুব ধীরে সামান্য ফাঁক হলো দরজা। দেখা গেল ওকে। কিশোর ভেবেছিল, রেগে যাবে। কিন্তু শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তরুণ, 'কি ব্যাপার?'

কিশোর জবাব দেবার আগেই তার হাতের ফাদার ক্রিস্টমাস পোশাকটা দেখে ফেলল সে। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। দ্রুত নড়ে উঠল সে। এগিয়ে এসে একটানে পোশাকটা কিশোরের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মুহূর্তে লাগিয়ে দিতে গেল আবার দরজা।

কিন্তু তৈরি ছিল কিশোর। চোখের পলকে পা'টা ঠেলে দিল দরজার ভেতরে। পায়ে শক্ত জুতো ছিল বলে রক্ষা। নইলে পাল্লার চাপে প্রচণ্ড ব্যথা পেত।

মরিয়া হয়ে আবার দরজা লাগানোর চেষ্টা করল ফাদার ক্রিস্টমাস্।

'সরো!' চিৎকার করে উঠল সে। 'সরে যাও দরজার সামনে থেকে। ভাগো!'

'এর একটা ব্যাখ্যা না শুনে যাচ্ছি না আমরা,' জবাব দিল কিশোর।

'সব জানি আমরা,' মুসা বলল।

'কি জানো?' রেগে উঠল ফাদার ক্রিস্টমাস। 'ভাল চাও তো যাও বলে দিচ্ছি!'

'আমাদের আপনি ভয় দেখাতে পারবেন না,' জবাব দিল কিশোর। 'নিচে আমাদের বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। বলে দিয়ে এসেছি দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ফিরে না গেলে ওরা যেন পুলিশের কাছে চলে যায়।'

'পুলিশ!' চমকে গেল ফাদার ক্রিস্টমাস।

'অসুবিধে কি?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'জাল মুদ্রা পাচার, কিডন্যাপিং—আরও

কি কি করছেন সেটা আপনারাই ভাল জানেন। আমার ধারণা, বিশ বছরের কমে জেল থেকে বেরোতে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'ততদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন। চান সেটা?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ফাদার ক্রিস্টমাসের চেহারা। মনে মনে হাসল কিশোর। ধাপ্পাতে কাজ হয়েছে।

এই সময় লিফটের শব্দ কানে এল। ওপরতলায় উঠে আসছে।

'এসো! ভেতরে চলে এসো, জলদি!' গোয়েন্দাদের বলে আবার দরজা ফাঁক করে দিল ফাদার ক্রিস্টমাস। বোঝা গেল, পড়শীদের দেখতে দিতে চায় না।

কিশোররা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর জানতে চাইল ওরা কেন এসেছে। 'আধঘণ্টার মধ্যেই আমার বাবা-মা চলে আসবে। তোমাদের দেখলে খুশি হবে না।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'তার আগেই চলে যাব আমরা। অবশ্য যদি আমাদের বলেন, কেন করছেন এ কাজ।'

'কি কাজ করছি বলব? তোমাদের কথা কিছু বুঝতে পারছি না আমি,' জবাব দিল ফাদার ক্রিস্টমাস।

সত্যি বলছে! না ভান?

'পারছেন না মানে?' রেগে উঠল মুসা। 'জাল কয়েন পাচার করে বেড়াচ্ছেন, আর এখন বলছেন কিছু জানেন না? ওসব চালাকি বাদ দিন!'

'জাল কয়েন? কি বলছ? আমার কাছে কোন জাল কয়েন নেই।'

'তাহলে এগুলো কি?' পকেট থেকে দুটো মুদ্রা বের করে দেখাল কিশোর। 'আজ বিকেলে এগুলো আমাকে দিয়েছে আপনার দোস্ত।'

'আমি বিশ্বাস করি না!'

'তাহলে শুনুন কি ঘটেছে,' কিশোর বলল, 'বিকেল বেলা তাকে গিয়ে একটা ডলার দিয়ে ভাঙতি চাইলাম। বানিয়ে বানিয়ে বললাম, আমার বোনকে পঞ্চাশ পেন্স দেব একটা কার্ড কেনার জন্যে। মাকে উপহার দেব। শুনতে পাননি? কাছেই তো ছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে,' জবাব দিল লোকটা। 'কিন্তু ওগুলো জাল, কে বলল তোমাকে?'

কয়েন দুটো লোকটার কানের কাছে নিয়ে গিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা বাড়ি দিয়ে শব্দ করল কিশোর। 'শুনুন শব্দটা। কি মনে হচ্ছে? স্বাভাবিক?'

'এখনও বিশ্বাস না হলে আরও ভালমত প্রমাণ করে দিতে পারি,' রবিন বলল। 'একটা লোহাকাটা করাত নিয়ে আসুন। কাটলেই দেখতে পাবেন ভেতরে কি আছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম,' হাল ছেড়ে দিল লোকটা। 'করতাম না। কিন্তু যা সব কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করেছে, জাল কয়েন হলে আর অবাক হওয়ার কি আছে!'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। হাতে রয়ে গেছে এখনও ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাকটা।

'হয়তো তোমাদের কথাই ঠিক,' বলল সে। 'খানিক আগে আমাদের ওপর কেন হামলা চালিয়েছিল লোকগুলো, এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ এমন ভাবে আক্রমণ করে বসল...ভাবতেই পারিনি...'

'আসলে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল আপনাদের,' রবিন বলল। 'দুজনকেই। আপনি পালিয়ে আসাতে বেঁচে গেছেন। আপনার বন্ধুকে কোথায় নিয়ে গেল ওরা, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'জানলে কি আর এখানে বসে থাকতাম মনে করেছ?' জবাব দিল লোকটা।

'টাকার ব্যাপারটা কি বলুন তো? পঞ্চাশ পেন্সের জাল মুদ্রা? কোত্থেকে আসছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কাস্টোমারদের দেয়ার জন্যে প্রচুর ভাঙতি রাখতে হয় আমাদের,' লোকটা জানাল। 'ছবি তুলে অনেকেই দুই ডলার দেয়। এক ডলার দশ পেন্স রেখে বাকিটা ভাঙতি দিতে হয়। কয়েন রাখা ছাড়া উপায় কি। কিন্তু আমরা জাল কয়েন পাচার করছি এ ধারণা হলো কি করে তোমাদের?'

'আপনি নাহয় রাখেন না,' লোকটার প্রশ্নের জবাব দিল না কিশোর। 'কিন্তু আপনার বন্ধু?'

'তার কথা তাকেই জিজ্ঞেস কোরো,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা।

প্রশ্ন খুঁজে পেল না আর কিশোর। রহস্যটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে।

রবিন আর মুসাও বুঝতে পারছে না আর কি প্রশ্ন করা যায়। আগুপিছু বিবেচনা না করে হুট করে লোকটাকে অভিযুক্ত করে বসায় লজ্জা পাচ্ছে এখন তিনজনেই। মনে হচ্ছে, দুই ফাদার ক্রিস্টমাস–যাদেরকে ওরা সন্দেহ করেছে, দু'জনেই নির্দোষ।

'বুঝতে পেরেছি!' ওদেরকে চমকে দিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকটা। চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, একসঙ্গে সব বলতে গিয়ে কথাই বেরোতে চাইল না।

শান্ত থেকে ধীরেসুস্থে বলার অনুরোধ করল তাকে কিশোর।

'পঞ্চাশ পেন্সের মুদ্রা, না? গত হপ্তায় বনের মধ্যে কি পেয়েছি, কল্পনাও করতে পারবে না। বনের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে ডগলাস ফার্মের দিকে। সেই রাস্তার এক জায়গায় দেখি অনেকগুলো কয়েন পড়ে আছে। রাস্তার ধারে ঘাসের মধ্যে। তুলে নিলাম ওগুলো। তারমানে ওগুলোই ছিল তোমাদের এই জাল মুদ্রা। আমরা কল্পনাই করতে পারিনি। কে হারিয়েছে সে-খোঁজ নেয়ারও প্রয়োজন মনে করিনি। পরের দিন হেনরির দোকানে কাজে গেলাম। কুড়িয়ে পাওয়া পয়সাগুলো দিয়ে লোকের ভাঙতি শোধ করতে লাগলাম।'

'আমরা মানে কে কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমি আর আমার বন্ধু টনি। একটু আগে যাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

দম নেয়ার জন্যে থামল সে। তারপর বলল, 'আমার নাম রোভার।...এখন বুঝতে পারছ তো, কোনও ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত নই আমরা?'

'পয়সাগুলো পুলিশকে দিয়ে আসা উচিত্ ছিল আপনাদের,' গম্ভীর মুখে কিশোর বলল। 'তাহলে আজকে আর এই ঝামেলার মধ্যে পড়তে হত না।'

'জানি! কিন্তু নিজেকে আমাদের জায়গায় কল্পনা করলেই আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারবে!' রোভার বলল। 'খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। আমরা ছাত্র। বড়দিনের এই ছুটিতে কাজ করছি কলেজে পড়ার টাকা রোজগারের জন্যে। খদ্দের আকৃষ্ট করার জন্যে আমাদের ভাড়া করেছে হেনরি। ছবি তোলার টাকার লাভ সে নেয় না, সব আমরাই পাই। কাজেই সব খরচ-খরচাও আমাদের। ফিল্মের দাম, দামী ক্যামেরার ভাড়া ইত্যাদির খরচ মিটানোর পর লাভ খুব কমই থাকে আমাদের।'

'টাকার দরকার কার না আছে?' রোভারের এ সব কৈফিয়তে মন ভিজল না মুসার। 'তাই বলে রাস্তায় পাওয়া টাকা তুলে নিতে হবে? ক্ষতি যা করার করে ফেলেছেন। এখন পস্তানো তো লাগবেই।'

চুপ করে রইল রোভার।

কিশোর বলল, 'আমরা এখনও জানি না ওই মুদ্রাগুলো এল কোত্থেকে? ওগুলোর সঙ্গে গালকাটা লোকটার সম্পর্ক কি?'

'গালকাটা?' বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল রোভার।

'যে লোকটা আপনার বন্ধু টনিকে কিডন্যাপ করেছে। যে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল হেনরির দোকানের সামনে।'

যতই শুনছে, বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে রোভার। জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যটার সন্ধান অনেক আগেই পেয়েছ মনে হচ্ছে?'

'মাত্র গতকাল,' জবাব দিল কিশোর।

'দেখো, একটা অনুরোধ করব,' কাতর কণ্ঠে বলল রোভার, 'দয়া করে পুলিশের কাছে যেয়ো না। গেলে হয়তো টনির সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক আছে, যাব না,' কথা দিল কিশোর। 'আমরা নিজেরাই এটা সমাধানের চেষ্টা করব।'

'কিন্তু বাড়ি ফিরে না গেলে টনির বাবা-মা যদি পুলিশে খবর দেন?' প্রশ্ন তুলল মুসা।

'তুলবে না,' রোভার বলল। 'কারণ ওরা এখানে নেই। ছুটি কাটাতে চলে গেছে হলিডে কটেজে। হেনরির দোকানে আমাদের ক্রিস্টমাস ইভের কাজ শেষ হয়ে গেলে টনিও চলে যাবে।...তা তোমরা এখন কি করার কথা ভাবছ?'

রীতিমত অসহায় বোধ করছে এখন রোভার। কাচুমাচু ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে।

'কয়েনগুলো যেখানে পেয়েছেন আপনারা, প্রথমে সেখানে যাব,' কিশোর বলল। 'আকাশ থেকে তো আর পড়েনি ওগুলো। কোন না কোন সূত্র পেয়েই যাব জায়গামত যেতে পারলে।'

'হুঁ!' উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে চোয়াল ডলল রোভার। 'কাল যে কি হবে বুঝতে পারছি না! টনিকে ছাড়া হেনরির দোকানের কাজটা চালাব কি করে? হেনরির সঙ্গে

আমাদের চুক্তি হয়েছে–বড় দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ওখানে কাজ করব আমরা। কাল যদি দু'জনের একজন হাজির হতে না পারি, কি বলবে সে?'

'সেটা নিয়ে ভাববেন না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'টনির বদলে আমাদের কাউকে দিয়ে দেব। রবিন যেতে পারে।'

'রবিন!' ভুরু কুঁচকে ফেলল রোভার।

কিশোরের কথা শুনে মুসা আর রবিনও চমকে গেল।

'হ্যাঁ, আমার এই বন্ধুটি,' রবিনকে দেখাল কিশোর। 'টনির চেয়ে সামান্য খাটো হবে। হাই হিল জুতো পরে নিলেই লম্বা হয়ে যাবে অনেকটা। বাকিটা পূরণ করে নেবে ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাক দিয়ে। আলখেল্লা আর দাড়ি-গোঁফের আড়ালে কেউ চিনতে পারবে না ওকে।'

'সত্যিই পারবে না!' মুসা বলল।

'আমি কি তোমাদের তদন্তে কোন সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রোভার।

'আপাতত লাগবে না,' কিশোর বলল। 'আপনি বরং খেয়েদেয়ে শান্তিতে একটা ঘুম দিন। তাজা না হয়ে কাল সকালে চাকরিতে যেতে পারবেন না।'

রোভারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাকে গুড নাইট জানিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

বেরোনোর আগে দরজার কাছ থেকে রবিন বলল, 'কাল সকালে দেখা হবে সকাল সাড়ে আটটায় আপনার এখানে চলে আসব আমি। ফাদার ক্রিস্টমাস সেজে আপনার সঙ্গে দোকানে যাব।'

'আহ্, বাঁচালে আমাকে, ভাই! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে,' কৃতজ্ঞ স্বরে বলল রোভার। 'তোমরা না এলে কি যে করতাম!'

কথা শেষ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। লিফটের কাছে ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেল রোভার।

'ভাবছি,' লিফটে করে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে নামতে বিড়বিড় করল কিশোর. 'আগামী কাল কি ঘটবে?'

সাত

'বাপরে, বহুত সময় লাগিয়ে দিলে!' তিন গোয়েন্দাকে লিফট থেকে বেরোতে দেখেই বলে উঠল বব। 'আমরা আর পাঁচ মিনিট দেখেই দেখতে যেতাম কি হয়েছে তোমাদের। এত দেরি করলে কেন?'

'কি বলল লোকটা?' জানতে চাইল ডলি।

'জাল পয়সাগুলো কি ওরাই বানাচ্ছে?' অনিতার প্রশ্ন।

'অন্য লোকটার খবর কি?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা। 'কোথায় ধরে নিয়ে গেল ওকে?'

সব প্রশ্নের জবাবই দিল কিশোর। জানাল, আগামী দিনের পরিকল্পনা।
'এখন আমাদের বাড়ি ফেরা দরকার,' বলল সে। 'ভাগ্যিস বাড়িতে বলে এসেছিলাম দেরি হতে পারে।'
সবাই বাড়িতে বলে এসেছে, বড়দিনের বাজার দেখতে যাচ্ছে ওরা।
তুষারপাতের বিরাম নেই। রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাত, সব তুষারে ঢেকে দিচ্ছে। বাস স্টপে যাওয়ার পথে অনবরত তুষারকণাকে ধাওয়া করে যেতে লাগল টিটু।
পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল ওদের, সারা গ্রাম সাদা তুষারে ঢেকে গেছে।
গরম কাপড়-চোপড়ে গা মুড়ে, মাথা ঢেকে ঘর থেকে বেরোল সবাই। কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে মিলিত হলো সকাল সাড়ে আটটায়। রবিন বাদে। সকালের বাসে শহরে চলে গেছে সে।
এত তুষার দেখে আনন্দে ফেটে পড়ার কথা ছিল ওদের। কিন্তু মগজে এখন অন্য চিন্তা। তুষারের বল বানিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা, কিংবা তুষারমানব বানানোর আগ্রহ নেই।
চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'ভাবছি, এত তুষারের মধ্যে ডগলাস ফার্মটা খুঁজে পাওয়া না কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জন্যে।'
কথা বলার সময় মুখ থেকে বেরোনো বাতাস সাদা ধোঁয়ার মত হয়ে যাচ্ছে।
'তোমাকে আগুন বের করা ড্রাগনের মত লাগছে, কিশোর,' হেসে বলল ফারিহা।
কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। হাসল না। কেউই হাসল না। রসিকতা করার মত মানসিক অবস্থা নেই এখন কারও।
'কিশোর ঠিকই বলেছে,' ডলি একমত হলো তার সঙ্গে। 'ফার্মটা খুঁজে পাব তো? তুমি বলার আগে ভাবিইনি। কি করে পাব? এই এত তুষারের মধ্যে? রাস্তার মধ্যে আরও কয়েন যদি পড়ে থাকে, থাকবে তুষারের নিচে ঢাকা। খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তারমানে কোন সূত্রও চোখে পড়বে না।'
'আগেভাগেই অত চিন্তা করে লাভ নেই,' মুসা বলল। 'আগে গিয়ে তো দেখি। পাওয়া না পাওয়া সে তো পরের ব্যাপার।'
টিটুর চিৎকারে ফিরে তাকাল ওরা। ছাউনির দরজার বাইরে চলে এসেছে সে। দৌড়ে চলে এল ওদের কাছে।
টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে গিয়ে আবার ঘরের ভেতর ঢোকানোর চেষ্টা শুরু করল ফারিহা।
'ও বুঝে গেছে, আমরা অভিযানে বেরোচ্ছি।' টিটুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর, 'উঁহু, নেয়া যাবে না রে তোকে, টিটু। তুষারে ভিজে সর্দি বাধাবি। মরবি তখন।'
'তা ছাড়া যাবি কি করে?' অনিতা বলল। 'আমরা তো যাব সাইকেলে।'
'সাইকেলে যেতে পারব কিনা সন্দেহ আছে,' বব বলল। 'তুষার কাটার মেশিন যদি আসে, রাস্তা সাফ হয় তাহলে পারব; নইলে হাঁটা ছাড়া গতি নেই।'
টিটুকে ভেতরে নেয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ফারিহা। কিন্তু

নিতে আর পারে না। করুণ আর্তনাদ শুরু করে দিল টিটু।

'ওকে নিয়েই যাই না কেন?' মুসা বলল। 'একটা টবোগান নিলে তাতে চড়ে দিব্যি চলে যেতে পারবে টিটু। ভিজবেও না। ঠাণ্ডাও লাগবে না।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা মন্দ না,' ডলি বলল।

'বেশ,' রাজি হলো অবশেষে কিশোর। 'কিন্তু সারাক্ষণ একা তো আমার পক্ষে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ভারী জিনিসটা।'

'তোমার একা টানার দরকার কি?' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল বব। 'পালা করে টানব আমরা সবাই।'

টিটুকে সবাই ভালবাসে ওরা। ওকে ফেলে যেতে মন চাইল না কারোরই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হলো গোয়েন্দাদের বিচিত্র মিছিলটা। ছয়টা সাইকেল, আর কিশোরের সাইকেলের সঙ্গে বাঁধা ছোটখাট স্লেজের মত একটা টানা গাড়ি। তাতে চড়ে আরামসে চলেছে টিটু।

তুষার কাটার গাড়ি এসেছে। মেইন রোডটা পরিষ্কার করার পর গলিগুলো সাফ করছে এখন। আগে আগে গেছে গাড়িটা। সুতরাং রাস্তা সাফ। এগোতে অসুবিধে হচ্ছে না গোয়েন্দাদের।

বিশাল যন্ত্রটার দুই পাশে একনাগাড়ে ছিটকে পড়ে উঁচু হয়ে পাড়ের মত জমে যাচ্ছে তুষার। যতই গাঁয়ের ভেতরে এগোচ্ছে, পুরু হচ্ছে তুষারের স্তর।

সবাই বেশ সতর্ক রয়েছে। কড়া নজর রেখেছে। কোনমতে ডগলাস ফার্মের রাস্তাটা চোখ এড়িয়ে যেতে দেবে না।

চিন্তা নেই একমাত্র টিটুর। টোবোগানে পা ছড়িয়ে বসে মহানন্দে ভ্রমণ করছে সে।

রবিন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রোভারদের ফ্ল্যাটের দরজায়।

হাতে দুটো ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাক, আর কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে এল রোভার।

'কোন খবর নেই নিশ্চয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'সবে তো সকাল হলো। তবে এতক্ষণে নিশ্চয় ডগলাস ফার্মের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সবাই।'

রাস্তায় নেমে হেনরির দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। মিল রোডের সেই অফিস বিল্ডিংটায় ঢুকে পোশাক পাল্টে ফাদার ক্রিস্টমাসের পোশাক পরে নিল, আগের দিন যেখানে খুলেছিল টনি আর রোভার।

বেরিয়ে যখন এল, সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। আর কে-ই বা খেয়াল করতে যাচ্ছে যে একজন ফাদার ক্রিস্টমাস আগের দিনের ফাদার ক্রিস্টমাসের চেয়ে সামান্য খাটো?

অবশেষে সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেল গোয়েন্দারা, যেখানে ডগলাসের ফার্মটা পাওয়া যাওয়ার কথা। একপাশে খোলা মাঠ, আরেক পাশে বন। বন আর মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে যাওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

মেঘে ভারী হয়ে আছে আকাশ। সীসার মত রঙ। দিনের আলোটাও কেমন বিচিত্র। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তুষারের কারণে। শামুকের গতিতে তুষার সাফ করতে করতে চলেছে তুষার কাটার যন্ত্রটা। সোজা চলে যাচ্ছে। পাশের গলিপথে নামার কোন ইচ্ছে নেই।

খোলা মাঠে অনেক বেশি পুরু হয়ে পড়েছে তুষার। তার মধ্যে সাইকেল নামানোর চেষ্টা করল মুসা। মুহূর্তে অর্ধেক চাকা দেবে গেল। মজা করার জন্যে তার মধ্যেই প্যাডাল করে সাইকেল চালানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু গেল কাত হয়ে তুষারের মধ্যে পড়ে। সবাই হাসতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলল মুসা।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কিশোর। একটা গাছের নিচে রেখে, সবাইকে রাখতে বলল। মুসার অবস্থা দেখেই বোঝা গেছে, গলিপথে সাইকেল চালানো কঠিন ব্যাপার হবে।

'গাছের নিচে থাকলে অন্তত ভিজবে না সাইকেলগুলো।' আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। 'চেহারা দেখেছ? আবার শুরু হবে তুষারপাত।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই এক কণা তুষার এসে পড়ল নাকের ডগায়।

'চলো, যাওয়া যাক!' হাঁটতে শুরু করল সে।

তুষার মাড়িয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। রাস্তার চিহ্নও চোখে পড়ছে না। গাছের ডালপালা সব নুয়ে পড়েছে তুষারের ভারে। নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের মাথায় খসে পড়ে, অদ্ভুত শব্দ করে ভেঙে ছিটকে যাচ্ছে চতুর্দিকে। দেখতে দেখতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা পাউডারের মত তুষারে সাদা হয়ে গেল ফারিহা।

'আজকে আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার সামিল!' ডলি বলল। সবার পেছনে পড়ে গেছে সে। ক্লান্তি আর ঠাণ্ডায় কাহিল।

'আরে এত তাড়াতাড়িই হতাশ হয়ে যাচ্ছ কেন?' বব বলল। 'কি ঘটবে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। ফার্মটা পাবই আমরা।'

ডলিকে উৎসাহ জোগানোর চেষ্টা করলেও কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না বব।

কিন্তু কিশোর সহজে দমার পাত্র নয়। এগিয়েই চলল সে।

ঘন হয়ে পড়ছে এখন তুষার। সীমিত করে দিচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। সামনে কয়েক হাতের বেশি নজরে আসছে না। সেজন্যেই গাড়িটাকে দেখার অনেক আগেই ওটার ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল ওদের।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'এ রাস্তা দিয়েই আসছে মনে হচ্ছে?' মিছিলের আগে আগে হাঁটছে সে। 'আমাদের দিকেই আসছে!'

'জলদি লুকাও!' সাবধান করে দিল কিশোর, 'গাড়িতে যে-ই থাক, আমাদেরকে তার দেখে ফেলা চলবে না।'

সবাই একমত হলো তার সঙ্গে। ওদের মনে হতে লাগল গাড়িটার মধ্যে বিপদ রয়েছে। কিন্তু কেন, সে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ। তুষারের মধ্যে দিয়ে যত দ্রুত পারল, দৌড়ে ঢুকে পড়ল আবার জঙ্গলে। গাছের নিচে ঘাপটি মেরে বসে রইল।

বাড়ছে ইঞ্জিনের শব্দ।

'অবাক কাণ্ড!' মুসা বলল। 'আসার পথে চাকার দাগ তো কোথাও দেখলাম না। আর এ রাস্তাটা থেকে অন্য কোন দিকে কোন রাস্তা বেরোয়নি। সোজা চলে গেছে—ডগলাস ফার্মই হোক, বা অন্য যে কোনখানেই হোক।'

নজরে এল গাড়িটা। বড়, কালো একটা গাড়ি।

একজন আরোহীকে দেখেই চিনে ফেলল অনিতা। গাছের গোড়ায় আরও সেঁটে গেল। লোকটার চোখে পড়তে চায় না।

গালকাটা!

তুষারের জন্যে ধীরে চলতে বাধ্য হচ্ছে গাড়িটা। চলে গেল পাশ দিয়ে।

ধরা পড়ার ভয়ে তুষারের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল গোয়েন্দারা। টিটুর মুখ চেপে ধরে রাখল কিশোর, যাতে শব্দ করতে না পারে। ইঞ্জিনের শব্দ পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার পর খুব সাবধানে মাথা তুলল।

'গেছে!' উঠে দাঁড়াল সে। 'দেখলে? কাল যে তিনজনকে দেখেছিলাম, ওরাই।'

'গেল কোথায়?' ফারিহার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় হেনরির দোকানে,' একসঙ্গে বলে উঠল বব আর অনিতা।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ডলি। 'রবিন আছে না ওখানে!'

'আছেই তো! অত ভয় পাবার কিছু নেই!' কিশোর বলল। 'এ সব কাজে নতুন নয় সে। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে। আমাদের কাজ আমরা করতে থাকি। ফার্মে গিয়ে জালিয়াতদের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করা দরকার। টনিকেও উদ্ধার করে আনতে হবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা দোলাল মুসা। 'ওদের এই শয়তানি খেলা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বন্ধ করা দরকার।'

'তারমানে বলতে চাইছ,' কিশোরের দিকে তাকাল বব, 'ডগলাস ফার্মের দিক থেকেই ওরা এসেছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এবং তারমানে,' অনিতা বলল, 'গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করে গেলেই পেয়ে যাব ফার্ম হাউসটা? কপালটা খুলতে আরম্ভ করেছে মনে হয়!'

'কিন্তু আমাদের পায়ের ছাপের কি হবে?' মনে করিয়ে দিল ফারিহা। 'ওদের চোখে পড়ে যাবে না সেগুলো?'

'তা তো পড়তেই পারে,' জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু যে হারে তুষার পড়ছে, দেখতে দেখতে ঢেকে যাবে। তা ছাড়া গাড়ি চালানোর সময় সর্বক্ষণ ওয়াইপার চালাতে হয়। সামনে হাতি দাঁড়িয়ে থাকলেও এর মধ্যে দিয়ে দেখাটা কঠিন। তা ছাড়া দাগ থাকতে পারে সন্দেহ করলে তবে তো দেখার চেষ্টা করবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা দোলাল কিশোর। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু সাবধানের মার নেই। সুতরাং কোন রকম ঝুঁকি নিতে আমি নারাজ। রাস্তা ছেড়ে এখন থেকে বনের ভেতর দিয়েই এগোব।'

যাত্রা শুরুর ইঙ্গিত পেয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে আবার টবোগানে চড়ল টিটু।

তাকে টেনে নেয়ার পালা এখন ববের।

বনের ভেতর দিয়ে চলতে রাস্তার চেয়ে খাটনি কম লাগল। তুষার কম। গাছপালা থাকায় রাস্তার মত পুরু হয়ে পড়তে পারেনি।

প্রায় মাইল দেড়েক এগোনোর পর খামারবাড়িটার চালা চোখে পড়ল ওদের। ডগলাস ফার্ম। বুঝতে পারল, তার কারণ, রাস্তায় গাড়ির চাকার যে দাগ রয়েছে, সেটা শুরু হয়েছে বাড়িটার গেটের কাছ থেকে।

'দাঁড়াও!' হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল কিশোর। 'শুনতে পাচ্ছ?'

বনের কিনারে যে যেখানে ছিল, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। কান পাতল।

ফার্মের ভেতর থেকে গুঞ্জনের মত একটা শব্দ কানে আসছে। অথচ বাড়িটা নির্জন মনে হচ্ছে। কাউকে চোখে পড়ছে না।

তিনজন লোককে গাড়িতে করে চলে যেতে দেখেছে।

তাহলে ভেতরে শব্দ হচ্ছে কিসের?

আট

'কোন ধরনের মেশিন-টেশিন হবে,' বব বলল অবশেষে।

'ফার্মের ভেতর থেকেই আসছে শব্দটা,' অনিতা বলল।

'আমি যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'দেখে আসিগে। তোমরা সব এখানেই থাকো।'

'আমি আসি,' মুসা বলল।

'না, তুমিও থাকো। লোক তো নিশ্চয় আছে। আমাকে ধরে ফেলতে পারে। দু'জন ধরা পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভাল।'

কেঁপে উঠল ডলি। ঠাণ্ডায় না ভয়ে বোঝা গেল না। রবিনের কথা মনে পড়ল তার। টনিকে যে ভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছে, রবিনকেও করবে না তো? বলা যায় না, কিশোরকেও আটকে ফেলতে পারে। তখন কি হবে?

'কিশোর, সাবধানে থেকো,' ফারিহা বলল।

টিটু কি বুঝল কে জানে, চাপা স্বরে গরগর করে উঠল। কিশোরের সঙ্গে যেতে চায় বোধহয় সে-ও।

'তোর যাওয়ার দরকার নেই,' হেসে বলল কিশোর। 'সবার সঙ্গে থাক।' আদর করে মাথা চাপড়ে দিল কুকুরটার।

পা বাড়াল সে। বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। দৌড় দিল খামারবাড়িটার দিকে। যত তাড়াতাড়ি পারল ছুটে এসে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল বাড়ির পাথুরে দেয়ালে। কান পেতে শুনতে শুনতে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ দেখে ফেললে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এল না কেউ। কানে আসছে একটানা গুঞ্জনের মত শব্দ। কাছে থেকে জোরাল শোনাচ্ছে। মেশিনই।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পা টিপে টিপে, দেয়াল ঘেঁষে জানালার দিকে

রওনা দিল সে। তুষারে চাপা পড়ে যাচ্ছে জুতোর শব্দ। ভালই। মনে মনে তুষারকে ধন্যবাদ দিল সে।

কয়েক পা এগিয়ে আবার থেমে গেল। সতর্ক হয়ে উঠেছে প্রতিটি ইন্দ্রিয়। সামান্যতম বিপদের গন্ধ দেখলেই দেবে দৌড়।

পার হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড। কিছুই ঘটল না।

আবার পা বাড়াল সে। জানালার কাছে এসে সাবধানে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল ভেতরে।

প্রথমেই চোখে পড়ল টনিকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মেঝেতে। একটা লোক বসে আছে তার কাছে। জানালার দিকে পেছন করে। কিশোরকে দেখতে পেল না।

ঠোঁট গোল করে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। কিন্তু শব্দ বের করল না। আরেকটু কাত হয়ে তাকাল ভাল করে দেখার জন্যে।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে আছে বাকি সবাই। কিশোরের প্রতিটি নড়চড়া লক্ষ করছে। বুকের মধ্যে প্রবল বেগে লাফাচ্ছে তাদের হৃৎপিণ্ড।

'নিশ্চয় কিছু দেখেছে!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা।

'কি দেখল?' উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল ডলি। আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গেছে।

তাকে সাবধান করে দিল মুসা।

'কি দেখেছে, এখুনি জানা যাবে,' অনিতা বলল। 'ওই যে, ফিরে আসছে সে।'

দৌড়ে আসছে কিশোর।

সামান্য সময়ের জন্যে থেমেছিল, আবার পুরোদমে পড়তে আরম্ভ করেছে তুষার।

'টনিকে দেখে এলাম!' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'বেঁধে মেঝেয় ফেলে রেখেছে।'

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে! ওরা মানুষ না!' দাঁত কিড়মিড় করল মুসা।

'মাত্র একজন লোক আছে পাহারায়,' জানাল কিশোর। 'ওকে সরিয়ে দিতে হবে, যাতে টনিকে মুক্ত করতে পারি।'

'বলা সহজ, করা কঠিন,' বব বলল। 'গিয়ে বললেই তো আর সরে যাবে না।'

'তা তো যাবেই না,' হেসে বলল কিশোর। 'তবে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ছোট ছোট কিছু পাথর জোগাড় করা দরকার।'

'তুষারে ঢেকে আছে সব, পাব কোথায়?' অনিতা বলল, 'আর কোন বুদ্ধি বের করতে পারো না?'

'না, পারি না। এটাই একমাত্র বুদ্ধি। সময় আছে আমাদের হাতে। পাথর জোগাড় করা অসম্ভব হবে না।' কিছুটা কর্কশ কণ্ঠেই জবাব দিল কিশোর, 'তুমি

পারলে অন্য কোন বুদ্ধি বের করোগে। আমি পাথর দিয়েই কাজ সারতে চাই।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে গাছের গোড়ার তুষার সরাতে শুরু করল সে। নিচের মাটি পাথরের মত কঠিন। পাথর খুঁড়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হলো, কিন্তু বের আর করতে পারল না।

'নাহ্, খোঁড়ার জন্যে দিনটা আজ বড়ই প্রতিকূল!' বিরক্ত কণ্ঠে বলে টিটুকে ডাকল, 'টিটু, আয় তো এদিকে।'

দুই লাফে কাছে চলে এল টিটু।

পাথুরে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে হুকুম দিল কিশোর, 'খোঁড়।'

কিশোর কি চায়, এক কথাতেই বুঝে ফেলল বুদ্ধিমান কুকুরটা। খোঁড়ার কাজে মানুষের আঙুলের চেয়ে তার নখ যে কত বেশি দক্ষ, বুঝিয়ে দিল পলকে। একের পর এক পাথর খুঁড়ে তুলে ফেলতে লাগল সে।

ডজনখানেক পাথর তোলার পর তাকে থামতে বলল কিশোর। 'হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ তোকে। এনে ভালই করেছি। বাড়ি গিয়ে দুটো বড় বড় হাড় পাবি।'

হাড়ের কথা শুনে আনন্দে হাঁক ছাড়তে গেল টিটু। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ চেপে ধরল ফারিহা। 'না না, টিটু! না!'

'বব,' পাথরগুলো দেখিয়ে বলল কিশোর, 'তুমি পাথর ছুঁড়বে। ওই যে কুয়াটা দেখছ, লোকটাকে ওদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো। এই সুযোগে আমি আর মুসা গিয়ে টনির বাঁধন খুলে দেব।'

'ঠিক আছে,' খুশিমনে রাজি হয়ে গেল বব। 'আশা করি মেয়েরাও আমাকে সাহায্য করতে পারবে। যত বেশি লোককে কাজে লাগানো যায়, তত ভাল। কি বলো? ডলি, ফারিহা আর অনিতা একেক জন একেক দিকে সরে যাক। সবাই মিলে ছুঁড়তে থাকলে বোকা হয়ে যাবে লোকটা। বুঝতে পারবে না কোন্‌দিক থেকে আসছে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' স্বীকার করল কিশোর। 'বেশ, রসদ ভাগ করে নাও তোমরা। প্রথম পাথরটা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে যাব আমি আর মুসা।'

খামারবাড়িটার চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল ডলি, ফারিহা, অনিতা আর বব। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। অপেক্ষা করছে কিশোর আর মুসা।

ঠকাস্ করে গিয়ে প্রথম পাথরটা পড়ল জানালার [illegible]ঠর ফ্রেমে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না গোয়েন্দাদের। দরজায় দেখা দিল লোকটা। ডানে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। প্রবল তুষারপাতের মধ্যে কিসের শব্দ হলো, বোঝার চেষ্টা করছে।

আরেকটা পাথর গিয়ে পড়ল। লোকটার কাছাকাছি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। এগিয়ে এল পাথরটার দিকে।

ঠকাস্! গোলাঘরের ঘুণে ধরা দরজায় গিয়ে লাগল তৃতীয় পাথরটা।

ঠকাস্! ঠকাস্!

আরও দুটো পাথর।

অবাক হয়ে ঘুরতে থাকল লোকটা। কুকুরের লেজের গোড়ায় মাছি বসে

বিরক্ত করলে সেটাকে ধরার জন্যে যেমন করে ঘুরিতে থাকে কুঁকুর। হয়তো ভাবছে, তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে পাথর-বৃষ্টিও শুরু হলো বুঝি!

'দেখতে যাচ্ছে না কেন?' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা। 'যাবে না নাকি?'

'ওর বেশি কাছাকাছি পাথর ফেলছে,' বিরক্ত হয়ে বলল কিশোর। 'ওদের বলে এলাম কুয়াটার দিকে নিয়ে যেতে।'

ঠকাস্!

ষষ্ঠ পাথরটা গিয়ে লাগল কুয়ার দেয়ালে।

এইবার পড়তে দেখল প্রহরী। সাধারণ পাথর। তারমানে আকাশ থেকে পড়ছে না। ভাল করে দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।

'চলো!' ফিসফিস করে মুসাকে বলে দৌড় দিল কিশোর।

এই তুষারপাতের মধ্যে পুরু তুষারের আস্তরণ মাড়িয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ানো সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া শব্দ করা যাবে না। ভাগ্য ভাল, পাথরটার দিকে গভীর মনোযোগ রয়েছে লোকটার। তাই অন্য কিছু খেয়াল করল না।

খোলা দরজা দিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল দুই গোয়েন্দা। টনির কাছে চলে এল।

'কিছু বলার সময় নেই এখন,' তাকে বলল কিশোর। 'আপনাকে ছাড়াতে এসেছি আমরা।'

পকেট থেকে পেন্সিল কাটার ছুরি বের করে লোকটার বাঁধন কেটে দিল।

টনির চোখে সতর্কতা দেখে আবার বলল, 'আমরা আপনার বন্ধু রোভারের বন্ধু।'

দড়ি কেটে বসা লাল হয়ে যাওয়া জায়গাগুলো ডলতে শুরু করল টনি। বলল, 'এই লোকগুলো জালিয়াত। কয়েন জাল করে। খুব খারাপ লোক। সব করতে পারে। ওরা আমাকে বলেছে, ওদের কয়েন ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি আমি। ওদেরই একজন কয়েনগুলো কোথাও দিয়ে আসতে যাচ্ছিল, রাস্তায় ব্যাগ ছিঁড়ে পড়ে যায়। হাতড়ে হাতড়ে যা পারে তুলে নিয়েছিল। তখন সব খুঁজে পায়নি অন্ধকার ছিল বলে। গোণা ছিল বোধহয়। পরে গুনে দেখে কম। আবার যায় তুলে আনতে। কিন্তু গিয়ে আর পায়নি একটাও। আমি আর রোভার তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলো খোঁজার জন্যে তখন লোক লাগাল ওরা। হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল...'

'জানি আমরা,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'গত হপ্তায় রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন আপনি আর রোভার।'

'ও, জানো!' টনি অবাক।

'গত তিনদিন ধরে এই জাল কয়েন নিয়ে তদন্ত করছি আমরা। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, কাল আপনাকে ধরে নিয়ে এল কেন ওরা?'

'বললামই তো, ওদের কয়েন মানুষকে দিয়ে ফেলেছি আমরা। সত্যি বলছি, একেবারে না জেনে। ওরা চায় না ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাক। এখানে কয়েনগুলো বানাচ্ছে ওরা, কিন্তু বাজারে ছাড়বে দূরের কোন শহরে নিয়ে গিয়ে।

যাতে সূত্র ধরে ধরে পুলিশ ওদের খুঁজে না পায়।'

'তাই!'

'কেন, মেশিনের শব্দ শুনছ না?' আঙুল তুলে মাটির দিকে দেখাল টনি। 'সেলারে বসে বানাচ্ছে।'

এতক্ষণে বোঝা গেল শব্দটা কম কেন। মেশিনটা রয়েছে মাটির নিচের ঘরে।

রক্ত চলাচল বন্ধ থাকায় উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হলো টনির। 'তিনজন লোক আছে ওখানে। ওই যে দেখো, ট্র্যাপডোর। সেলারে নামার দরজা।'

'এখুনি বেরিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের,' এত লোকের কথা শুনে সতর্ক হয়ে উঠেছে কিশোর। 'সোজা থানায় গিয়ে পুলিশকে জানাতে হবে।'

'না না, আর যা-ই করো, পুলিশের কাছে যেয়ো না!' কাতর অনুনয় শুরু করল টনি। 'লোকগুলো ভয়ঙ্কর। কাল ধরে এনেছে আমাকে। আজ আনতে গেছে টনিকে। এতক্ষণে হয়তো ধরে ফেলেছেও ওকে!'

সর্বনাশ! চমকে গেল কিশোর। টনিকে ধরলে রবিনকেও ধরবে ওরা! ছাড়বে না!

নয়

ওদিকে সমস্ত রসদ শেষ করে ফেলেছে বব বাহিনী।

খামারবাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। বেরোচ্ছে না কেন এখনও কিশোররা!

কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

ঝট্ করে বুদ্ধিটা উদয় হলো অনিতার মাথায়। বিপজ্জনক। কিন্তু কার্যকরী। বলল, 'যে কোন ভাবেই হোক, লোকটাকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে, কিশোররা না বেরোনো পর্যন্ত।'

বলে আর দেরি করল না। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সোজা হাঁটা দিল লোকটার দিকে।

স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বব, ডলি আর ফারিহা। কি করতে যাচ্ছে অনিতা!

'তাজা বাতাস চাইছেন, তাই না?' হেসে বলল অনিতা।

ভীষণ চমকে গিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল লোকটা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ধমকে উঠল, 'এই মেয়ে, এখানে কি করছ!'

'না, কিছু করছি না। এমনি হাঁটতে বেরিয়েছি।'

হাঁটতে বেরিয়েছে! এই তুষারপাতের মধ্যে! জবাব খুঁজে পেল না লোকটা। আচমকা ফেটে পড়ল, 'মিথ্যে বলার আর জায়গা পাওনি! চাবকে তোমার চামড়া ছাড়াব!'

'কে ভয় পায় তোমাকে?' বুড়ো আঙুল দেখাল অনিতা।

ও কি করতে চায়, বুঝে গেছে এতক্ষণে বব। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাড়িটার দিকে দৌড় মারল। লোকটার অলক্ষে বাড়ির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল জানালার সামনে। চাপা স্বরে ডাক দিল, 'কিশোর, জলদি বেরোও! অনিতা লোকটাকে ব্যস্ত রেখেছে! বেশিক্ষণ পারবে না। জলদি করো!'

ট্র্যাপডোরটা দেখিয়ে মুসা বলল, 'নিচে আরও তিনজন রয়েছে।'

'থাক,' কিশোর বলল। 'ওদের ব্যবস্থা পরে করব। আগে গার্ডটাকে ঠেকানো দরকার।'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সে। পেছন পেছন এল মুসা আর টনি।

কুয়ার কাছ থেকে সরেনি লোকটা। জানালার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সামনে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মত তর্ক জুড়ে দিয়েছে অনিতা।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোররা। টনিকে সহ বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।

ওদের বেরোতে দেখেছে অনিতা। বুঝতে পারছে, আরও কিছুক্ষণ ব্যস্ত রাখতে হবে লোকটাকে।

স্বর নরম করে বলল, 'এমন করছেন কেন আপনি? আমি তো ক্ষতি করিনি। হাঁটতে বেরিয়েছিলাম...'

'এই তুষারপাতের মধ্যে নেকড়েরা হাঁটতে বেরোয় না, আর তুমি বেরিয়েছ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে? নিশ্চয় কোন মতলব আছে তোমার!'

'সত্যি বলব?' যেন কত গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে অনিতা, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে শুনুন কেন এসেছি। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম এদিকে। কুয়াটা দেখে কৌতূহল হলো। ঝুঁকে দেখতে গিয়ে আঙুল থেকে একটা আঙটি খসে পড়ে গেল কুয়ার মধ্যে। মা'র আঙটি। অনেক দামী। হীরা বসানো।'

লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ। মনে মনে হাসল অনিতা। টোপ গিলেছে হাঁদাটা। কুয়ার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল।

কাছে চলে এসেছে ততক্ষণে কিশোররা।

'কই, কিছু তো দেখছি না,' লোকটা বলল। 'টর্চ নিয়ে আসিগে।'

'তার আর দরকার হবে না,' বলেই পেছন থেকে তাকে জোরে ধাক্কা মারল টনি।

কুয়ার দিকে আরও ঝুঁকে গেল লোকটার দেহের ওপরের অংশ। দুই পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল কিশোর আর মুসা।

কুয়ার মধ্যে উল্টে পড়ে গেল লোকটা। কুয়ার মুখ দিয়ে বেরোনো তার চিৎকারটা কেমন অপার্থিব শোনাল।

'দারুণ দেখালে, অনিতা!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারল না কিশোর।

মাথা উঁচু করে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়াল অনিতা। ভাবখানা, গোয়েন্দা হিসেবে তোমার চেয়ে কম নই আমি।

তাতে কিছু মনে করল না কিশোর। হাসল কেবল তার দিকে তাকিয়ে।

দৌড়ে এল ডলি আর ফারিহা।

‘এ কি করলে?’ শঙ্কিত স্বরে বলল ডলি ‘যদি মরে যায়?’

‘মরবে না,’ কুয়ার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিল কিশোর। ‘পানি নেই। গভীরতাও কম। তবে সাহায্য ছাড়া উঠে আসতে পারবে না আর।’

নিচ থেকে চিৎকার শুরু করল লোকটা। তুলে আনার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। বার বার কাতর কণ্ঠে জানাতে লাগল, তার পা ভেঙে গেছে।

‘তুলে অবশ্যই আনা হবে,’ কিশোর বলল। ‘তবে আমরা নই। পুলিশে আনবে।’

ওপরে উঠে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে কিছুই করতে পারল না।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। ‘বাকি তিনটার ব্যবস্থা করতে হয় এখন। চলো যাই।’

নিচতলার তিনজনকে নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। জানলই না ওরা, আটকা পড়েছে। ওপর থেকে হুড়কো আটকে দেয়া হলো ভারী কাঠের ট্র্যাপডোরটার। তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো ঘরের মধ্যে যত ভারী ভারী জিনিসপত্র আছে, সব। কোনমতেই যাতে দরজা ভেঙে ওপরে উঠে আসতে না পারে লোকগুলো।

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে কিশোর বলল, ‘এখানকার কাজ শেষ। বাকি তিনজনকে ধরতে হবে এবার। রবিন আর রোভার বিপদের মধ্যে রয়েছে। জলদি চলো!’

আবার তুষার মাড়িয়ে দল বেঁধে ফিরে চলল ওরা। বনের মধ্যে দিয়েই এগোল এবারও। দুটো কারণে। এক, তুষার এখানে কম। দুই, গাড়ি নিয়ে যদি ফিরে আসে গালকাটা লোকটা, তাহলে যাতে ওর চোখে না পড়ে।

রাস্তার মাথায় যেখানে সাইকেলগুলো রেখে গিয়েছিল, তার কাছাকাছি আসতে ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ফাঁক দিয়ে তাকাল।

কালো গাড়িটাই। ফিরে যাচ্ছে খামারবাড়িতে। তুষারপাতের মধ্যে দূর থেকে গাড়ির আরোহীদের চোখে পড়ল না। তবে ওরা শিওর, রবিন আর রোভারকে কিডন্যাপ করে নিয়ে ফিরে এসেছে গালকাটা আর তার দুই সহকারী।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। জরুরী কণ্ঠে ববকে বলল, ‘বব, সোজা থানায় চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারো, পুলিশ নিয়ে ফিরবে। আমরা আবার খামারবাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। রবিনদের উদ্ধার করতে হবে।’

সময়মতই পুলিশ নিয়ে ফিরে এল বব। তার বন্ধুদের সবাইকে পেল ওখানে, কেবল রবিন বাদে। রোভারও নেই।

মাটির নিচ থেকে তিন জালিয়াতকে তুলে আনল পুলিশ। হাতকড়া লাগাল। কুয়া থেকেও তুলে নিল আহত লোকটাকে। আরও একজনকে পেল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায়; টনিকে যেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেখানে। তাকে কাবু করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি কিশোরদের। এতজনের বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারেনি লোকটা।

তার মুখেই জানা গেল সব ঘটনা। গালকাটা আর তার আরেক সঙ্গীকে নিয়ে হেনরির দোকানে গিয়েছিল সে। রোভারকে ধরে আনার জন্যে। কল্পনাই করেনি, ফাঁদ পেতে রাখা হবে ওদের জন্যে। তাতে পা দিয়ে বেমক্কা ভাবে ধরা পড়েছে গালকাটা আর তার সহকারী। গাড়িতে ছিল তৃতীয় লোকটা। দু'জনকে বন্দি হতে দেখে গাড়ি নিয়ে পালাল। তবে শেষ রক্ষা করতে পারল না।

ঘটনাটা কি ঘটেছে পরে রবিনের মুখে জেনেছে কিশোররা। দোকানের দরজায় ফাদার ক্রিস্টমাস সেজে ছবি তুলে যাচ্ছিল ওরা। ভালই করছিল রবিন। কিন্তু রোভারের চেয়ে খাটো দেখে সন্দেহ করে বসেন দোকানের মালিক মিস্টার হেনরি। অগত্যা সব কথা খুলে বলতে হয় তাঁকে। গালকাটারা এলে ওদের ধরার জন্যে তাঁর সাহায্য চায় রবিন।

মিস্টার হেনরি আর কর্মচারীদের সহায়তায় ধরে ফেলা হয় দুই জালিয়াতকে।

পরদিন কিশোরদের ছাউনিতে আড্ডায় বসেছে সবাই। গ্রীনহিলসের পুলিশ কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকটের কথা উঠল। বড়দিনের ছুটি কাটাতে অন্য শহরে আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেছে ফগ।

'বেচারা ফগ!' জিভ চুকচুক করে আফসোস করল ফারিহা। 'দারুণ একটা রহস্য থেকে বঞ্চিত হলো। ফিরে এসে যখন শুনবে, আফসোসের আর সীমা থাকবে না তার।'

ফগের নাম শুনেই কান খাড়া করে ফেলেছে টিটু। কাকতালীয় ভাবে ঠিক এই সময় গেটের কাছে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। টিটু ভাবল, ফগ। আর ঠেকায় কে তাকে। ফগের গোড়ালি কামড়ানোর লোভে ঘেউ ঘেউ করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে দিতে বেরিয়ে চলে গেল।

হুড়মুড় করে তার পেছন পেছন ছুটে বেরিয়ে এল সবাই।

কিন্তু টিটুর মতই হতাশ হতে হলো ওদেরকেও। ফগ নয়, গাঁয়ের মুদী দোকানের ছেলেটা এসেছে মেরিচাচীর কাছ থেকে জিনিসপত্রের অর্ডার নিতে।

বিড়াল উধাও

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

পকেট থেকে দোমড়ানো চিঠিটা আবার বের করল মুসা। বিশবার পড়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। উন্মুখ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে রবিন ও ফারিহা। জোরে জোরে পড়তে লাগল সে:

প্রিয় মুসা,

একটা সুখবর আছে—আমার চাচা গ্রিনহিলসে একটা বাড়ি কিনেছে, তোমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। এই ছুটিতেই আসছি আমরা, ওটাতে উঠব। এরপর থেকে ওখানে বেড়াতে এলে এই বাড়িতেই থাকব আমরা। আশা করছি এবারেও একটা জটিল রহস্য পেয়ে যাব। খুব মজা হবে, তাই না? রবিন আর ফারিহাকে আমার ভালবাসা দিও। স্কুল ছুটি হলে আর একটা সেকেন্ডও দেরি করব না, রওনা হয়ে যাব।

কিশোর পাশা

মুসাদের বাগানের ছাউনিতে বসে আছে ওরা।

ফারিহা বলল, 'কিশোরকে আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তবে মাঝে মাঝে এত বেশি চালবাজি করে, রাগও লাগে। অবশ্য মজাও দেয়। এই যেমন ধরো, ব্যথা পেলে অদ্ভুত সব দাগ হয়ে যায় গায়ে। গতবার যে খড়ের গাদা থেকে পড়ল···ধুড়ুস···হাহ্ হাহ্!'

'আর রঙ কি হলো ওগুলোর! ইস্, আমারও যদি এমন দাগ হত!'

'কিন্তু এখনও আসছে না কেন সে?' রবিন বলল, 'খবর পেয়েছি পরশুদিন ছুটি হয়েছে। আশা করলাম, গতকালই চলে আসবে। এল না। আজ সকালে রওনা দিয়ে থাকলেও এতক্ষণে চলে আসার কথা। আসছে না কেন?'

ঠিক যেন তার প্রশ্নের জবাবেই বাগানের গেটে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর।

চিৎকার করে উঠল ফারিহা, 'ওই, এসে গেছে! টিটুর ডাক!'

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে বেরোল ওরা ঘর থেকে।

উত্তেজিত চিৎকার করে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে লাগল টিটু। তার পেছনে ভারিক্কি চালে হেলেদুলে এগিয়ে এল কিশোর।

'কেমন আছিস, টিটু?' গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'অনেক মোটা হয়েছিস!' রবিন বলল।

'খাওয়া-দাওয়া বেশি করিস বোধহয়!' বলল মুসা।

তোমার চেয়ে বেশি নিশ্চয় নয়?' কাছে এসে হেসে বলল কিশোর।
তার কোমর জড়িয়ে ধরল ফারিহা। 'কেমন আছ, কিশোর? ভাল, না?
কিশোরও ফারিহাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, ভাল। তোমরা ভাল?'
'আছি,' গম্ভীর হওয়ার ভান করে মুসা বলল।
'তোমার পরীক্ষা কেমন হলো?' জানতে চাইল রবিন।
হাসি চলে গেল কিশোরের মুখ থেকে। 'ওই একই রকম। ফার্স্ট কোন বৈচিত্র নেই!'
'আর দেখো কাণ্ড, মুখ গোমড়া করে মুসা বলল, 'শুধু পাস করার জন্যেই পড়তে পড়তে আমার জীবন শেষ। স্যারেরা বলে আমার মাথায় গোবর, মা-ও বলে গোবর। এতদিন বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন আর না করে পারছি না। নইলে এত চেষ্টার পরও খারাপ হয় কি করে?'
'থাক, পড়ালেখার কথা এখন থাক,' তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে কিশোর বলল। 'ওসব থেকে অনেক দূরে এখন আমরা। আ‍‍মী কয়েকটা হপ্তা শুধুই আনন্দ, শুধুই আনন্দ। নো পড়া, নো লেখা, নো শাসন...ছুটিটা না, সত্যিই একটা দারুণ ব্যাপার। ছুটি না থাকলে জীবনের মজাই থাকত না!'
সবাই একমত হলো কিশোরের সঙ্গে।
বাগানে উজ্জ্বল রোদ। ফুলগাছের মাথায় প্রজাপতি উড়ছে। ঘাসের ওপর বসে পড়ল ওরা।
'তারপর?' আসল কথায় এল কিশোর, 'কোন রহস্য পাওয়া গেছে?'
'নাহ্,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফারিহা, 'কিচ্ছু নেই! কয়েক হপ্তা ধরে ঝামেলা র‍্যাম্পারকটেরও দেখা নেই।'
'গেল কোথায়?'
'কি জানি,' হাত ওল্টাল রবিন।
'কোন ঘটনাই ঘটেনি?'
'ঘটনা?' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল মুসা। 'পাশের বাড়িতে নতুন লোক এসেছে, দুই বছর বাড়িটা খালি পড়ে থাকার পর। এটাকে ঘটনা বললে বলতে পারো।'
'মানুষগুলো রহস্যময়?'
'মনে হয় না। আমাদের চেয়ে বড় একটা ছেলেকে দেখি সারাক্ষণ বাগানে কাজ করে। মাঝে মাঝে শিস দেয়। খুব ভাল শিস দিতে পারে। প্রচুর বেড়াল আছে বাড়িটাতে।'
'বেড়াল?' খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না কিশোরকে। তবে টিটু কান খাড়া করে ফেলল। বেড়াল মানেই শত্রু, তাড়া করার আনন্দ।
'হ্যাঁ। মুখ, লেজ আর পা কালচে-বাদামী। শরীরটা মাখন রঙা। একটা মেয়ের হাতে দেখেছি একদিন একটাকে। অদ্ভুত দেখতে। এ রকম বেড়াল আর দেখিনি।'
'সিয়ামিজ ক্যাট। চোখ কি নীল?'
'জানি না। কাছে থেকে দেখিনি। কিন্তু বেড়ালের চোখ তো হয় সবুজ, নীল নয়।'

'সিয়ামিজ ক্যাটের গাঢ় নীল। অনেক দামী বেড়াল।'

'বাহ্, মজা তো!' ফারিহা বলল, 'একদিন গিয়ে দেখে আসতে হয়।'

'হ্যাঁ, যাব,' রবিন বলল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িটার মালিক কে? নাম কি?'

'লেডি অরগানন,' মুসা বলল। 'একদিনও দেখিনি তাঁকে। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকেন।'

টিটুর মনে হলো, তাকে তেমন আমল দেয়া হচ্ছে না। এগিয়ে এসে হাত-মুখ চেটে দিয়ে সবার নজর কাড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ হলো না। বেড়ালের কথা ভাবছে এখন সবাই, ঠেলে সরিয়ে দিল তাকে।

হঠাৎ দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা গেল শিস। পরিষ্কার, সুরেলা শব্দ।

'ওই ছেলেটাই,' ফারিহা বলল।

মুসা বলল, 'সুন্দর শিস দেয়, বলেছিলাম না!'

'চলো তো দেখি,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। দেয়ালে চড়ল। মুসা, রবিন আর ফারিহা নিচে রইল টিটুর সঙ্গে। ছেলেটাকে আগেও দেখেছে ওরা, তাই আর উঠল না।

কিশোর দেখল, ছেলেটার বয়েস পনেরো-ষোলো হবে। বয়েসের তুলনায় বেশ বেড়ে উঠেছে। আপেলের মত লাল গোলগাল মুখ। তাকে দেখে নীল চোখ মেলে তাকাল। প্রথমে অবাক হলো, তারপর হাসল ঝকঝকে বড় বড় সাদা দাঁত বের করে। দেয়ালের নিচেই ঘাসের মধ্যে নিড়ানি চালাচ্ছে সে।

কিশোর বলল, 'তুমিই তাহলে এ বাড়ির মালী।'

'না,' হাসিটা আরও চওড়া হলো ছেলেটার, 'আমি মালী নই, তার সহকারী। মালীর নাম মিস্টার হারপিগ। ইয়াবড় বাঁকা নাক, সাংঘাতিক বদমেজাজী।'

এটুকু শুনেই কিশোরের মনে হলো হারপিগ লোকটা ভাল নয়। তাকে দেখার জন্যে সারা বাগানে চোখ বোলাল, কিন্তু 'ইয়াবড় বাঁকা নাকটা' চোখে পড়ল না।

'তোমাদের এখানে নাকি অনেক বেড়াল আছে? দেখা যাবে? একদিন আসব?'

'হ্যাঁ, এসো। তবে হারপিগ যখন বাড়িতে না থাকে। তার ভাবসাব দেখলে মনে হবে, বাড়িটার মালিকই সে, মালী নয়। কাল বিকেলে এসো, তখন সে বাড়ি থাকবে না। এই দেয়াল টপকেই আসতে পারো। বেড়ালগুলোর দেখাশোনা করে যে মেয়েটা তার নাম আইলিন। মেয়েটা ভাল। দেখতে দেবে।'

'ঠিক আছে, আসব। ও, তোমার নামটা যেন কি?'

কিন্তু ছেলেটা জবাব দেয়ার আগেই রাগত কণ্ঠে ডাক শোনা গেল, 'আই পিটার, পিটার, ময়লাগুলো যে সাফ করতে বলেছিলাম, কানে যায়নি! নাহ্, এই কুঁড়ের বাদশাটাকে নিয়ে আর পারা যায় না!'

চমকে ফিরে তাকাল ছেলেটা। তার নীল চোখে ভয়। কিশোরের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, 'ওই যে, মিস্টার হারপিগ ডাকছে! আমি যাই। কাল এসো।'

তাড়াতাড়ি উঠে বাগানের পথ ধরে রওনা হয়ে গেল পিটার।

দেয়াল থেকে নেমে এল কিশোর। বন্ধুদের জানাল, 'ছেলেটাকে তো ভালই মনে হলো।'

'কি জানি,' কান চুলকাল মুসা। 'আমাদের সঙ্গে কথা হয়নি। কথা বলতে যাইইনি কখনও। তো, কি বলল?'

'কাল বিকেলে বেড়ালগুলো দেখতে যেতে বলল, মালী যখন থাকবে না। এই দেয়াল টপকেই পার হয়ে চলে যাব।'

'কিন্তু টিটু তো টপকাতে পারবে না,' ফারিহা বলল।

'না পারলে নেই, তাকে নেয়াও হচ্ছে না। বেড়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না তার।'

'বেড়াল' শব্দটা শুনেই আবার কান খাড়া করে ফেলল টিটু। ওপর দিকে নাক তুলে খোক খোক করে চিৎকার করল বার দুই। যেন বলতে চাইল, *হতচ্ছাড়া ওই জানোয়ারগুলো কোন কাজে লাগে না! একমাত্র তাড়া করতেই যা খানিকটা মজা!*

দুই

পরদিন বিকেলে আবার দেয়ালে চড়ে শিস দি কিশোর।

পিটার এসে বড় বড় সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এসো। মিস্টার হারপিগ নেই।'

এক এক করে মুসা, রবিন আর ফারিহাও দেয়ালে চড়ে বসল। ফারিহাকে নামতে সাহায্য করল পিটার। ওপাশ থেকে একনাগাড়ে ঘেউ ঘেউ করে চলল টিটু, দেয়াল আঁচড়াতে লাগল।

তার জন্যে খারাপ লাগল ফারিহার। চিৎকার করে বলল, 'টিটু, লক্ষ্মী কুকুর, তুই থাক! আমরা দেরি করব না!'

'না এনে ভাল করেছ,' পিটার বলল। 'এখানে কুকুর ঢোকা নিষেধ। বেড়ালকে বিরক্ত করবে। আইলিন বলে বেড়ালগুলো খুবই দামী।'

'তুমি কি এখানেই থাকো?' বড় বড় গ্রীনহাউসগুলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না, আমি থাকি আমার সৎবাবার কাছে। আমার মা মারা গেছে। ভাই নেই বোন নেই। এটাই আমার প্রথম চাকরি। আমার বয়েস পনেরো। নাম পিটার জোরানল।'

'আমি রবিন মিলফোর্ড। ওরা আমার বন্ধু কিশোর পাশা...মুসা আমান। ও ফারিহা হোসেইন, মুসার খালাত বোন।'

কথা বলতে বলতে গ্রীনহাউসের পাশ কাটিয়ে এল ওরা। তার ওপাশে চমৎকার একটা গোলাপ বাগান। বাগানের পরে সবুজ রঙ করা একটা সুন্দর বাড়ি।

অনেক বড় দুটো খোঁয়াড় দেখিয়ে পিটার বলল, 'ওই যে ক্যাট-হাউস, বেড়ালের ঘর। আর ও হলো মিস আইলিন ডেনভার। ওর কথা বলেছি তোমাদের।'

মোটাসোটা অল্পবয়েসী একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে বেড়ালের খাঁচার কাছে। পিটারের সঙ্গে চারটে ছেলেমেয়েকে দেখে কিছুটা অবাকই হলো। জিজ্ঞেস করল,

'তোমরা কি করে ঢুকলে?'
'ওপাশ থেকে এসেছি,' মিষ্টি হেসে জবাব দিল রবিন। 'দেয়াল টপকে। বেড়াল দেখতে। সাধারণ বেড়াল নয় এগুলো, তাই না?'
'মোটেও না। অনেক দামী।'
চিড়িয়াখানায় জন্তু-জানোয়ার রাখার জন্যে যেমন দেয়াল তুলে শিক দিয়ে ঘিরে খাঁচা বানানো হয়, ক্যাট-হাউসটাও তেমনি। ভেতরে অনেক বেড়াল, আকর্ষণীয় রঙ। একরকম রঙ সবগুলোর—মুখ, পা আর লেজ কালচে-বাদামী; শরীরটা মাখন রঙা। উজ্জ্বল নীল চোখ। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে মিউ মিউ করতে লাগল। স্বরটা সাধারণ বেড়ালের চেয়ে আলাদা।
'দারুণ তো!' রবিন বলল।
'আমার কাছে কেমন উদ্ভট লাগছে!' বলল মুসা।
'বেড়ালই তো? নাকি বানর?' ফারিহার প্রশ্ন।
হেসে উঠল অন্যরা।
'থাবা খেলে বুঝবে বানর না বেড়াল,' হেসে বলল আইলিন, 'যখন ধারাল নখ দিয়ে চিরে দেবে। এগুলো সব প্রাইজ ক্যাট। বেড়ালের শো-তে দেয়া হয়, অনেক টাকা আয় করে।'
'সবচেয়ে বেশি আয় করেছে কোনটা?' ফারিহা জানতে চাইল।
'এসো, দেখাচ্ছি।' আরেকটা ছোট খাঁচার কাছে ওদেরকে নিয়ে এল আইলিন। 'এই টিকসি, এদিকে আয়। দেখ, কারা এসেছে, তোর রূপ দেখতে।'
এগিয়ে এল একটা বিশাল বেড়াল, এটাও সিয়ামিজ। খাঁচার জালে গা ঘষতে লাগল। জোরে জোরে মিউ মিউ করছে। আদর করে তার মাথাটা চুলকে দিল আইলিন।
'ও একটা অসাধারণ বেড়াল, অনেক দামী,' ছেলেমেয়েদের বলল সে। 'এই তো মাত্র কয়েক দিন আগে হাজার ডলার পুরস্কার জিতেছে।'
সোজা হয়ে দাঁড়াল টিকসি। খাড়া করে ফেলল লেজটা।
ফারিহা বলল, 'দেখো দেখো, ওর লেজের কালো জায়গাটায় একটা মাখন রঙের রিঙ!'
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল আইলিন। 'আরেকটা বেড়াল ওখানে কামড়ে দিয়েছিল। লোম পড়ে গিয়েছিল। তারপর আবার গজিয়েছে। ওগুলো নতুন লোম, আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাবে। কেমন মনে হয় বেড়ালটাকে?'
'একই রকম দেখতে সব,' রবিন বলল। 'আলাদাটা কি হলো বুঝলাম না।'
'বোঝা মুশকিলই। তবে আমি চিনতে পারি। সবগুলো একসঙ্গে বসে থাকলেও বলে দিতে পারি কে কোনটা।'
নীল চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে টিকসি। কিশোরও তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একটা বেড়াল হাজার ডলার পুরস্কার জিতে ফেলে, অবাকই লাগে ভাবতে!'
'একটু বের করুন না ওকে,' অনুরোধ করল ফারিহা। 'ধরে দেখতে চাই। কামড়ে দেবে না তো?'

'না না, একেবারে পোষা,' আইলিন বলল। 'দামী বলেই ওভাবে খোঁয়াড়ে বন্ধ করে রাখি। খোলা রাখলে চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।'

একটা পেরেকে ঝোলানো চাবি নামিয়ে নিয়ে ঘরের তালা খুলল সে। টিকসিকে ধরে বের করে আনল। আদুরে ভঙ্গিতে তার হাতে গাল ঘষতে লাগল সুন্দর বেড়ালটা। মৃদু গরগর করছে। আস্তে হাত বাড়িয়ে তার মাথাটা ডলে দিতে গেল ফারিহা। তাকে অবাক করে দিয়ে লাফিয়ে এসে তার বাহুতে পড়ল বেড়ালটা।

'বাহ্, দারুণ বেড়াল!' ফারিহা বলল। 'আমাকে পছন্দ করেছে...'

গোল বাধল এই সময়। তুমুল চিৎকার করে ছুটে এল টিটু, ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। মনিবের কাছাকাছি আসতে পেরে আনন্দে যেন পাগল হয়ে গেছে সে। ভীষণ ঘাবড়ে গেল টিকসি। লাফ দিয়ে ফারিহার হাত থেকে মাটিতে পড়ে একছুটে ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল টিটু। তারপর গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল। ঝোপের ভেতর থেকে শোনা গেল ক্ষিপ্ত বেড়ালের প্রচণ্ড হিসহিসানি।

চিৎকার করে উঠল আইলিন। হাঁ হয়ে গেল পিটারের মুখ, চোখে ভয়। একসঙ্গে উত্তেজিত মিউ মিউ শুরু করেছে খাঁচার বেড়ালগুলো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাঁক দিল কিশোর, 'টিটু, জলদি বেরো! এই টিটু! বেরোলি না? ছাল তুলে ফেলব কিন্তু!'

কোন হুমকিরই পরোয়া করল না টিটু। হাজার হোক, বেড়াল তাড়া করার সুযোগ পেয়েছে সে, এই আনন্দ থেকে কি আর নিজেকে বঞ্চিত করে।

পাগলের মত ঝোপের দিকে ছুটে গেল আইলিন। ডাল সরিয়ে উঁকি দিল। শুধু টিটুকে চোখে পড়ল। বেড়ালের থাবায় নাক কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে কুকুরটার, জিভ ঝুলে পড়েছে।

'টিকসি কোথায়!' চিৎকার করে যেন জানতে চাইল আইলিন। জবাব দিতে পারল না টিটু, ভাষা নেই তার। আবার চিৎকার করে উঠল আইলিন, 'সর্বনাশ, গেল কোথায়!' জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চুকচুক করে বিচিত্র শব্দ করে অভয় দিয়ে ডাকতে লাগল বেড়ালটাকে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ফারিহা। কাঁদতে শুরু করল। তার মনে হলো, পথের শেষ মাথায় একটা ঝোপের মধ্যে শব্দ শুনেছে, দেখার জন্যে দৌড় দিল সেদিকে।

ঠিক এই সময় মূর্তিমান আতঙ্কের মত সেখানে এসে হাজির হলো স্বয়ং হারপিগ।

স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল পিটার।

'কি হয়েছে? গোলমাল কিসের? এত ছেলেমেয়ে কেন এখানে?' প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল যেন ইয়াবড় বাঁকা নাকওয়ালা ভয়ঙ্কর বদমেজাজী লোকটা। 'আমার বাগানটা শেষ করে ফেলবে নাকি?'

লোকটার ব্যবহার ভাল লাগল না কিশোরের। বলল, 'এটা আপনার বাগান নয়, মিস্টার হারপিগ, লেডি অরগানের।'

ছেলেমেয়ে, কুকুর, বেড়াল, পাখি, কোন কিছুই পছন্দ করে না হারপিগ।

তারপর মুখের ওপর বলে দেয়া হয়েছে এটা তার বাগান নয়। রাগে ফেটে পড়ল সে, চিৎকার করে বলল, 'বেরোও, বেরোও এখান থেকে! আর যদি ঢুকতে দেখি কান ধরে বের করে দেব। তারপর গিয়ে বলব তোমার বাপকে। না বলে অন্যের বাড়িতে ঢোকো, আবার বড় বড় কথা! মিস ডেনভার, তোমার আবার কি হলো?'

'টিকসি চলে গেছে!' কেঁদে ফেলবে যেন আইলিন। ভাবভঙ্গিতে মনে হলো পিটারের মতই সে-ও ভয় পায় লোকটাকে।

'ভাল হয়েছে, খুব ভাল! চাকরিটা গেলে বুঝবে মজা! চাকরি পাওয়া অত সহজ নয়!' গজগজ করতে লাগল হারপিগ, 'আর মানুষও যে কত প্রকারের থাকে! বেড়ালও একটা প্রাণী, সেটাও আবার পোষা লাগে! ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদো কেন আবার? ওরকম একটা বেড়াল হারালে কি হয়?'

আইলিনকে বলল রবিন, 'আমরা থাকি কিছুক্ষণ? খুঁজে দিই?'

'বেরোও!' গর্জে উঠল হারপিগ। তার বাঁকা নাকের ডগাটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। পাথর হয়ে গেছে যেন চোখ দুটো। কুৎসিত চেহারা, খড় রঙা চুলের ডগা সাদা হয়ে এসেছে।

আর থাকতে সাহস পেল না গোয়েন্দারা—হারপিগের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মেরেই বসবে। দেয়ালের দিকে রওনা হতে যাবে এই সময় খেয়াল করল, ফারিহা নেই। ভাবল, মালীর ভয়ে আগেই অন্য কোনখান দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। টিটুকে আসতে ডাকল কিশোর।

'উঁহুঁ, ওটিকে নিতে দিচ্ছি না,' হারপিগ বলল। 'পাজী, বদমাশ কুকুর, শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেব আজ, যাতে আমার বাগানে ঢোকার আর সাহস না করে।'

'খবরদার, ওকে ছোঁবেন না!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিন্তু তার কথা কানেও তুলল না হারপিগ। কুকুরটার ঘাড় চেপে ধরে শূন্যে তুলে নিল। লম্বা পায়ে হাঁটা দিল ছাউনির দিকে।

দৌড়ে এগোল কিশোর। হাত ধরে টান দিল থামার জন্যে। থাপ্পড় দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিল হারপিগ। অবাক হলো কিশোর। ভাবতে পারেনি, বলেছে বলেই সত্যি মেরে বসবে লোকটা।

কুকুরটাকে ছাউনির ভেতর ছুঁড়ে ফেলে, দরজা বন্ধ করে, তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে দিল হারপিগ। তারপর কিশোরের দিকে তাকিয়ে এমন মুখভঙ্গি করল, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল কিশোর।

দেয়াল টপকে অন্যপাশে চলে এল তিন গোয়েন্দা। ঘাসের ওপর বসে হাঁপাতে লাগল। রাগে লাল। টিটুকে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ফারিহা কোথায় তা-ও জানে না এখনও।

'জঘন্য লোক!' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন।

'নামটা যেমন পিগ, স্বভাব আর চেহারাটাও পিগের মতই!' মুসা বলল। 'আস্ত শুয়োর!'

হাতের লাল হয়ে যাওয়া জায়গাটা দেখাল কিশোর, 'দেখো, এখানে মেরেছে।'

দূর থেকে টিটুর করুণ চিৎকার শুনে মুসা বলল, 'বেচারা!'

'কিন্তু ফারিহা কোথায়?' গলা চড়িয়ে ডাকল রবিন, 'ফারিহা! ফারিহা!

কোথায় তুমি?'

জবাব এল না।

'গেল কোথায়?'

'ঘরে ঢুকে গেছে হয়তো।' বলে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কিশোর, টিটুর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওকে ওখানে ফেলে রাখা যায় না। মালী-ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, ও সত্যি সত্যি মারবে।'

'আমি ভাবছি, গেল কি করে ওপাশে?' রবিন বলল, 'দেয়াল টপকানো কোনমতেই সম্ভব না ওর পক্ষে।'

'টপকায়ওনি,' কিশোর বলল। 'কোন ভাবে আন্দাজ করে নিয়েছে আমরা কোথায় আছি। তারপর এ বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে ও-বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছে।'

'আমি যাই,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'দেখি, ফারিহা কোথায় গেল? হারপিগকে দেখেই নিশ্চয় ঝেড়ে দিয়েছে দৌড়। আমরা ও-বাড়িতে না বলে গেছি এ কথা আম্মাকে বলে দিলে মুশকিলে পড়ব।'

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল সে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'নেই তো ঘরে! গেল কোথায়? ও-বাড়িতেই আটকে রইল নাকি?'

তিন

টিকসি কোথায় দেখার জন্যে ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল ফারিহা। তাকে দেখে ভয় পেয়ে উড়ে গেল একটা পাখি। বেড়ালটার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঝোপের মধ্যে দিয়ে এগোল সে।

হঠাৎ চোখে পড়ল, বড় বড় দুটো নীল চোখ গাছের ডাল থেকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। থমকে দাঁড়াল ফারিহা। চিৎকার করে উঠল আনন্দে।

'টিকসি, তুই এখানে! আর আমরা ওদিকে খুঁজে মরি!'

বেড়ালটাকে কি করে নামিয়ে আনা যায় ভাবতে লাগল সে। টিটুকে না সরানো পর্যন্ত টিকসিকে নামানো নিরাপদ নয়। আবার তেড়ে আসতে পারে। বরং বেড়ালটা এখন যেখানে আছে সেখানেই শান্তিতে থাকবে। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু গঁরগর করতে লাগল ওটা। ছোট্ট মেয়েটাকে পছন্দ হয়ে গেছে।

সহজেই গাছে চড়ল ফারিহা। একটা ডালে বসে বেড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। কথা বলল নিচু স্বরে। ভাল লাগল টিকসির। কালচে-বাদামী মাথাটা ফারিহার গায়ে ঘষে তার আদরের জবাব দিল। বেড়ে গেল গরগর।

এই সময় শোনা গেল হারপিগের ধমক। ভয় পেয়ে গেল ফারিহা। সর্বনাশ! মালী ফিরে এসেছে! রেগে যাওয়া চিৎকার শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগল সে। কি ঘটছে নেমে গিয়ে যে দেখবে সে-সাহসও নেই। বেড়ালটার পাশে চুপ করে বসে কান খাড়া করে রইল।

অনেকটা দূরে রয়েছে সে, সব কথা পরিষ্কার শুনতে পেল না। একটা সময় বুঝল, কিশোররা তাকে ফেলে দেয়াল টপকে চলে গেছে। আরও ভয় পেল সে। ভাবল, চুপি চুপি নেমে গিয়ে আইলিনকে বেড়ালটার কথা বলেই পালাবে। গাছ থেকে সবে নামতে যাবে, ঠিক এই সময় রাস্তা ধরে এগিয়ে এল পদশব্দ। পাতা সরিয়ে আস্তে গলা বাড়িয়ে দেখল, কান ধরে পিটারকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে হারপিগ।

'বাগানে ঢুকতে দিবি আর!' বলেই ঠাস করে এক চড় মারল মালী। ককিয়ে উঠল পিটার। 'কাজ করার জন্যে বেতন দেয়া হয় তোকে, মুফতে করিস না! পুরো দুই ঘণ্টা এখানে ওভারটাইম করতে হবে এখন, বিচ্ছুগুলোকে ঢুকতে দেয়ার শাস্তি!'

আরেকবার ছেলেটাকে চড় মারল হারপিগ, জোরে কান মোচড়াল, তারপর ধাক্কা দিয়ে তাকে পথের ওপর ফেলে দিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

পিটারের জন্যে খুব মায়া হলো ফারিহার। দু-গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে ছেলেটার। নীরবে কাঁদছে। রাগ হলো বদমেজাজী লোকটার ওপর। মানুষ না কি!

মালী চলে যেতেই চোখের পানি মুছে নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে শুরু করল পিটার।

আস্তে করে ফারিহা ডাকল, 'পিটার!'

এতটাই চমকে গেল ছেলেটা, নিড়ানিটা পড়ে গেল হাত থেকে। অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। কাউকে চোখে পড়ল না।

আবার ডাকল ফারিহা, 'পিটার! আমি এখানে! গাছের ওপর!'

এতক্ষণে ফারিহাকে দেখল ছেলেটা। টিকসির ওপরও চোখ পড়ল।

গাছ থেকে নামল ফারিহা। অনুনয় করে বলল, 'আমাকে দেয়ালের ওপাশে পার করে দেবে?'

'মিস্টার হারপিগ দেখলে এবার কান ধরে বের করে দেবে আমাকে। চাকরি হারিয়ে বাড়ি গেলে আমার সৎবাবাও ছাড়বে না, মেরে আধমরা করে ফেলবে,' কাঁদতে কাঁদতে লাল হয়ে গেছে পিটারের চোখ।

'থাক, তোমার চাকরি বাঁচুক। দেখি, আমি নিজেই চেষ্টা করে বেরিয়ে যাব।'

কিন্তু একা একা তাকে চেষ্টা করতে দিল না পিটার, চাকরি খোয়ানোর ভয় থাকা সত্ত্বেও না। তার মনে হলো, ছোট্ট মেয়েটাকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। গাছ থেকে টিকসিকে নামিয়ে নিয়ে, ফারিহাকে সঙ্গে করে নিঃশব্দে এগোল রাস্তা ধরে। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখছে হারপিগ চলে আসে কিনা।

টিকসিকে তার খাঁচায় ভরে দরজা লাগিয়ে দিল পিটার। ফিসফিস করে ফারিহাকে বলল, 'বেড়ালটা ফিরে এসেছে দেখলে খুশি হবে মিস ডেনভার। পরে আমি তাকে সব বলব। চলো তোমাকে দেয়ালের ওপর তুলে দিয়ে আসি।'

একসঙ্গে দেয়ালের কাছে দৌড়ে এল দু-জনে। পিটারের কাঁধে ভর রেখে দেয়ালে চড়ে বসল ফারিহা।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল পিটার, 'জলদি নেমে যাও! হারপিগ আসছে!'

কোনদিকে তাকানোর সাহস আর হলো না ফারিহার। লাফ দিয়ে পড়ল অন্যপাশে ঘাসের ওপর। বেকায়দা ভাবে পড়ে কনুই আর হাঁটু ছড়ে গেল।

মুসাদেরকে বসে থাকতে দেখে ছুটল তাদের দিকে। কাঁপছে থরথর করে।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'ফারিহা, কোথায় ছিলে এতক্ষণ!'

'কি করছিলে?' কিশোর জানতে চাইল। 'ইস্, হাঁটুটা তো একেবারে ছিলে ফেলেছ!'

'কনুইও ছিলেছে,' ডলতে ডলতে জবাব দিল ফারিহা। 'বেঁচে যে ফিরেছি এইই বেশি!'

হাত ধরে তাকে টেনে বসাল কিশোর। 'টপকালে কি করে দেয়াল? তোমার তো নাগাল পাওয়ার কথা নয়?'

'পিটার পার করে দিয়েছে। আহ্, বেচারাকে কি মারটাই না মারল হারপিগ! লোকটা সাংঘাতিক পাজী! আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে পিটারের চাকরিটাই যাবে এবার!'

'তারপরেও তোমাকে সাহায্য করল!' রবিন বলল, 'ছেলেটা তো খুব ভাল।'

'হ্যাঁ, ভাল। কিন্তু আমার জন্যে বেচারার চাকরিটা গেলে খুব খারাপ লাগবে। কেন যে গেলাম বেড়াল দেখতে! বিপদে ফেল······'

চিৎকার আর গোঙানির শব্দ কানে আসতে থেমে গেল ফারিহা। চারপাশে তাকাল। এই প্রথম খেয়াল করল কুকুরটা নেই। জানতে চাইল, 'টিটু কোথায়?'

জানানো হলো তাকে।

'সর্বনাশ, মেরে ফেলবে তো তাকে!' ফারিহা বলল, 'বের করে আনতে হবে! কিশোর, বসে আছ কেন?'

কিন্তু আবার হারপিগের সামনে যাওয়ার সাহস করতে পারল না কিশোর। যদি কোন ভাবে মালীর চোখ এড়িয়ে ছাউনির কাছে যেতে পারেও, তাহলেও লাভ নেই। চাবি রয়ে গেছে হারপিগের পকেটে।

'লেডি অরগানন বাড়ি থাকলে চাচীকে বলে তাঁকে একটা ফোন করাতে পারতাম,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'বলাতে পারতাম টিটুকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে। কিন্তু তিনিও তো নেই।' শার্টের হাতা গুটিয়ে হাতটা দেখল সে, যেখানে চড় মেরেছিল হারপিগ। ইতিমধ্যেই বেগুনী-নীল হয়ে গেছে জায়গাটা। 'এটা গিয়ে খালি একবার চাচীকে দেখালেই ডজনখানেক লেডির শান্তি নষ্ট করতেও দ্বিধা করবে না চাচী।' হাসল সে।

'চমৎকার দাগটা হয়েছে তো! এবার কিসের চেহারা হবে, বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'এখনও বোঝা যাচ্ছে না···'

'হায় হায়, টিটুর চিৎকার না! ঘরে আটকে থাকতে ভাল লাগছে না ওর। এই কিশোর, চলো আবার দেয়ালে চড়ে পিটারকে বলি, কুকুরটার সঙ্গে একটু আদর করে কথা বলতে। তাহলে হয়তো শান্ত হবে।'

মন্দ বলেনি ফারিহা, একমত হলো সবাই। দেয়ালে উঠে বসল মুসা। তাকাল এদিক ওদিক, কাউকে চোখে পড়ল না। পিটারের শিস শোনা গেল। মুসাও শিস দিল। বন্ধ হয়ে গেল পিটারের শিস, তারপর আবার শুরু হলো। একই সুরে শিস দিতে লাগল মুসা।

ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এল পিটার। মুখ বের করে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী? আস্তে কথা বলবে, মিস্টার হারপিগ শুনতে পাবে। কাছেই আছে।'

'ছাউনিতে গিয়ে কুকুরটাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পিটার। হারপিগ আসছে কিনা দেখতে দেখতে এগোল ছাউনির দিকে। দূরে দেখতে পেল তাকে। কোট খুলে গ্রীনহাউসের দেয়ালে গাঁথা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে কাজ করতে তৈরি হচ্ছে। পিটারকে দেখেই গর্জে উঠল, 'অ্যাই, কুঁড়ের বাদশা, নিড়ানি দেয়া শেষ হয়েছে? আয় এদিকে, টোমাটো গাছগুলোতে একটা ঝাড় দিতে হবে।'

অন্য কোন একটা কাজের কথা বলেই বোধহয় ঝোপে ঢুকে গেল পিটার। একটা গ্রীনহাউসে ঢুকল হারপিগ, দেখা যাচ্ছে না তাকে। হঠাৎ সাংঘাতিক দুঃসাহস দেখিয়ে বসল পিটার, একছুটে চলে গেল হারপিগ কোটটা যেখানে রেখেছে সেখানে। পকেট থেকে চাবি বের করে দৌড় দিল ছাউনির দিকে। তালা খুলে কুকুরটাকে বের করে দিল। টিটুকে দেয়ালের ওপর দিয়ে পার করে দেয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে ধরার আগেই দৌড় মারল ওটা।

তাড়াতাড়ি তালা লাগিয়ে ছুটে গিয়ে কোটের পকেটে চাবিটা আবার রেখে দিল। তারপর গিয়ে ঢুকল হারপিগ যে গ্রীনহাউসটায় ঢুকেছে সেটায়। আশা করল ঠিকমতই পথ চিনে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে টিটু।

কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলল কুকুরটা। গ্রীনহাউসের দরজার কাছে এসে পিটারকে দেখে আনন্দে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল হারপিগ।

'আরে, সেই কুত্তাটা না!' অবাক যেমন হলো, রাগও হলো মালীর। 'বেরোল কি করে? তালা দিয়েছিলাম তো! চাবি আমার পকেটে!'

'তালা দিয়েছেন আমিও দেখেছি,' পিটার বলল। 'এটা মনে হয় অন্য কুকুর।'

'এই কুত্তা, যা-যাহ্, সর!' হাত নেড়ে ধমক দিল হারপিগ।

কিন্তু পিটার ভেতরে আছে বলেই বোধহয় বাড়ি যাওয়ার বদলে গ্রীনহাউসে ঢুকে পড়ল টিটু। মাড়িয়ে ভেঙে দিল অনেকগুলো গাজরের ডাঁটা আর পাতা।

রাগে লাল হয়ে গেল হারপিগের মুখ। 'বেরো, বেরো শয়তান!' বলে চেঁচিয়ে উঠে টিটুকে সই করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল।

কেঁউক করে লাফ দিয়ে গিয়ে গাজরের খেতের মাঝখানে পড়ল টিটু। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে এখানে মজার কিছু নেই। গাজরের আরও কয়েকটা ডাঁটা আর পাতা ভাঙল।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল যেন হারপিগ। চিৎকার করে, পাথর ছুঁড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল টিটুকে।

তাতে আরও ঘাবড়ে গিয়ে পেঁয়াজ খেতের মধ্যে গিয়ে পড়ল টিটু। গাজরের সর্বনাশ করেছে, এবার পেঁয়াজের সর্বনাশ করতে লাগল।

থ্যাপ করে বড় একটা পাথর এসে পড়ল মাথায়। বিকট চিৎকার করে উঠল টিটু। মানুষের ভাষায় অনুবাদ করলে তার অর্থ দাঁড়াবে, 'গেছিরে, বাবা মারা গেছি, আমি শেষ!'

পিটারের সঙ্গে খাতির জমানোর ইচ্ছে একেবারে উবে গেল তার। বেরোনোর

জন্যে পাগল হয়ে গিয়ে ছুটতে লাগল এলোপাতাড়ি। আরও অনেকগুলো গাছ নষ্ট করার পর অবশেষে খুঁজে পেল গ্রীনহাউস থেকে বেরোনোর পথ। একছুটে বেরিয়ে এসে একটা রাস্তা দেখতে পেয়ে সেটা ধরে দিল দৌড়। পেছন ফিরে তাকাল না আর। বাগান থেকে বেরোতেই চোখে পড়ল মুসাদের গেট।

কিশোরদের চোখে পড়তেই ব্যথা ভুলে গেল সে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। গাল চেটে, দাপাদাপি করে অস্থির করে তুলল।

তাকে জড়িয়ে ধরে ফারিহা বলল, 'টিটু, এসেছিস! বাঁচিয়েছিস আমাদের! তোর জন্যে কি চিন্তাটাই না হচ্ছিল! বেরোলি কি করে? তোকে মেরেছে?'

'ও কি করে জবাব দেবে?' কিশোর বলল। 'কথা বলতে পারে নাকি।'

পিটারকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক করল ওরা। তার কখন ছুটি হবে সেই অপেক্ষায় রইল। বিকেল পাঁচটায় তার ছুটি হওয়ার কথা, কিন্তু সাতটার আগে তাকে ছাড়ল না অত্যাচারী হারপিগ। খাটিয়ে মারল।

রাস্তায় তাকে পাকড়াও করল গোয়েন্দারা। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'টিটু কি করে বেরোল জানো তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল পিটার। কি করে বের করে দিয়েছে কুকুরটাকে, সব খুলে বলল। শেষে বলল, 'গাছগুলো যখন ভাঙতে লাগল টিটু, তখন যদি মিস্টার হারপিগের মুখটা দেখতে, হাসতে হাসতেই মরে যেতে। এমন খেপা খেপেছিল...'

'তুমি সত্যি ওকে বের করে দিয়েছ?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, পিটার! কাজটা করার সময় তোমার ভয় লাগেনি?'

'লাগেনি মানে! বুকের মধ্যে এমন কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, মনে হচ্ছিল...যাকগে, টিটুকে নিরাপদে বের করে দিতে পেরেছি এতেই আমি খুশি। তোমরা নিশ্চয় খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ,' ফারিহা বলল। 'পিটার, তুমি খুব ভাল। আমাকে দেয়ালের বাইরে পার করে দিলে, টিটুকে বের করে দিলে। বন্ধু হয়ে গেলে আমাদের।'

'থাক, অত প্রশংসা করতে হবে না,' লজ্জা পেয়ে বলল পিটার। 'দরকার মনে করেছি, করেছি, ব্যস।'

'যা-ই বলো,' রবিন বলল, 'তোমার এই উপকারের কথা আমরা মনে রাখব। যে-কোন রকম সাহায্যের দরকার হলে চলে এসো আমাদের কাছে। আমরা করব।'

'আপাতত একটা সাহায্য করলেই চলবে,' হেসে বলল পিটার। 'আর কখনও দেয়াল টপকে বাগানে ঢোকার চেষ্টা কোরো না। আরেকটু হলেই আজ চাকরিটা আমার খেয়েছিলে!'

চার

লেখাপড়া জানে না, তবু ওদের খুব ভাল বন্ধু হয়ে গেল পিটার। আনন্দ দেয়ার মত

অনেক কিছু জানে সে। গাছের বাকল দিয়ে ফারিহাকে কয়েকটা চমৎকার বাঁশি বানিয়ে দিল। ওগুলো দিয়ে কি করে সুর তুলতে হয় শিখিয়ে দিল। এই অঞ্চলের সব জাতের পাখি চেনে সে, ওদের ডিম কেমন, কি ভাবে শিস দেয়, জানে। অবসর বলতে প্রায় কিছু নেই তার, তবু যতটুকু সময় পায় ওইটুকুতেই নতুন বন্ধুদেরকে নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরতে বেরোয়।

'আশ্চর্য,' মুসা বলল একদিন, 'ও তো রীতিমত একজন প্রকৃতিবিদ! অথচ লেখা জানে না পড়া জানে না...'

তার সঙ্গে গলা মেলাল রবিন, 'খোদাইয়ের কাজও কি ভাল করতে পারে দেখেছ! চোখের পলকে ছুরি দিয়ে কাঠ কেটে পাখি বানিয়ে ফেলে, ভালুক বানিয়ে ফেলে! ও একটা জিনিয়াস!'

'আমার জন্যে এখন একটা বেড়াল বানাচ্ছে ও,' গর্বের সঙ্গে জানাল ফারিহা। বলল, 'দেখতে একেবারে টিকসির মত হবে। এমনকি চুলের আগায় যে কয়েকটা মাখন রঙের লোম আছে, তা-ও করে দেবে। নীল রঙের চোখ।'

এর দু-দিন পর বেড়ালটা বানানো শেষ করল পিটার। দেয়ালের ওপাশ থেকে শিস দিয়ে ডাকল গোয়েন্দাদের। পুতুলটা দিল।

খুঁতখুঁতে কিশোর পর্যন্ত কোন খুঁত বের করতে পারল না। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, 'সুন্দর বানিয়েছ। রঙটাও নিখুঁত।'

বেড়ালটা দেখা শেষ হলে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তো, তোমার মিস্টার হারপিগের খবর কি?'

'আরও বদমেজাজী হয়েছে। কোন কুক্ষণে যে মরতে এসেছিলাম ওর কাছে চাকরি করতে! যতই কাজ করি, খুশি আর তাকে করতে পারি না। একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকি, কখন গিয়ে আমার সৎবাবার কাছে লাগায়। আমার সৎবাবা আমাকে দেখতে পারে না। শুনলেই পেটানো শুরু করবে।'

ছেলেটার জন্যে দুঃখ হলো গোয়েন্দাদের। এত ভাল একজন মানুষ, অথচ তারই কিনা এই অবস্থা। তার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে হলো ওদের।

রবিন বলল, 'আচ্ছা, আজ একজন মহিলাকে দেখলাম বাগানে ঘুরছেন। মাঝবয়েসী, রোগাটে, লাল নাক, চোখে চশমা—সেটা আবার বার বার নাক থেকে পড়ে যাচ্ছিল, চুলগুলো অদ্ভুত ভঙ্গিতে খোঁপা করা, তিনিই লেডি অরগানন, তাই না?'

'না,' পিটার বলল, 'তিনি লেডি অরগাননের অ্যাসিসটেন্ট, মিস টোমার। হারপিগকে সাংঘাতিক ভয় পান। ঘরের সমস্ত ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল সাজানোর দায়িত্ব তাঁর। বাগানে ফুল তোলার সময় সারাক্ষণ ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে থাকে হারপিগ, যেন একটা বুলডগ, সামান্য এদিক ওদিক হলেই দেবে কামড়ে। যেটা ছিঁড়তে যান সেটাতেই বাধা। হাঁ-হাঁ করে ওঠে: ওই গোলাপ ছিঁড়বেন না, আমার গাছটাই শেষ হয়ে যাবে তাহলে! পপি, বলেন কি? রোদের মধ্যে এই ফুল তোলে নাকি কেউ? সর্বনাশ করবেন নাকি আমার? আশ্চর্য!' ফিরে তাকিয়ে হারপিগ আসছে কিনা দেখল সে, তারপর বলল, 'এ ভাবে লেগে থাকলে ফুল তুলতে পারে নাকি কেউ, বলো? তাকে দেখলেই কাঁপুনি শুরু হয়ে যায় মহিলার। আমার

খারাপই লাগে তাঁর জন্যে।'

'সবাই দেখি ভয় পায় তাকে,' মুসা বলল। 'মানুষের সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার···একদিন পস্তাতে হবে লোকটাকে, দেখো। শাস্তি পেতেই হবে।'

'তোমার তো ছুটি হয়ে গেছে আজকে, নাকি?' ফারিহা বলল, 'এসো না, আমার বাগানটাও দেখে যাও। অনেক ফুলের কুঁড়ি বেরিয়েছে। ভাল লাগবে।'

দেয়াল টপকে মুসাদের সীমানায় ঢুকল পিটার। ফারিহার ছোট্ট বাগানটা দেখল। পুরানো একটা গোলাপ ঝাড়, একটা খুদে গুজবেরি ঝোপ, কয়েকটা ভার্জিনিয়া, লাল স্ন্যাপড্রাগন আর কিছু শারলি পপি।

'সুন্দর,' হাসল পিটার। 'গুজবেরি ঝোপটা থেকে ফল পাওয়া যায়?'

'না,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফারিহা। 'গত বছর দুটো স্ট্রবেরিও লাগিয়েছি—লাল লাল দুটো পাকা ফল পুঁতেছি—কিন্তু চারা গজাল না। নিজের গাছ থেকে তাজা ফল পাড়ার খুব ইচ্ছে আমার। কিন্তু গাছই হয় না, পাড়ব কি!'

হাসতে লাগল পিটার। 'স্ট্রবেরি ফল থেকে চারা গজায় না। কলম থেকে হয়। স্ট্রবেরির ডাল কেটে কি করে লাগাতে হয় দেখিয়ে দেব। কাল হারপিগের ডিউটি নেই। দেয়ালে উঠে ডাক দিও, কয়েকটা ডাল দিয়ে দেব।'

'তাতে কোন ক্ষতি হবে না তো? না বলে অন্যের জিনিস···'

'আরে না। এমনিতেই নিয়মিত স্ট্রবেরির ডাল ছেঁটে দিতে হয়। ছাঁটা ডাল জমে আবর্জনা হয় বলে পুড়িয়ে ফেলি। ফেলে দেয়া জিনিস থেকে দু-চারটে তোমাকে দিলে কি আর অন্যায় হবে?'

সুতরাং পরদিন সকালে দেয়ালে চড়ে বসল গোয়েন্দারা। পিটারকে ডাকতেই সে এগিয়ে এসে ফারিহাকে নামতে সাহায্য করল। নিয়ে গেল স্ট্রবেরি ঝাড়ের কাছে।

কি করে লাগাতে হয় বুঝিয়ে দিচ্ছে পিটার, এই সময় পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'ও কে?'

ফিরে তাকিয়ে ফারিহা দেখল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন মিস টোমার।

পিটার বলল, 'মিস টোমারকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মহিলা খুব ভাল।'

কাছে এসে ফারিহার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস টোমার। নাক থেকে চশমাটা খসে পড়ল। চেনে বাঁধা আছে, তাই মাটিতে পড়ল না। আবার জায়গামত ওটা বসিয়ে দিয়ে লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালেন তিনি। পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটা কে?' বলতে গিয়ে সামান্য ঝাঁকি লাগল, তাতেই আবার খসে পড়ে গেল চশমাটা।

'আমি ফারিহা,' নিজেই পরিচয় দিল সে। 'আপনাদের পাশের বাড়িতেই থাকি।'

'কি চাও?' ফারিহার হাতে স্ট্রবেরির ডাল দেখে বললেন মিস টোমার, 'ও, গাছ লাগানোর শখ বুঝি। ভাল।'

'আমি স্ট্রবেরি পুঁতেছিলাম, কিন্তু চারা হলো না। পিটার বলল স্ট্রবেরি হয় কলম থেকে। নিতে আসতে বলল আজকে। কি ভাবে লাগাতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিল।'

'ফল পুঁতেছিলে,' শব্দ করে হাসল মহিলা। 'তাহলে আর হবে কি করে। জানা না থাকলে কত বোকামিই যে করে মানুষ,' আবার হাসলেন তিনি। আবার খসে পড়ল চশমাটা।

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল ফারিহার কাছে। হেসে ফেলল। মিস টোমার ভাবল মহারসিকতা করে ফেলেছেন, সে-জন্যেই হাসছে ছোট্ট মেয়েটা, মজা পেয়ে আবার হাসলেন তিনি। খসে পড়ল চশমা।

'পড়ে যায় কেন?' না জিজ্ঞেস করে আর পারল না ফারিহা। 'নাক খুব সরু নাকি? বসে না ঠিকমত?'

'সরু নাক' কথাটায় খুব মজা পেলেন মহিলা। 'বাহ্, খুব মিষ্টি মেয়ে তো তুমি! ভাল মেয়ে! যাই, কাজ আছে।' গেল পড়ে চশমা। সেটা জায়গামত বসাতে বসাতে ঘুরে দাঁড়ালেন।

মিস টোমার চলে গেলে পিটারকে বলল ফারিহা, 'এইটুকু সময়েই ছয়বার পড়ল চশমাটা, তা-ও সাইজ ঠিক করিয়ে নেন না। বিরক্ত লাগে না তাঁর?'

'কি জানি। কত রকমের মানুষ যে থাকে দুনিয়ায়, কত রকম স্বভাব। আমি ভয় পাচ্ছি, গিয়ে না তোমার কথা হারপিগকে বলে দেন মিস টোমার!'

তার আশঙ্কাই সত্যি হলো। তবে ফারিহার ক্ষতি করার জন্যে নয়, কথায় কথায় ফাঁস করে দিলেন খবরটা। ছেলেমেয়েদের যে বাগানে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে হারপিগ, তা-ও জানা ছিল না তাঁর। ঘটনাটা ঘটেছে এ ভাবে: পরদিন সকালে গোলাপ তুলছেন, এই সময় নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল লোকটা। টের পেয়ে ফিরে তাকিয়ে হারপিগের ঈগলের মত দৃষ্টি দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন মহিলা।

'গুড মর্নিং, মিস্টার হারপিগ,' বললেন তিনি। 'গোলাপগুলো সুন্দর, তাই না?'

'গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলার পর আর সুন্দর থাকবে না,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল হারপিগ। 'আপনি তো এগুলোর সর্বনাশ করতেই এসেছেন।'

'সর্বনাশ করব না। কি করে তুলতে হয় জানি।'

'কি জানেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একটা বাচ্চা মেয়েও আপনার চেয়ে ভাল করে ছিঁড়তে পারে।'

বাচ্চা মেয়ের কথায় ফারিহার কথা মনে পড়ে গেল মিস টোমারের। ফুল থেকে প্রসঙ্গটা অন্যদিকে সরিয়ে স্বস্তি পাওয়ার জন্যেই বললেন, 'জানেন, কাল খুব সুন্দর একটা ছোট্ট মেয়ে বাগানে ঢুকেছিল। পিটারের কাছে এসেছিল।'

বাজ পড়ল যেন হারপিগের মাথায়। গর্জে উঠল, 'ছোট্ট মেয়ে! পিটার হারামজাদা কোথায়! চাবকে আজ ওর ছাল তুলব আমি!'

গটমট করে পিটারকে খুঁজতে চলল সে।

ভয়ে কেঁপে উঠলেন মিস টোমার। দিশেহারা হয়ে গেলেন। নাক থেকে চশমা খসে পড়ল। কল্পনাই করতে পারেননি এমন কিছু ঘটবে। পোশাকের লেস-কলারের সঙ্গে চশমাটা এমন ভাবে জড়িয়ে গেল, খুলতে পুরো বিশ মিনিট লাগল। বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'সাংঘাতিক খারাপ লোক! ইস্, কেন বললাম! ছেলেটাকে ধরে মারবে এখন! অহেতুক ছেলেটাকে বিপদে ফেলে দিলাম!'

আসলেও বিপদে পড়ল পিটার। ওর কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল

হারপিগ। ঘন ভুরুর নিচে পাথুরে চোখগুলোতে যেন আগুন জ্বলছে।

'কাল কোন্ মেয়ে এসেছিল? পাশের বাড়ির মেয়েটা, না?'

'ও কোন ক্ষতি করেনি, মিস্টার হারপিগ।'

'কি করেছিল সেটা তো জিজ্ঞেস করিনি!' চিৎকার করে বলল হারপিগ। 'এসেছিল কেন জানতে চাই! নিশ্চয় পিচফল চুরি করতে! নাকি জাম?'

ফারিহাকে চোর বলায় রেগে গেল পিটার। 'সবাই চোর নয়, মিস্টার হারপিগ। কিছু চুরি করতে আসেনি সে। আমিই আসতে বলেছিলাম, স্ট্রবেরির কয়েকটা কাটা ডাল দেয়ার জন্যে। গাছ লাগাবে।'

মুখ দেখে মনে হলো, ফেটে যাবে হারপিগ। তার বাগানের জিনিস তাকে না জানিয়ে দিয়ে দিয়েছে ছেলেটা, এত্তবড় সাহস! নিজেকে সামলাতে পারল না আর। ঘাড় ধরে পিটারকে টেনে তুলে পেটাতে শুরু করল। বেশ কয়েকটা চড়-থাপ্পড় দিয়ে তাকে ছেড়ে এগিয়ে এল দেয়ালের কাছে। দেয়ালের ওপর উঠে দেখল ছেলেমেয়েগুলোকে দেখা যায় কিনা।

সাইকেল নিয়ে বেড়াতে চলে গেছে তি গোয়েন্দা। অনেক দূরে যাবে বলে ফারিহাকে সঙ্গে নেয়নি। তাকে আর টিটুকে ফেলে গেছে। বাগানে খেলছে দু-জনে।

বল ছুঁড়ে মারল ফারিহা। সেটা আনার জন্যে দৌড়ে গেল টিটু।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ শুনে দেয়ালের দিকে ফিরেই পাথরের মত জমে গেল যেন ফারিহা। দেয়ালের ওপর বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে স্বয়ং হারপিগ।

পাঁচ

আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে ফারিহা। দৌড়ে পালাতে চাইল, কিন্তু পা উঠল না।

লাফ দিয়ে নামল ভয়ঙ্কর লোকটা। এগিয়ে এল। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কাল তুমি আমার বাগানে ঢুকেছিলে?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ফারিহা। কথা বলতে চাইল, স্বর বেরোল না মুখ দিয়ে।

'আমার স্ট্রবেরির ডাল এনেছ?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ফারিহা। ভয়ে ছাই হয়ে গেছে মুখ। ভাবছে, ডালগুলো এনে কি ভুলটাই না করলাম!

বিশাল থাবা দিয়ে ছোট্ট মেয়েটার কাঁধ চেপে ধরে ধমক দিয়ে হারপিগ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ওগুলো?'

অবশেষে মুখ ফুটল ফারিহার, 'ছাড়ুন! নইলে আমার খালাকে বলে দেব!'

'বলোগে, যাও! আমি বলব, চুরি করে এনেছ। পুলিশকে বলব। ফগর‍্যাম্পারকট এসে যখন তোমাকে আর পিটারকে নিয়ে গিয়ে গারদে ভরবে, তখন বুঝবে মজা।'

'ছোট মেয়েদের গারদে ভরে না পুলিশ!' ফুঁপিয়ে উঠল ফারিহা। তবে ভয়টা নিজের জন্যে নয়, পিটারের জন্যে।

'ডালগুলো কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করল হারপিগ।

তাকে নিয়ে চলল ফারিহা। তার বাগানটা দেখিয়ে দিল, যেখানে ডালগুলো পুঁতেছে।

এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে একটা ডাল তুলে কুটি কুটি করে ভাঙল হারপিগ। বাকিগুলোও এক এক করে তুলে ভেঙে ফেলে দিয়ে বলল, 'তুমি একটা খারাপ মেয়ে! আজ ছেড়ে দিলাম। আর যদি আমার বাগানে ঢোকো, সোজা পুলিশের কাছে যাব। ফগর‍্যাম্পারকট আমার বন্ধু। সে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে সব বলবে। আর পিটার শয়তানটার যে কি হাল করবে সে তো বুঝতেই পারছ।'

দুপদাপ পা ফেলে দেয়ালের কাছে গিয়ে লাফিয়ে ওঠার জন্যে তৈরি হলো হারপিগ। ঝোপের মধ্যে এতক্ষণ কি করছিল টিটু, কে জানে। হয়তো কোন ইঁদুর-টিঁদুর দেখে ওটার পেছনে লেগেছিল, ঝোপ থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল লোকটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। হারপিগ দেয়ালে ওঠার আগেই তার প্যান্ট কামড়ে ধরল।

বিকট চিৎকার করে উঠল হারপিগ, যেন তার পায়েই কামড়ে দিয়েছে কুকুরটা। বলতে লাগল, 'জলদি সরাও, জলদি সরাও তোমার কুত্তা!'

'টিটু, আয় আয়, কি করছিস!' তাকে ছাড়ানোর জন্যে দৌড়ে এল ফারিহা।

কিন্তু প্রতিশোধের সুযোগ পেয়েছে টিটু। সে কি আর ছাড়ে। কামড়ে ধরে রেখেই যতটা সম্ভব ভয়াল স্বরে গরগর করতে লাগল।

ভীষণ ভয় পেয়েছে হারপিগ। লাথি মেরে, ঝাড়া দিয়ে দিয়ে খসানোর চেষ্টা করল কুকুরটাকে। যে কামড় বসিয়েছিল টিটু, খসাতে পারত না, প্যান্টটা ছিঁড়ে গেল বলেই রক্ষা। রাগের চোটে কাপড়ের টুকরোটাকেই চিবাতে শুরু করল সে। এই সুযোগে একলাফে দেয়ালে চড়ে বসল হারপিগ। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল ফারিহার। বলতে লাগল, 'ওহ্, একটা কাজের কাজই করেছিস, টিটু! তুই একটা সাংঘাতিক কুকুর!'

সন্তুষ্ট হয়ে কাপড়ের টুকরোটাকে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে টিটু জবাব দিল, 'গর্‌র্‌র্‌র!'

হাসি থামলে ভাবতে বসল ফারিহা। ছুটে গিয়ে তক্ষুণি সব কথা খালাকে অর্থাৎ মুসার আম্মাকে বলতে ইচ্ছে করল। শুনলে রেগে যাবেন তিনি। লেডি অরগাননকে ফোন করে হারপিগের নামে নালিশ করবেন। লেডি অরগানন তখন লোকটাকে ডেকে ধমকে দেবেন। আর তাতে আরও রেগে যাবে হারপিগ। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে পিটারের ওপর। কারণে অকারণে মেরেধরে শেষ করবে তাকে।

পিটারের ক্ষতির ভয়েই খালাকে বলতে যেতে পারল না ফারিহা। বসে বসে কিশোরদের ফেরার অপেক্ষায় রইল। খালাকে বলার আগে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়া উচিত মনে হলো তার।

অনেক দেরি করে এল ওরা।

ফারিহাকে দেখেই বুঝে গেল কিশোর, কিছু একটা ঘটেছে। জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে।

সব খুলে বলল ফারিহা।

রেগেমেগে মুঠো নাচিয়ে মুসা বলল, 'নাম যেমন শুয়োর, স্বভাবটাও শুয়োরের মত! ধরে নাক ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে!'

রবিন বলল, 'কিন্তু গায়ের জোরে পারবে না তো। অন্য কোন ব্যবস্থা দরকার।'

'অন্য কি?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

টিটু কিভাবে কামড়ে দিতে গিয়েছিল জানাল ফারিহা। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। মুসার রাগ অনেকটা কমল।

খালাকে যে বলে দেয়নি, এ জন্যে ফারিহার প্রশংসা করে কিশোর বলল, 'না বলে খুব ভাল করেছ। ঝামেলায় পড়ে যেত পিটার। পিগটা যেমন শুয়োর, ফগটা তেমন হাঁদা। অহেতুক এসে ভয় দেখানো করত পিটারকে। ভয়ের চোটে পিটার বেফাঁস কিছু বলে ফেললেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢোকাত।'

পাঁচটা বাজল। গেটের কাছে দৌড়ে গেল ওরা। পিটারের ছুটির সময় হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। জানতে হবে, কতটা অত্যাচার করেছে তার ওপর হারপিগ।

পিটারকে দেখেই প্রশ্নের ঝড় তুলল ওরা।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'পিটার, তোমাকে কি খুব মেরেছে লোকটা? আমার কথা জানল কি করে?'

'নিশ্চয় মিস টোমার বলে দিয়েছেন। কেন যে বললেন বুঝতে পারছি না। শুনেই হারপিগ রেগে টং। আমাকে অনেক মারল। তারপর গিয়ে ঢুকল তোমাদের বাড়িতে। আজ আমাকে দিয়ে অনেক অতিরিক্ত কাজ করিয়েছে। শাস্তি দেয়ার জন্যে ইচ্ছে করে কঠিন কঠিন কাজগুলো করতে দিয়েছে। আর ভাল লাগে না, চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচতাম!'

'ছাড়ছ না কেন?' প্রশ্ন করল রবিন।

'এটা আমার প্রথম চাকরি। প্রথম চাকরিতে যতটা সম্ভব টিকে থাকার চেষ্টা করা উচিত, বদনাম হয়ে গেলে পরে চাকরি পেতে অসুবিধে হয়। তা ছাড়া বাড়িতে আছে আমার সৎবাবা। চাকরি ছাড়লেই পেটানো শুরু করবে। নানা রকম অত্যাচার করতে থাকবে। বেতনের অর্ধেকটা দিয়ে দিই তো তাকে, টাকা বন্ধ হয়ে গেলে খেপে যাবে।'

'মহাবিপদের মধ্যে আছ দেখছি!' মুসা বলল।

'তা বলতে পারো। এমন একটা বিপাকে পড়েছি, কাউকে যে বলব···আরি, ফগ আসছে কেন?'

চমকে গেল ফারিহা। 'হারপিগ খবর দেয়নি তো?'

'কি জানি!' পিটারও ভড়কে গেছে।

'চলো, দেখে ফেলার আগেই পালাই!' নিচু স্বরে বলল মুসা। 'এসেই আবার

ঝামেলা ঝামেলা শুরু করবে।'

কিন্তু ওরা সরে পড়ার আগেই ওদেরকে দেখে ফেলল পেটমোটা, লালমুখো পুলিশম্যান। এগিয়ে এল গদাইলশকরী চালে। গরগর করে উঠল টিটু। তারপর হঠাৎ দিল ছুট। পায়ে কামড় বসানোর জন্যে।

এ রকম কিছুর জন্যে তৈরি ছিল না ফগ। চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আহ্, ঝামেলা! এই, জলদি সরাও ওকে! ঝামেলা!'

'টিটু!' কঠিন স্বরে আদেশ দিল কিশোর, 'এদিকে আয়!' অহেতুক পুলিশী ঝামেলায় জড়ানোর কোন মানে হয় না।

কিন্তু তার কথা যেন কানেই ঢুকল না কুকুরটার। দারুণ একটা দিন যাচ্ছে আজ তার জন্যে। প্রথমে পেল হারপিগকে, এখন ফগর‍্যাম্পারকটকে। দু-জনের কাউকেই দেখতে পারে না সে, ওরা তার শত্রু। শত্রুর পায়ে কামড় বসানোর চেয়ে মজার আর কি আছে? কিশোরের ডাক শুনবে কেন।

'ঝামেলা! আহ্, ঝামেলা!' চেঁচিয়ে চলেছে পুলিশম্যান।

হেসে উঠল পিটার।

টিটুকে সই করে একটা লাথি হাঁকাতে যাচ্ছিল ফগ, হাসি শুনে মুখ তুলে তাকাল। 'হাসো! পুলিশের দিকে তাকিয়ে হাসো! সাহস তো কম না! বুঝবে মজা! ঝামেলা, না?'

'না, ঝামেলা নয়,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'ও পিটার। আমাদের বন্ধু। এই টিটু, এলি না?'

গেটের বাইরে চেঁচামেচি শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে বেরিয়ে এল হারপিগ। টিটুকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল, 'শয়তান কুত্তাটা আবার বেরিয়েছে! ওর নামে নালিশ আছে, বুঝলেন। রিপোর্ট করতে হবে। আমার পায়ে কামড়ে দিতে এসেছিল। প্যান্ট ছিঁড়ে ফেলেছে। ভীষণ পাজি কুত্তা!' চোখ পড়ল পিটারের ওপর। 'তুমি এখানে কি করছ! তোমার তো বাড়ি যাওয়ার কথা...'

তাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না পিটার। দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল। হারপিগের যন্ত্রণাতেই বাঁচে না, ফগের সঙ্গে জড়াতে চায় না আর।

আর কোন উপায় না দেখে কিশোরই গিয়ে টিটুর কলার চেপে ধরে সরিয়ে আনল।

'সাংঘাতিক কুত্তা! বাঘের চেয়ে খারাপ, বুঝলেন!' ফগকে বোঝাচ্ছে হারপিগ। 'রিপোর্ট করার জন্যে সাক্ষি চান তো? আমাকে পাবেন। লিখিত অভিযোগ করব।'

কিন্তু টিটুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ইচ্ছে নেই ফগের, জানে, রিপোর্টটা ক্যাপ্টেন রবার্টসনের চোখে পড়ে যেতে পারে। ভালর চেয়ে খারাপ হবে তখন। তবে ছেলেদেরকে খানিকটা হুমকি দেয়ার লোভ সামলাতে পারল না। পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে লেখা শুরু করে দিল।

তাকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে, কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে মুসাদের বাগানে ঢুকে পড়ল গোয়েন্দারা।

গেটের কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ফারিহা, 'টিটুকে জেলে ভরে দেবে না তো?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'কুকুরের জেলখানা আছে বলে শুনিনি।'

ছয়

এরপর থেকে দ্রুত ঘটে চলল ঘটনা। হঠাৎ করেই গোয়েন্দাদের সামনে ছুঁড়ে দেয়া হলো যেন একটা চমৎকার রহস্য।

পরদিন বিকেলে লেডি অরগাননের বাড়িতে চায়ের দাওয়াতে গেলেন মুসার আম্মা মিসেস আমান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। যাওয়ার সময়কার হাসিখুশি ভঙ্গিটা আর নেই, উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে। বাগানের কোণে বসে গল্প করছিল ছেলেমেয়েরা, তাদের কাছে এগিয়ে এলেন।

'কি হয়েছে জানো,' বললেন তিনি, 'লেডি অরগাননের একটা সিয়ামিজ ক্যাট হারিয়ে গেছে। খুব দামী। বড় মুষড়ে পড়েছেন মহিলা। পিটারই নাকি চুরি করেছে।'

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল মুসা। 'এ হতেই পারে না! ও আমাদের বন্ধু!'

'পিটার চোর নয়!' মুসার মতই জোর দিয়ে বলল ফারিহা।

'আমারও তাই ধারণা, আন্টি,' কিশোরের কণ্ঠে উত্তেজনার ছোঁয়া। 'পিটার এমন কাজ করবে না।'

এমন করে প্রতিবাদ করবে ছেলেমেয়েরা ভাবতে পারেননি মিসেস আমান। সুর নরম করে বললেন, 'আমি চোর বলছি না ওকে, তবে প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাকেই অপরাধী মনে হয়।'

'সে করেনি,' রবিন বলল। 'যদি কেউ করে থাকে তো ওই পিগটা...'

'হারপিগের কথা বলছ? কিন্তু সারাটা বিকেল ফগর‍্যাম্পারকটের সঙ্গে ছিল সে। ওই সময়ে তার পক্ষে চুরি করা অসম্ভব।'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

মিসেস আমানের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ধীরে ধীরে বলল, 'পিটার আমাদের বন্ধু, আন্টি। সে বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করব আমরা। আমি শিওর বেড়াল চুরির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। প্রয়োজন হলে এই রহস্যেরও সমাধান আমরা করব। আপনি যা যা জানেন খুলে বলুন।'

'আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল, তবে সবই করে ফেলতে পারবে এটা ভাবার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটাতে তোমাদের নাক গলানো উচিত না, এটা পুলিশের কাজ।'

কিশোরের গাল লাল হয়ে গেল। সবার সামনে এ রকম চাঁচাছোলা কথা শুনে লজ্জাই লাগল তার। চুপ হয়ে গেল।

জেদ ধরল মুসা, 'পারলে পারলাম না পারলে নেই। তোমার বলতে অসুবিধে কি? বলতেই তো এলে।'

দ্বিধা করলেন মিসেস আমান, তারপর বললেন, 'বেড়ালটার নাম টিকসি।

সকাল বেলা বেড়ালগুলোকে খাইয়ে, খোঁয়াড় পরিষ্কার করে বেরিয়ে গিয়েছিল আইলিন, বাসে করে শহরে গিয়েছিল, সারাদিন বাইরেই ছিল। অন্য বেড়ালগুলোর সঙ্গে বড় ঘরটায় ছিল টিকসি। একটা বাজার একটু আগে মিস টোমারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ালগুলো কেমন আছে দেখতে গেলেন লেডি অরগানন। তাঁকে দেখে হারপিগও এগিয়ে এল। টিকসি তখনও ছিল, তিনজনেই দেখেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেমেয়েরা।

মুসা বলল, 'তারপর? টিকসিকে কি তখনই শেষবারের মত দেখা গেছে?'

'না। বিকেল চারটেয় আমাকে বেড়ালগুলো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল মিস টোমার। চা দেয়ার সামান্য আগে। বেড়ালটা তখনও ছিল।'

'কি করে জানলে? মানে, ওটাই যে টিকসি বুঝলে কি করে? সবগুলো বেড়াল দেখতে একরকম। আমাদেরই তো আলাদা করে চিনতে কষ্ট হয়।'

মুচকি হাসলেন মা। 'এমন ভাবে বলছিস যেন তুই বেড়াল বিশেষজ্ঞ। চিনলাম কি করে? চিনিয়ে দেয়া হয়েছে। আরেকটা বেড়ালে কামড় দিয়ে তার লেজের কয়েকটা লোম খসিয়ে দিয়েছিল। পরে যেগুলো গজিয়েছে সেগুলোর রঙ বাদামী না হয়ে মাখনরঙা হয়ে গেছে। মিস টোমারই বলল এ সব, বেড়ালটাকে দেখাল। তারমানে বিকেল চারটায়ও খাঁচাতেই ছিল ওটা।'

'তারপর?'

'পাঁচটায় ফিরে এল হারপিগ। সঙ্গে করে নিয়ে এল গাঁয়ের পুলিশম্যান ফগর্যাম্পারকটকে। ফগ তার বন্ধু। অনেক বড় বড় টমাটো হয়েছে তার খেতে, সেগুলো দেখাতেই আসলে ফগকে এনেছে সে। খেত দেখাল, বাগান দেখাল, তারপর নিয়ে গেল বেড়াল দেখাতে। ওই সময়ই হারপিগ খেয়াল করল, টিকসি নেই।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছিল কিশোর, আনমনে বলল, 'আশ্চর্য! তারমানে বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে গায়েব হয়েছে বেড়ালটা।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিসেস আমান। 'বাগানে তখন পিটার ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে জানে বেড়ালটার অনেক দাম। হারপিগ বলেছে চুরির স্বভাব নাকি আছে ছেলেটার। না বলে কয়েকটা স্ট্রবেরির কলম কাকে দিয়ে ফেলেছিল।'

রাগে জ্বলে উঠল ফারিহার চোখ। পানি বেরিয়ে এল। হায়রে স্ট্রবেরির ডাল! কোন কুক্ষণেই যে ওগুলো আনতে গিয়েছিল পিটারের কাছে! খালাকে বলে দেবে কিনা ভাবল। সেটা বুঝতে পেরে চোখ টিপে তাকে বলতে নিষেধ করল কিশোর।

'ব্যস, এইই জানি,' মুসার আম্মা বললেন। 'চুরি করুক আর না করুক, তোদের বন্ধু পিটার যে বিপদে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেড়ালটাকে লুকাল কোথায়? চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কেউ তাকে দেখেনি। ইচ্ছে করলে ওই সময়ে ঝুড়িতে করে বেড়ালটাকে সরিয়ে রেখে আসতে পারে পিটার।'

'খালা, পিটার চুরি করেনি!' প্রায় কেঁদেই ফেলল ফারিহা। 'ও যে কত ভাল তা তুমি জানো না। অনেকগুলো বাঁশি বানিয়ে দিয়েছে ও আমাকে, টিকসির মত করে একটা পুতুল বানিয়ে দিয়েছে।'

গম্ভীর হয়ে মিসেস আমান বললেন, 'বাঁশি আর পুতুল বানিয়ে দিলেই কেউ ভাল

হয়ে যায় না। যার-তার সঙ্গে খাতির না করে দেখেশুনে বন্ধুত্ব করা উচিত তোমাদের। ও রকম একটা ছেলের সঙ্গে মেশাই উচিত হয়নি। কে ভাল আর কে মন্দ সেটা বোঝার মত যথেষ্ট বয়েস তোমাদের হয়েছে। যা করেছ করেছ, আর যেন পিটারের সঙ্গে কথা বলতে না দেখি।'

বাড়ির দিকে চলে গেলেন তিনি।

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল ছেলেমেয়েরা।

'পিটারের সঙ্গে কথা বলতে পারব না, এটা কোন কথা হলো না,' শুকনো গলায় বলল কিশোর। 'কথা ওর সঙ্গে আমাদের বলতেই হবে। সে আমাদের বন্ধু। বহুবার সাহায্য করেছে আমাদের। তার বিপদে আমাদেরও এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' একমত হলো সবাই।

বিড়াল উধাও হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা।

'কেউ যে বেড়ালটাকে চুরি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল। 'সব কিছু দেখেশুনে মনে হতে পারে, পিটারই করেছে কাজটা, কিন্তু আমরা জানি সে করেনি। তাকে দিয়ে এমন কাজ হবে না। তাহলে কে করল?'

'চলো, সূত্র খুঁজি!' পোড়াবাড়ির রহস্য স ধান করতে গিয়ে কি মহাউত্তেজনায় কেটেছিল কয়েকটা দিন ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল ফারিহা।

'কাকে কাকে সন্দেহ হয় একটা তালিকা করে ফেলা যাক,' প্রস্তাব দিল রবিন। 'আগের বারও তাই করেছি আমরা।'

'মনে হচ্ছে,' ভারিক্কি চালে বলল কিশোর, 'রহস্য আরেকটা পেয়েই গেলাম। আমি বলি কি...'

'দেখো,' বাধা দিয়ে বলল মুসা, 'একটা কথা ভুলে গেছ, তুমি নেতা নও, আমি। তোমরাই নেতা বানিয়েছ আমাকে।'

'বেশ,' মুসাকে নেতা মেনে নিয়ে খুব একটা সুখী হয়েছে বলে মনে হলো না কিশোরকে, 'বলো তাহলে। কি করব?'

'গোড়া থেকে শুরু করা যাক,' নেতা নেতা একটা ভঙ্গি করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল মুসা। 'বিকেল চারটের সময়ও অন্য বেড়ালগুলোর সঙ্গে খাঁচায় ছিল টিকসি। মিস টোমার দেখেছে, মা-ও দেখেছে। ঝামেলা র‍্যাম্পারকটকে নিয়ে পিগ যখন সেখানে গেছে তখন বাজে পাঁচটা, বেড়ালটা তখন নেই। অর্থাৎ মাঝের ওই একঘণ্টার মধ্যেই গাপ করে দেয়া হয়েছে ওটাকে। এর জন্যে খাঁচার তালা খুলতে হয়েছে চোরকে, বেড়ালটা বের করে আবার তালা লাগাতে হয়েছে, তাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে, এবং হয় নিজেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কিংবা কারও হাতে তুলে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছ,' রবিন বলল।

'এখন প্রশ্ন হলো, চুরিটা করল কে? কাকে সন্দেহ করব?'

'মিস টোমারও করতে পারেন,' জবাব দিল কিশোর। 'যদিও তাঁর মত একজন মহিলা এমন কাজ করার দুঃসাহস দেখাবেন, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তবু বলা যায় না। রহস্য সমাধান করতে গেলে কাউকে, কোন ব্যাপারকেই অবহেলা করা কিংবা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

নোটবুক বের করল রবিন। 'নামগুলো লিখে ফেলা যাক।...এক নম্বরে মিস টোমারের নাম লিখলাম। মিস অরগাননং?'

'নিজের বেড়াল নিজে চুরি করতে যাবেন না তিনি,' মুসা বলল।

'করতেও পারেন। এত দামী বেড়াল, শো করে যেটা থেকে টাকা আয় হয়, সেটার বীমা করিয়ে রাখাটা বিচিত্র নয়। টাকাটা আদায়ের জন্যেও বেড়ালটাকে লুকিয়ে ফেলতে পারেন তিনি। নাহ্, তাঁকে বাদ দেয়া যায় না। লিখলাম।'

ফারিহা বলল, 'হারপিগ?'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন, 'পিগটার নাম লিখতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তাকে সন্দেহ করা যাচ্ছে না। সারাটা বিকেল, বিশেষ করে চুরি যে সময়টায় হয়েছে তখন ঝামেলার সঙ্গে ছিল সে। সুতরাং বাদ রাখতে হচ্ছে তাকে।...আচ্ছা, আইলিনের পক্ষেও তো সম্ভব! বেরিয়ে গেলেও কোন একসময় চুপি চুপি ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকে বসে থেকেছে হয়তো। তারপর সবার চোখ এড়িয়ে বেড়ালটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। হতে পারে না?'

হতেই পারে, কার মনে কি আছে কে জানে। আইলিনের হাসিখুশি চেহারাটার কথা ভাবল ওরা। কিন্তু চোরের মত লাগল না মোটেও। তবু নামটা টুকে রাখল রবিন।

'আজ বিকেল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে সে কোথায় ছিল খোঁজ নেব আমরা,' মুসা বলল।

'আর কে কে আছে?' রবিন বলল, 'মিস টোমার, লেডি অরগানন, আইলিন। আর? বাবুর্চি আর খানসামাকে ধরব? খাঁচার কাছে গিয়ে বেড়াল চুরি করা কি সম্ভব ছিল তাদের পক্ষে?'

'ও-বাড়িতে বাবুর্চি কিংবা খানসামা আছে বলে তো জানি না। কাউকে দেখিনি। তবে জেনে নিতে হবে। খাইছে, তালিকাটা তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। সবার ব্যাপারে খোঁজ নিতে হলে তো বারোটা বেজে যাবে।'

'হারপিগকে সন্দেহ করতে পারলেই অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল ফারিহা। 'অথচ তাকেই সন্দেহ করা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'পিটারের নামও লিখে রাখতে হচ্ছে, যদিও একবিন্দু সন্দেহ করি না আমরা তাকে। তবু, লিখি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেব তাকে।'

সুতরাং পিটারের নামও লেখা হলো। ছেলেটার ভাগ্যটাই যেন খারাপ। খালি বিপদে পড়ে।

'চলো, শিস দিয়ে ডাকি তাকে,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'নিশ্চয় এখনও বাড়ি যায়নি। তাকে প্রশ্ন করা দরকার।'

দেয়ালের কাছে এসে শিস দিয়ে সঙ্কেত দিতে লাগল সে। কিন্তু দিয়েই চলল, দিয়েই চলল, ওপাশ থেকে আর সাড়া আসে না। কেউ এগিয়ে এল না দেয়ালের কাছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ওরা, কি করছে পিটার?

সাত

দেয়ালে চড়ল চারজনেই। উঠতে পারছে না বলে নিচে থেকে দেয়াল খামচাতে লাগল টিটু।

ঘড়ি দেখল মুসা। 'মাত্র সোয়া ছ-টা বেজেছে। এত তাড়াতাড়িই কি বাড়ি চলে গেল সে? না, তা হতে পারে না। গেলে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয় কথা বলে যেত।'

'কি জানি,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'এমনও হতে পারে, এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঝামেলা র‍্যাম্পারকট।

তাই তো!—ভাবল সবাই, এটা হতেই পারে। কিন্তু কি করে জানা যাবে?

কিশোরই বুদ্ধি বাতলে দিল, 'মুসা, কাজটা তুমি করতে পারো। তোমার পক্ষেই সহজ।'

'কি করে?'

'একটু আগে তোমার আম্মা গিয়েছিলেন ও-বাড়িতে। সোজা দেয়াল টপকে ঢুকে যাও। কেউ যদি দেখে ফেলে বলবে তোমার আম্মা রুমালটা ফেলে গেছেন, সেটা নিতে গেছ। আর না দেখলে তো কথাই নেই। জানার চেষ্টা কোরো পিটার কোথায়, কি করছে।'

'চমৎকার বুদ্ধি!' রবিন বলল। 'ও-বাড়িতে ঢোকার এখন এটাই একমাত্র উপায়। ফগ, পিগ, কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না। মুসা, এখুনি যাও। দেখো গিয়ে কি হচ্ছে, জলদি! আন্টি যে আজ ওখানে চা খেতে গিয়েছিলেন এটা আমাদের ভাগ্য।'

যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে মুসার, কিন্তু ফগ আর হারপিগের কথা ভেবে ভয়ও পাচ্ছে। তবু সুযোগ হাতছাড়া করাটা ঠিক হবে না। দেয়ালের ওপর উঠে ফিরে তাকিয়ে একবার হাত নেড়েই লাফিয়ে নেমে পড়ল ওপাশে।

পিটারকে কোথাও দেখা গেল না। বেড়ালের ঘরটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ও কাউকে চোখে পড়ল না। খোঁয়াড়ের ভেতরে উঁকি দিল একবার। তার দিকে তাকিয়ে নিরীহ স্বরে মিউ মিউ করল ওগুলো। গ্রীনহাউস পার হয়ে একটা ঝোপের কাছে আসতেই কথা শোনা গেল। ঝোপটা ঘুরে এসে উঁকি দিয়ে দেখল কারা কথা বলছে।

লনের এক জায়গায় জড় হয়ে আছে কয়েকজন লোক, তাদের বেশির ভাগকেই চেনে সে। মিস টোমার, হারপিগ, ফগ, পিটার··· একজন মহিলাকে আগে দেখেনি; তিনি কে, তা-ও আন্দাজ করতে পারল—লেডি অরগানন।

বেচারা পিটার! সবার মাঝখানে জড়সড় হয়ে আছে সে। ভয়ে কাঁপছে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ফগ, হাতে কালো নোটবুক, ধমক দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করছে পিটারকে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু-জন মহিলা। বোঝাই যাচ্ছে দু-জনেই কাজের লোক—একজন রাঁধুনী, আরেকজন পরিচারিকা। উত্তেজিত মনে হচ্ছে

ওদেরকে, ফিসফিস করে কথা বলছে, মাঝে মাঝে কনুই দিয়ে একে অন্যের গায়ে গুঁতো দিচ্ছে।

পা টিপে টিপে এগোল মুসা। কথা বুঝতে পারল এবার।

'বিকেলে কি করছিলে?' খেঁকিয়ে উঠল ফগ।

'ম-মটরশুঁটি তুলছিলাম...' ভয়ের চোটে কথাই বলতে পারছে না পিটার।

'কোথায়?'

'বে-বে-ব্বেড়ালের ঘরের কা-ক্কাছে!'

'তারমানে সমস্ত বিকেলটা বেড়ালের ঘরের কাছেই ছিলে? কাউকে কাছে যেতে দেখেছ?'

'বি-ব্বিকেল চারটায় মিস টোমার আরেকজন মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।' নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল চালিয়ে এলোমেলো চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে সরাল পিটার। 'কয়েক মিনিট থেকে চলে গেলেন।'

'চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কি করেছ?'

'কি-ক্কিছু না, স্যার!' গলা কেঁপে উঠল পিটারের। 'মটরশুঁটি তুলেছি কেবল। কাউকে আসতে দেখিনি। আপনারা দু-জনই এলেন।'

'সে-তো অনেক পরে,' হারপিগ বলল। 'মিস্টার র‍্যাম্পারকট...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!'

'সরি। মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, সব তো পানির মত পরিষ্কার, তাই না? বেড়ালটাকে এই শয়তানটাই চুরি করে তার কোন বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছে, টাকার জন্যে। সাংঘাতিক পাজি ছেলে ও, আমি জানি তো। এখানে চাকরি নেয়ার পর থেকেই নানা শয়তানি করছে।'

'অহেতুক আমাকে গালাগাল করছেন, মিস্টার হারপিগ!' বেপরোয়া হয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল পিটার। 'কখনও কোন জিনিস চুরি করিনি আমি। যতটা খাটা দরকার তার চেয়ে বেশি খেটেছি। আপনি আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেন, মারধোর করেন, আমি সহ্য করেছি। বেড়ালটাকে যে চুরি করিনি আমি, আপনি ভাল করেই জানেন। চুরি তো দূরের কথা, এ কথা ভাবতেও ভয় পাচ্ছি আমি।'

'ব্যস ব্যস, হয়েছে,' কঠিন কণ্ঠে বলল ফগ, 'সাহস তো তোমার কম নয়, ছোকরা! বয়স্ক একজন মানুষের সঙ্গে ওভাবে মুখে মুখে কথা বলো! আচ্ছামত চাবকানো উচিত তোমাকে! ঝামেলা!'

'সেই ব্যবস্থাও আমি অবশ্যই করব,' প্রচণ্ড রাগে দাঁতে দাঁত চেপে বলল হারপিগ। 'ওর বাপের সঙ্গে দেখা করে সব বলব আমি।'

'ওসব করার দরকার নেই, হারপিগ,' পরিষ্কার গলায় বললেন লেডি অরগানন, আস্তে আস্তে কথা বলেন তিনি, 'আমরা এখনও শিওর না বেড়ালটা কে চুরি করেছে। অহেতুক ওর বাবাকে বলে মার খাওয়ানো ঠিক হবে না।'

পিটারের দুরবস্থায় মজাই পাচ্ছিল যেন হারপিগ। ভুলেই গিয়েছিল, তার মনিবও উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। লেডি অরগাননের কথায় খানিকটা নিরাশই হলো যেন সে।

আশার আলো দেখতে পেয়ে করুণ কণ্ঠে অনুনয় করল পিটার, 'প্লীজ, ম্যা'ম,

আমাকে বাঁচান! বিশ্বাস করুন, আমি এ কাজ করিনি। টিকসিকে আমি চুরি করিনি। আপনার বাড়ি থেকে একটা কুটোও কখনও না বলে সরাইনি আমি।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল হারপিগ। 'পাশের বাড়ির মেয়েটাকে স্ট্রবেরির ডালগুলো দিস্‌নি···ইয়ে, দাওনি!'

থমকে গেল পিটার। অস্বীকার করার উপায় নেই। মুষড়ে পড়ল সে। ফোঁপানি বেরিয়ে এল নিজের অজান্তেই।

'স্ট্রবেরির ডাল একটা জিনিস হলো নাকি?' বললেন লেডি অরগানন। 'জঞ্জাল। পুড়িয়ে ফেলা লাগে। অনেক হয়েছে মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, ছেলেটাকে অকারণে শাসানো বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আগে অপরাধ প্রমাণ করুন। এখন ছেড়ে দিন ওকে। বাড়ি যাক।'

মোটেও খুশি হতে পারল না ফগ। পিটারকে শায়েস্তা করার ইচ্ছেটা মাঠে মারা গেল। যার জিনিস সে-ই যদি অভিযোগ না করে তার কিছু করার নেই মুখ কালো করে লেডি অরগাননের দিকে একবার তাকিয়ে খটাৎ করে নোটবুক বন্ধ করল সে। পিটারকে বলল, 'ঝামেলা! তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'চলুন, আমিও যাব আপনার সঙ্গে,' হারপিগ বলল। 'বলা যায় না, কোন তথ্য বেরিয়েও পড়তে পারে। ওর বন্ধু-বান্ধবগুলোকে চেনা দরকার। টিকসিকে কার কাছে দিয়েছে জানতে হবে।'

সুতরাং লেডি অরগাননের বারণ সত্ত্বেও পুরোপুরি রেহাই পেল না পিটার। দু-জনে মিলে প্রায় গেপ্তার করে নিয়ে চলল তাকে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাদের সঙ্গে এগোল সে।

খুব খারাপ লাগল মুসার। ফগকে তো আগে থেকেই দেখতে পারে না, হারপিগের ওপরও সমান ঘৃণা জন্মাল। দুই-দুইজন বড় মানুষ এ ভাবে একটা ছেলেকে হেনস্তা করছে এটা ভাল লাগল না তার। কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু উপায় খুঁজে পেল না।

তার দিকেই এগিয়ে আসছে ওরা। চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়ালে লুকাতে গিয়ে শব্দ করে ফেলল মুসা। দেখে ফেলল তাকে হারপিগ। চিৎকার করে দুই লাফে এসে তার কলার চেপে ধরল।

'অ্যাই, এখানে কি?' চিৎকার করে উঠল হারপিগ।

অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে ফগ।

সেটা লক্ষ করে তাকে বলল হারপিগ, 'পাশের বাড়ির ছেলে। সুযোগ পেলেই এখানে এসে ঢোকে, ছোঁক ছোঁক করে। আজ সোজা ম্যাডামের কাছে ধরে নিয়ে যাব। তারপর বুঝবে মজা।'

পিটারও হাঁ হয়ে গেছে।

টানতে টানতে মুসাকে লেডি অরগাননের কাছে নিয়ে এল হারপিগ। তিনিও চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকালেন।

'ম্যাডাম, এই ছেলেটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। প্রায়ই এসে ও আর ওর বন্ধুরা বাগানে ঢোকে, জ্বালাতন করে। পিটারের সঙ্গে খাতির। ভাল ছেলে না বোঝাই যায়।'

লেডি অরগানন জিজ্ঞেস করলেন, 'বাগানে কি করছ?'

'বাগানে নয়, আপনার বাড়িতেই এসেছি। দেয়াল টপকে এসেছি তো, তাই এদিক দিয়ে,' যতটা সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল মুসা। 'আজ বিকেলে আমার মা চায়ের দাওয়াতে এসেছিল এখানে। বাড়ি গিয়ে রুমালটা খুঁজে পাচ্ছে না। আমাকে বলল এখানে এসে দেখতে, ফেলে গেছে কিনা।'

'ও, তুমি মিসেস আমানের ছেলে, মুসা,' হাসলেন লেডি অরগানন। 'তোমার কথা, তোমার খালাত বোন ফারিহার কথা, সবই জানি। তোমার আম্মা বলেছে।'

'ফারিহা খুব ভাল মেয়ে, লেডি অরগানন। আপনাকে খুব দেখতে চায়। একদিন নিয়ে আসব।'

'এনো। হারপিগ, তুমি একটা বোকা। এমন ভাবে ধরে এনেছ যেন চোর। মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে আর কবে শিখবে?'

মুসাকে ধরে এনে উল্টো ম্যাডামের বকা শুনতে হবে ভাবতে পারেনি হারপিগ, অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই মুসার হাতটা ছেড়ে দিল।

ইচ্ছে করেই জোরে জোরে হাত ডলতে লাগল মুসা, হারপিগ যেখানে ধরে ছিল সেখানটায়, যেন ব্যথা করছে।

'লেগেছে নাকি?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন লেডি অরগানন। 'আমার লজ্জাই লাগছে এখন, মিসেস আমান যদি জিজ্ঞেস করে...নাহ্, হারপিগ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না!'

রাগে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল হারপিগ। কিন্তু কিছু করার নেই তার। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেছে।

লেডি অরগানন মুসাকে বললেন, 'রুমালটা পেলে অবশ্যই পাঠিয়ে দেব। শোনো, তোমার বোনকে নিয়ে এসো কিন্তু। ছোট্ট মেয়েদের আমার ভীষণ পছন্দ।'

'ঢুকলেই তো ওই লোকটা আমাদের বের করে দেয়,' বলে দিল মুসা। 'এমন করে তাড়া করে, যেন আমরা গরু-ছাগল...'

'আর করবে না!' কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিয়ে দিলেন লেডি অরগানন, 'হারপিগ, ওদের যখন ইচ্ছে হবে এখানে আসবে, তুমি কিছু বলবে না। ঠিক আছে?'

রাগে লাল হয়ে গেল হারপিগের মুখ। দেখে মনে হলো ফেটে পড়বে। কিন্তু মনিবের কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পেল না। ঝটকা দিয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল ফগ আর পিটারের কাছে।

লেডি অরগাননকে ধন্যবাদ দিয়ে, গুড-বাই জানিয়ে হাসিমুখে হারপিগের পিছু নিল মুসা। পিটারের কাছে গিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আছে, সাহায্য করবেই। আমরা জানি চুরিটা তুমি করোনি।'

'আহ্, ঝামেলা!' ধমকে উঠল ফগ, 'ভাগো এখান থেকে! এটা তোমাদের ব্যাপার নয়। অন্যের কাজে নাক গলাবে না। যাও! ঝামেলা!'

কিন্তু গেল না মুসা। তিনজনের পেছন পেছন এগোল। অভয় দিতে লাগল পিটারকে, আশ্বাস দিতে লাগল। তাতে মনে মনে খেপতে লাগল ফগ আর হারপিগ।

শেষে আর মুসাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে এড়ানোর জন্যে কথা বলতে শুরু

করল দু-জনে। হারপিগ বলল, চুরিটা নিয়ে ভালমত একটা তদন্ত হওয়া দরকার। ফগ বলল, বেড়ালের ঘরের ভেতরটা দেখার জন্যে সেদিনই আবার আসবে।

'হুঁ,' ভাবল মুসা, 'কি জন্যে আসবে তা তো জানি, সূত্র খোঁজার জন্যে, যাতে পিটারকে ফাঁসাতে পারো। দাঁড়াও, তোমার আগেই আমরা এসে খুঁজে যাব। যাতে তুমি এসে কচুটাও না পাও!'

দেয়ালের গোড়াতেই মহা-উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল কিশোররা। মুসা দেয়াল থেকে নামতে না নামতেই প্রশ্নের ফুলঝুরি ছোটাল।

আট

'কি হয়েছে, মুসা?' রবিনের প্রশ্ন। 'গেলে তো গেলেই, আর খবরই নেই!'

ঘাসের ওপর প্রায় গড়িয়ে পড়ল মুসা। 'হারপিগ আর ফগ যেন সংকল্প করে বসেছে পিটার দোষী না হলেও তাকে দোষী ব তে হবে!'

'এটা কেমন কথা?' অবাক হয়ে বলল ফারিহা, 'পিটার যে কাজ করেনি সেটা তার ওপরে চাপানো হবে কেন? ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, তাই না?'

'রহস্যময়!'

'টিকসি কোথায় আছে জানতে পারলে ভাল হত।'

'খুঁজে বের করতে হবে বেড়ালটাকে,' রবিন বলল। 'জানতে হবে, কে চুরি করেছে। যার কাছে আছে এখন ওটা, সে যে চোরের বন্ধু তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাল একটা রহস্য পাওয়া গেল মনে হচ্ছে।'

'সূত্র খুঁজতে যেতে পারি না?'

'পারি,' ফারিহার কথার পিঠে বলল মুসা। 'এ কথাই ভাবছিলাম। আজ রাতে বেড়ালের খাঁচার কাছে আবার আসবে বলেছে ফগ, ভাল করে তদন্ত করার জন্যে। এমন কিছু পেয়ে যেতে পারে সেখানে যা পিটারকে ফাঁসাতে সাহায্য করবে। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'পারছি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ফাঁসানোর ইচ্ছে থাকলে কিছু রেখেও দিতে পারে। তার আগেই আমাদের গিয়ে দেখা দরকার।'

আঁতকে উঠল রবিন, 'দেয়াল টপকে এই রাতের বেলা! বিপদে পড়ে যাব!'

'পড়ব না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ভরা কিশোরের কণ্ঠ। 'পিটারকে নিয়ে তার সৎবাপের কাছে গেছে হারপিগ আর ফগ। অনেক কথা বলতে হবে ওদেরকে, ফিরে আসতে সময় লাগবে। এই সুযোগে চট করে গিয়ে দেখে চলে আসব আমরা।'

'তাহলে এখুনি চলো। এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। এসো।'

দেয়ালের গোড়ায় রেখে গেলে আবার কোন গোলমাল বাধায়, সে জন্যে টিটুর ব্যাপারে আর কোন ঝুঁকি নিল না ওরা। তাকে ছাউনিতে রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে এল।

একা একা দেয়ালে চড়তে পারে না ফারিহা, তাই চড়ার সময়ও অন্যের

সাহায্য লাগল তার, নামার সময়ও। বাগানে কেউ নেই। সাবধানে পা টিপে টিপে বেড়ালের ঘরের দিকে এগোল গোয়েন্দারা। বেড়ালগুলো কোনটা অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে, কোনটা বসে আছে। শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওদের দিকে।

'সূত্র খোঁজো,' রবিন বলল।

'কি ধরনের সূত্র?' ফারিহার জিজ্ঞাসা।

'তা জানি না। দেখলে বোঝা যাবে। মাটিতে খোঁজো, সবখানে খোঁজো। বিকেল বেলা পিটার যেখানে কাজ করেছে সেই জায়গাটার প্রতিই বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার।'

একধারে একটা ঝুড়ি দেখা গেল, অর্ধেকটা বোঝাই কাটা আগাছায়। তার পাশে পড়ে আছে একটা কোদাল। কাছেই একটা গাছে ঝোলানো পিটারের কোটটা।

'এখানেই কাজ করছিল পিটার।' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন বোঝাল, 'বেড়ালের ঘরের এত কাছে ছিল সে, কেউ এখানে এলে দেখতে পেতই। প্রতিটি বেড়াল দেখা যায় এখান থেকে। তার চোখ এড়িয়ে বেড়াল বের করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু একটা বেড়াল ঠিকই উধাও হয়েছে। পিটার কসম খেয়ে বলেছে সে নেয়নি। তাহলে কে নিল? কি ভাবে নিল?'

রবিন বলল, 'নিজে নিজেই বেরিয়ে যায়নি তো বেড়ালটা? চলো তো দেখি পথ আছে কিনা?'

'ভাল কথা বলেছ।'

খোঁয়াড়ের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা।

'নাহ্, বেরোনোর কোনই পথ নেই,' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল মুসা। 'টিকসিকে বেরই করে নেয়া হয়েছে।' হঠাৎ হাত তুলে খোঁয়াড়ের মেঝে দেখাল সে। 'খাইছে, ওটা কি?'

জালে নাক ঠেকিয়ে ভেতরে উঁকি দিল সবাই।

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ নীরবতা। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, ভুরু কোঁচকাল, মাথা চুলকাল, তারপর বলল, 'বুঝেছি ওটা কি। একটা বাঁশি, ফারিহাকে যেগুলো বানিয়ে দিয়েছে পিটার, সে রকম।'

চেনা চেনা লাগছিল এতক্ষণ, কিন্তু চিনতে পারেনি কেউ, কিশোর বলতেই চিনে ফেলল। ওটা ওখানে গেল কি করে? একটা ব্যাপারই হতে পারে, ওখানে গিয়েছিল পিটার। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল ওরা।

'পিটার নয়, পিটার নয়!' কেঁদে ফেলবে যেন ফারিহা। 'আমরা জানি ও চুরি করেনি!'

'হ্যাঁ, জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু এমন জায়গায় পড়ে আছে ওটা, ওখানে গেলেই কেবল ফেলে আসা সম্ভব। চমৎকার একটা রহস্য!'

'ফগ ওটা দেখতে পেলে পিটারের সর্বনাশ হয়ে যাবে!' ভয়ে কেঁপে উঠল ফারিহার গলা।

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তা ঠিক। তা ছাড়া জিনিসটা এতবড়, ফগের চোখে পড়বেই। তার মত মাথামোটা লোক তখন আর কোনদিকে তাকাবে না, সোজা চোর বলে ধরে নিয়ে যাবে পিটারকে।'

কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরল ফারিহা। 'তুমিও ভাবছ পিটার ফেলেছে?'

'না। কেউ একজন ইচ্ছে করে ওটা ওখানে রেখে এসেছে পিটারকে চোর প্রমাণ করার জন্যে।'

'আমিও তাই বলছি,' একমত হলো রবিন। 'কি করা যায় কিশোর, বলো তো? ফগের দেখার জন্যে এটা এখানে ফেলে যাব আমরা? এটা কোন সূত্র নয় বোঝাই যাচ্ছে। কেবল একটা অসহায় ছেলেকে ফাঁসানোর চেষ্টা।'

'বের করে নিয়ে যেতে হবে,' বলে দিল মুসা।

চারজনেই তাকিয়ে আছে বাঁশিটার দিকে। ঘরের দরজায় তালা দেয়া। চাবি নেই। বের করবে কি করে ওটা?

'তাড়াতাড়ি করতে হবে,' মরিয়া হয়ে যেন নিজেকেই বোঝাল কিশোর। 'যে কোন সময় চলে আসতে পারে ফগ। কিন্তু বের করি কি ভাবে?'

কেউ বুদ্ধি দিতে পারল না। জালের আরেকটু কাছে পড়ে থাকলেও হয়তো লাঠি-টাঠি কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনার চেষ্টা করা যেত।

বুদ্ধিটা কিশোরই বের করল। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে খেলা করছে অস্থির স্বভাবের একটা বেড়াল। ছোট একটা নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিল সে। যা আশা করেছিল তাই ঘটল। নুড়িটা দেখেই ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে তার কাছে পড়ল বেড়ালটা। খেলতে শুরু করল ওটা নিয়ে। আরেকটা নুড়ি কুড়িয়ে আবার ভেতরে ছুঁড়ে দিল কিশোর, এবার বাঁশিটার কাছাকাছি। লাফ দিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় নুড়িটাকেও ধরল বেড়ালটা। একটা পা রাখল ওটার ওপর, ঠেলা দিল। বাঁশিটাতেও ঠেলা লাগল। সরে গেল ওটা। এতক্ষণ পড়েছিল বলেই বোধহয় নজর কাড়েনি, এখন পাথরটার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিটাও তার খেলনা হয়ে উঠল।

প্রায় দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে গোয়েন্দারা। থাবা দিয়ে পাথরটাকে গড়িয়ে দিল বেড়ালটা। ছুটে গেল ওটার কাছে। আরেক থাবায় আরও খানিকটা সরিয়ে দিয়ে ফিরে এল বাঁশিটার কাছে। পাথরটার মত একই ভাবে ওটাকেও সরাতে লাগল।

মজা পেয়ে গেছে বেড়ালটা। আচমকা বসে পড়ে আরেক কাণ্ড করল। দুই থাবায় চেপে ধরে তুলে নিল বাঁশিটা। ওপর দিকে ঝাঁকি দিতে গিয়ে ছুটে গেল থাবা থেকে। প্রায় উড়ে এসে খোঁয়াড়ের কিনারে জালের কাছাকাছি পড়ল বাঁশি।

'বাহ্, চমৎকার!' পকেট থেকে ছোট এক বান্ডিল তার বের করল কিশোর। তার পকেটে যে কি থাকে, আর কি থাকে না! যেন কোন্ জিনিসটা কখন লাগবে ঠিক জানে, প্রয়োজনের সময় বের করে আনে পকেট থেকে। তারের একমাথা বড়শির মত করে বাঁকিয়ে দিল সে। জালের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বড়শিতে আটকে বাঁশিটাকে হাতের নাগালের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে শুরু করল।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে সবাই, তাকিয়ে আছে বাঁশিটার দিকে।

বড়শি থেকে ছুটে গেল বাঁশিটা, আবার সেটা আটকানোর চেষ্টা করতে লাগল

কিশোর। কৌতূহলী চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে ছিল বেড়ালটা, আচমকা এক লাফ দিল। এগিয়ে এসে থাবা দিয়ে বড়শির মত মাথাটাকে সরিয়ে দিল। তাতে বাঁশি থেকে সরে গেল মাথাটা। চমকে গেল সবাই। গেল বুঝি বাঁশি হাতছাড়া হয়ে!

আবার থাবা মারল বেড়ালটা। বাঁশিতে লেগে ঝট করে সরে এসে ঠেকল ওটা জালের গায়ে।

'থ্যাংক ইউ, মিনি!' সহজেই জালের ফোকরের ভেতর দিয়ে বাঁশিটা বের করে আনল কিশোর। একবার দেখেই রেখে দিল পকেটে। 'যাক, গেল ঝামেলা র‍্যাম্পারকটের হাতছাড়া হয়ে।'

'তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি, কিশোর!' উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করল ফারিহা।

তার নিজের মাথা থেকে বুদ্ধিটা বেরোল না বলে মনে মনে নিজেকে একশো একটা লাথি লাগাল মুসা। মুখে বলল, 'আর কিছু আছে কিনা দেখা দরকার।'

জালে নাক ঠেকিয়ে চোখের সমস্ত ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দেখতে লাগল ওরা।

ফারিহা বলল, 'উঁহ্, বাজে গন্ধ!'

'জন্তু-জানোয়ারের খাঁচায় ভাল গন্ধ থাকে না। বোটকা গন্ধই থাকে,' রবিন বলল।

'এই গন্ধটা সে রকম নয়। কোন ধরনের তেলের গন্ধ, পেট্রোলের গন্ধের মত।'

সবাই জোরে জোরে নাক টেনে গন্ধ নিতে লাগল।

'ঠিকই বলেছে ও,' মুসা বলল। 'আমিও পাচ্ছি। কিসের গন্ধ?'

'তারপিনের,' গন্ধটা কিশোরও পেয়েছে। খুব হালকা। 'খাঁচা পরিষ্কার করতে ব্যবহার করে হয়তো আইলিন। আর কিছু আছে নাকি দেখো।'

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর কোন সূত্র বের করতে পারল না ওরা।

'দূর!' কিছুটা হতাশ হয়েই হাত নাড়ল মুসা, 'কিছুই পেলাম না!'

'একেবারেই পাইনি বলতে পারো না,' রবিন বলল। 'বাঁশিটা তো পেলাম। বেঁচে গেল পিটার।'

'তা বটে।'

'আমরা তো একটা জিনিস অন্তত পেয়েছি,' হেসে বলল রবিন, 'কিন্তু ফগ যে কিছুই পাবে না। আহারে, একেবারে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে আমাদের মিস্টার ঝামেলা র‍্যাম্পারকটকে।'

ঝট করে তার দিকে ঘুরে তাকাল কিশোর। অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে। নরম শিস দিয়ে উঠল। 'দারুণ একটা কথা মনে করেছ! প্রচুর সূত্র রেখে যাব, যাতে হাবা বনে যায় ঝামেলা।' কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল সে।

হাসতে শুরু করল সবাই।

পকেট থেকে একটা চিউইংগামের মোড়ক বের করল মুসা। বলল, 'এক নম্বর সূত্র!'

চুলের ফিতের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ফারিহা বলল, 'আমার এটা দুই নম্বর।' পকেট থেকে পুতুলের পোশাকের একটা নীল বোতামও বের করল খাঁচায় ফেলার জন্যে।

'আমার পকেটে একটা জুতোর ফিতে আছে,' রবিন বলল। 'ছিঁড়ে গিয়েছিল।

নতুন আরেকটা লাগানোর পর রেখে দিয়েছিলাম।'

'কিশোর, তুমি কি ফেলবে?' ফারিহা জিজ্ঞেস করল।

পকেট থেকে কয়েকটা পোড়া সিগারেটের গোড়া বের করল কিশোর।

দেখে অবাক হলো সবাই।

'এ সব রেখেছিলে কেন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রবিন।

'টেনেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'আমার চাচা অর্ধেকটা করে খেয়ে বাকিটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দেয়। আমি তুলে নিয়ে টেনে দেখেছি সিগারেট খেতে কেমন লাগে।'

'কেমন লাগল?'

'জঘন্য!'

'গোড়াগুলো পকেটে রেখেছিলে কেন?'

'গায়ে সিগারেটের গন্ধ লেগে থাকলে কতটা বিশ্রী লাগে জানার জন্যে।'

'ও, এইজন্যেই,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা, 'তুমি সামনে এলেই তামাকের পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল। পকেটে যে ওই জিনিস ভরে রেখেছ জানব কি করে! এই, তোমার মাথাটাতা ঠিক আছে তো? পাগলের ডাক্তারের কাছে গেছ কখনও?'

'না,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'তবে চাচী মাঝে মাঝেই নিয়ে যাওয়ার জন্যে খেপে ওঠে। কেউ কোন একটা জিনিস পরখ করতে চাইলে মানুষ কেন যে তাকে পাগল ভাবে বুঝি না!'

একটা গোড়া খোঁয়াড়ের ভেতর ছুঁড়ে দিল সে, দুটো ফেলল বাইরে, মাটিতে। হেসে বলল, 'প্রচুর সূত্র রেখে যাচ্ছি জনাব ঝামেলার জন্যে। দেখি, ধরুক এবার চোর! ফেলো, তোমাদেরগুলোও ফেলো।'

নয়

খাঁচার ভেতর ফিতে ফেলতে গিয়ে থমকে গেল রবিন।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

'ফেলে গিয়ে বিপদে পড়ব না তো? যদি আমাদেরকেই চোর ভেবে বসে? সূত্র দেখে বেরও করে ফেলতে পারে পুলিশ, কে ফেলেছে।'

'এটা এমন কোন সমস্যা নয়,' পকেট থেকে একটা খাম আর ছোট কাঁচি বের করল কিশোর। রবিনের দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি, দাও তোমার ফিতেটা।'

একমাথা থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে খামে রাখল সে। বাকিটা ফেলল খাঁচার ভেতর। ফারিহার ফিতেরও খানিকটা কেটে নিয়ে খামে রাখল। তার পকেটে আরও একটা একই রকমের নীল বোতাম পেয়ে সেটাও নিয়ে নিল। মুসার চিউয়িংগামের মোড়কের একটা কোণ কেটে রেখে দিয়ে বাকিটা খাঁচায় ফেলল। নিজের পকেট থেকে আরও একটা সিগারেটের গোড়া বের করে খামে রাখল। যত্ন করে খামের মুখ বন্ধ করে সেটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'থাক এটা। প্রমাণ। কেউ যদি

চ্যালেঞ্জ করে তাকে খামের জিনিসগুলো দেখিয়ে বলব, চুরি করার সময় বেখেয়ালে এসব জিনিস ফেলে যাওয়া হয়নি। ইচ্ছে করে ফেলে গেছি আমরা মজা করার জন্যে।'

ঢং ঢং করে ঘণ্টা শোনা গেল গির্জার ঘড়িতে।

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা, 'রাতের খাওয়ার সময় হয়েছে! বাড়ি যাওয়া দরকার! দেরি করলে মা বকবে! চলো চলো!'

'দেরি করলে আমার মা-ও বকবে,' রবিন বলল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার চাচা-চাচী অনেক ভাল, কিশোর, কিছুই বলেন না। তোমার অনেক স্বাধীনতা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'চাচা বলে মানুষের স্বাধীনতা থাকা উচিত, ছোটমানুষ হলেও। যার যার মত করে তাকে বড় হতে দেয়া উচিত। বেশি খবরদারি ভাল না। বাধ্য করতে চাইলে বিগড়ে যায় মানুষ। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি ভুল করে খারাপ কিছু করতে যায়, তাকে সেটা বুঝিয়ে দেয়া উচিত।'

কিশোরের এই বড়দের মত করে কথা বলা ভাল লাগে ফারিহার। তাকে অনেক বেশি বিজ্ঞ মনে হয় তার কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকে তো যেতেই হবে। তুমি কি করবে?'

'ভাবছি,' গাল চুলকে নিয়ে বলল কিশোর, 'এখানেই থাকব আরও কিছুক্ষণ। একটা গাছে চড়ে বসে দেখব ফগ এসে কি করে। সূত্রগুলো পেয়ে সে কি করে দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।'

পারছে না অন্য তিনজনও। কিন্তু কিছু করার নেই। বাড়ি যেতেই হবে। কিশোরকে খাঁচার কাছে রেখে, একের পর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেয়ালের দিকে এগোল ওরা। বাড়ি গিয়ে বিদ্রোহ করে বসবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না মুসা। মাকে বড়ই ভয় পায়।

মানুষের গলা শোনা গেল। ফগের গলা চিনতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। মোটা শরীর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা গাছে চড়ে বসল।

ফগ একা আসছে না, তার সঙ্গে হারপিগও রয়েছে। বেড়ালের খাঁচার কাছে এসে দাঁড়াল দু-জনে।

গলাবাজি করে ফগ বলছে, 'হারপিগ, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না চোর ধরতে আমি কি রকম ওস্তাদ। সামান্য একটা সূত্র পেলেই হয়, খুঁজে খুঁজে দেখো, ঠিক গিয়ে তাকে ধরে ফেলব। অনেক তুচ্ছ জিনিস, তুমি যেটার দিকে তাকাবেই না, সেটাই আমার কাছে বিরাট সূত্র হয়ে যাবে। আমি শিওর, চুরি যখন হয়েছে, খাঁচার মধ্যে কোন না কোন সূত্র আছেই। ঠিক বের করে ফেলব আমি।'

'তোমার কি আর তুলনা হয়,' গদগদ হয়ে বলল হারপিগ। 'আমারও বিশ্বাস, খাঁচার মধ্যে সূত্র পাবেই। পিটার হারামজাদা পাকা চোর নয় তো, নতুন, বোকামি কিংবা ভুল করবেই। অত দামী একটা বেড়াল চুরি করে হজম করতে পারবে না।'

অন্ধকার হয়ে গেছে। খালি চোখে আর কিছু দেখা যায় না। টর্চ বের করল ফগ। খুঁজতে লাগল খাঁচার চারপাশে। জুলজুল করে আলোর দিকে তাকিয়ে আছে বেড়ালগুলো। আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে তাদের নীল চোখ। অবাক হয়ে যেন

ভাবছে, আজ খাঁচার কাছে অসময়ে এত লোকের আনাগোনা কেন?

প্রথমে মাটিতে পড়ে থাকা সিগারেটের গোড়া দুটো চোখে পড়ল ফগের। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে তুলে নিল ওগুলো।

'কি জিনিস?' জানতে চাইল হারপিগ।

'সিগারেটের গোড়া,' খুব সন্তুষ্ট হয়ে বলল ফগ। পরক্ষণেই মাথা চুলকাতে লাগল, যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে। 'পিটার ছেলেটা সিগারেট টানে নাকি?'

'কি যে বলো,' অধৈর্য শোনাল হারপিগের কণ্ঠ। 'ও সিগারেট খাবে কি? এটা কোন সূত্র নয়। লেডি অরগাননের কাছে যারা এসেছিল, তাদের কেউ ফেলে গেছে।'

'হুম্!' হারপিগের মত অত সহজে সূত্রটাকে উড়িয়ে দিতে পারল না ফগ। 'থাক আপাতত আমার কাছে। পরে ভেবে দেখব।'

গাছের ডালে বসে নীরব হাসিতে পেট ফাটছে কিশোরের।

অনেক খুঁজেও খোঁয়াড়ের বাইরে আর কিছু পেল না ফগ।

হারপিগ বলল, 'খাঁচার ভেতরে দেখবে নাকি? দরকার আছে?'

একমুহূর্ত দ্বিধা করল ফগ। 'দেখা তো উ[illegible]ত। চাবি আছে?'

চাবি বের করে আনল হারপিগ। তালা খুলে দিল।

ভেতরে ঢুকেই ফগের চক্ষু স্থির। অস্ফু[illegible] শব্দ করে উঠল।

'কি হলো?' জানতে চাইল হার[illegible]

'দেখে যাও কাণ্ড। জুতোর ফিতে পড়ে আছে একটা, একমাথা কাটা! শিওর কেউ ঢুকেছিল এখানে, ভুলে ফেলে গেছে। কিন্তু মাথা কাটা কেন?'

ফিতেটা দেখে সাংঘাতিক অবাক হয়েছে হারপিগ, বোঝা গেল। একে একে পাওয়া গেল নীল বোতাম, লাল ফিতের টুকরো, চিউয়িংগামের মোড়ক, আরও একটা সিগারেটের গোড়া।

সূত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল ফগ।

দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল আবার হারপিগ।

ফগ বলল, 'বাদামী জুতো পরা কেউ খাঁচায় ঢুকেছিল। আর নীল বোতামটা কারও পোশাকের। হারপিগ, পিটার কি চিউয়িংগাম খায়?'

'খেতে পারে, দেখিনি, অনেক ছেলেই তো খায়,' কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে হারপিগ। 'কিন্তু লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে না কখনও ছেলেরা, আধপাগল হিপ্পিগুলো বাদে। পপ গায় এ রকম কিছু ছাগলও এই কাণ্ড করে অবশ্য। কিন্তু তাদের কাউকেই এদিকে আসতে দেখিনি কখনও। খাঁচার মধ্যে সিগারেটের গোড়া পড়ে থাকাটাও স্বাভাবিক নয়।'

হাতের তালুতে সূত্রগুলো নিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে আনমনে বলল ফগ, 'আপাতত ধরে নেয়া যাক, এমন কেউ খাঁচায় ঢুকেছিল যে এই ব্র্যান্ডের সিগারেট খায়, বাদামী রঙের জুতো এবং নীল বোতাম লাগানো পোশাক পরে, চিউয়িংগাম চিবায়, আর···আর লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে,' শেষ কথাটা বেশ দ্বিধার সঙ্গে বলল সে। 'মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না!'

হা-হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে কিশোরের। অনেক কষ্টে সামলে রাখছে নিজেকে।

'বুঝতে তো আমিও পারছি না!' রেগে গেছে হারপিগ। 'দেখো ফগ, যত সূত্রই খোঁজো, আর যা-ই বলো, পিটারের ওপর থেকে সন্দেহ যাচ্ছে না আমার। চুরি সে-ই করেছে। তুমি যেগুলোকে সূত্র বলছ, ওগুলো ফালতু জিনিস, কোনভাবে ঢুকে গেছে খাঁচার মধ্যে। অসাবধানে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে ভেতরে।'

'কিন্তু অসাবধানে এ সব জিনিস কে ছুঁড়তে যাবে খাঁচার মধ্যে?' পকেট থেকে খাম বের করে জিনিসগুলো যত্ন করে তার মধ্যে রেখে দিল ফগ। 'যাই এখন। সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ। কাল আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করব পিটারকে। ওর পেট থেকে কথা বের করতে না পারলে আমার নাম ফগর‍্যাম্পারকট নয়।'

ফগ চলে গেল।

গাছের ওপর বসেই আছে কিশোর। এখানে আর কিছু দেখার নেই। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে এখন। খিদে পেয়েছে। কিন্তু হারপিগের জন্যে গাছ থেকে নামতে পারছে না।

আবার গিয়ে বেড়ালের ঘরে ঢুকেছে লোকটা। সাবধানে কি যেন খুঁজছে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দরজা লাগাল। তালা দিল। তারপর এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না তার, কিন্তু কিশোরের মনে হলো কোন কারণে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে সে।

হারপিগের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর গাছ থেকে নামল কিশোর।

দশ

পরদিন সকাল সকাল মুসাদের বাড়িতে চলে এল কিশোর। দেখল, সবাই তার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। আগের সন্ধ্যায় গাছের ডালে বসে যা যা দেখেছে খুলে বলল সে। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

'হারপিগকে জিজ্ঞেস করছিল ফগ, পিটার সিগারেট খায় কিনা,' হেসে বলল কিশোর। 'আমার তো এমন হাসি পেল, গাছ থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম।'

'আজ সকালে অনেকবার শিস দিয়ে পিটারকে ডেকেছি,' মুসা জানাল। 'সাড়া দেয়নি। বেশি ভয় পেয়ে গেছে হয়তো।'

'হয়তো পেয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করা দরকার, বাঁশিটা যে পেয়েছি বলতে হবে। চলো তো, আরেকবার ডেকে দেখি।'

জোরে জোরে শিস দেয়া হলো, কিন্তু এবারও সাড়া দিল না পিটার। দেয়ালের কাছে এল না। গেটের কাছে বেলা একটা পর্যন্ত বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল গোয়েন্দারা। ওই সময় ডিনার খেতে বাড়ি যায় পিটার।

কিন্তু সময় হলেও বেরোল না সে। একটা দশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। আর বসে থাকা গেল না। খাওয়ার জন্যে ডাকলেন মুসার আম্মা।

'চাকরি থেকে বের করে দিল না তো?' এই প্রথম কথাটা মনে পড়ল কিশোরের। 'হয়তো আর কোনদিনই ও-বাড়িতে কাজ করতে আসবে না।'

'আহারে!' দুঃখ করে বলল ফারিহা, 'তাহলে তো আর কখনও দেখা হবে না ওর সঙ্গে!'

'খবরটা নেয়া যায় কি করে?' রবিনের প্রশ্ন।

'হারপিগকে জিজ্ঞেস করতে পারি আমরা।'

'গাধা!' কড়া চোখে তার দিকে তাকাল মুসা। 'জিজ্ঞেস করার আর লোক পেল না!'

বকা খেয়ে মুখ গোমড়া করে ফেলল ফারিহা। সেটা দেখে তখন খারাপ লাগল মুসার। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। 'এক কাজ করতে পারি। লেডি অরগানন ফারিহাকে নিয়ে যেতে বলেছেন, দেখার জন্যে। আজ বিকেলেই যেতে পারি। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারব পিটারের কথা।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল হবে তাহলে,' কিশোর বলল। 'এ রকম সুযোগ ছাড়া উচিত না। চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তিনি কোথায় ছিলেন এটাও জানতে হবে। বুঝতে পারছ তো কেন? তিনিই তাঁর নিজের বেড়াল চুরি করেছেন কিনা শিওর হওয়ার জন্যে।'

'আরগফের মত,' মন্তব্য করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মুসা বলল, 'লেডি অরগানন আরগফের মত নন, অনেক ভাল মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবে। তা ছাড়া বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে যে তিনি বেড়ালের খাঁচার কাছে যাননি, এটা পিটারের কথা থেকেই বোঝা যায়। সে সারাক্ষণ ওখানেই ছিল। তিনি গেলে তার চোখে পড়তই।'

'তা বটে।'

মুসা আর ফারিহা খেতে চলে গেল। কিশোর আর রবিন যার যার বাড়ি রওনা হলো।

বিকেল সাড়ে তিনটায় আবার মুসাদের ছাউনিতে মিলিত হলো সবাই। রবিন আর কিশোর রয়ে গেল বাগানে, ফারিহাকে নিয়ে মুসা রওনা হলো লেডি অরগাননের বাড়িতে। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল হারপিগের সঙ্গে। পাতাবাহারের ঝাড় পরিষ্কার করছে সে। ভুরু কুঁচকে তাকাল ওদের দিকে।

তাঁকে একটু খোঁচা দেয়ার লোভ সামলাতে পারল না মুসা, 'গুড আফটারনুন, হারপিগ। কেমন আছেন? দিনটা খুব সুন্দর, না? রোদ আছে। তবে মনে হচ্ছে দু-একদিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। পানি পেলে সজী খুব ভাল হয়।'

মুসার এই 'বিশেষজ্ঞ' মতামতের কোন দামই দিল না হারপিগ। রেগে যাওয়া শুয়োরের মত জোরে একবার ঘোঁৎ করে উঠে কোপ মারল গাছের ডালে, ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোপটা মুসার ঘাড়ে মারতে পারলেই খুশি হত। তাকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে বাঁকা হাসি হাসল মুসা।

বাড়ির সামনের দরজায় এসে বেল বাজাল সে।

দরজা খুলে দিল পরিচারিকা, দু-জনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'লেডি অরগানন আছেন?' ভদ্রকণ্ঠে জানতে চাইল মুসা।

'তিনি বাগানে। বোধহয় গোলাপ তুলছেন। এসো আমার সঙ্গে।'

একটা বারান্দা দিয়ে অপর পাশের বাগানে নিয়ে চলল ওদেরকে মহিলা। তার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে মুসা জানতে চাইল, 'বেড়ালটা পাওয়া গেছে?'

'না। আইলিনের মন খুব খারাপ। সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তাই না? আমার বিশ্বাস, পিটারই চুরি করেছে। তা ছাড়া আর কে করবে? ওই সময়ে খাঁচার কাছে একমাত্র সে-ই ছিল।'

'কাল বিকেলে এমন কিছু দেখেছেন কিংবা শুনেছেন, যেটা অদ্ভুত মনে হয়েছে আপনার?'

'নাহ্। কাল বিকেলে টি-পার্টি দিয়েছিলেন লেডি অরগানন। নয়-দশজন মেহমান এসেছেন। আমি আর রাঁধুনী এত ব্যস্ত ছিলাম কোনদিকে তাকানোর সুযোগ পাইনি। বাগানে বেরোনোর তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে বেরোতে পারলে হয়তো চোরটাকে চোখে পড়ে যেত। একেবারে সময় বুঝে কাজটা সেরেছে। আইলিন ছিল না, হারপিগ ছিল না, আমি আর রাঁধুনী ব্যস্ত, মেহমানদের নিয়ে লেডি অরগাননও ব্যস্ত। এর চেয়ে ভাল সুযোগ চোরের জন্যে আর কি হতে পারে।'

'মনে হচ্ছে এ সব যেন জানা ছিল চোরটার। ভেবেচিন্তে চুরির পরিকল্পনা করেছে।'

'সেজন্যেই পিটারকে সন্দেহ হয়। ছেলেটাকে ভাল বলেই জানতাম। সহজ, সরল। হারপিগকে বাঘের মত ভয় পেত।'

'আপনিও ভয় পান?' ফস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল ফারিহা।

'লোকটা ভাল না,' ঘুরিয়ে জবাব দিল পরিচারিকা। 'এ কথা যে আমি বলেছি, তাকে আবার বোলো না। চুরি যখন হয় তখন সে ফগের সঙ্গে না থাকলে তাকেই সন্দেহ করতাম আমরা—আমি আর রাঁধুনী।... ওই যে বাগান, ওখানেই পাবে লেডিকে।'

বাগানের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল মুসা আর ফারিহা।

মুসা ভাবল, মহিলার সঙ্গে কথা বলে ভালই হলো। তাকে, রাঁধুনীকে, আর লেডি অরগাননকে বাদ দেয়া যাচ্ছে সন্দেহের তালিকা থেকে।

ওদেরকে দেখে এগিয়ে এল মিস টোমার।

তাড়াতাড়ি বলল ফারিহা, 'কয়বার চশমা খসে পড়ে গোণা দরকার।'

'এই যে মুসা, এসে গেছ,' চওড়া হাসি হেসে বললেন মিস টোমার, 'নিশ্চয় লেডি অরগাননের সঙ্গে দেখা করতে চাও। মেয়েটাকে কোথাও দেখেছি মনে হয়? স্ট্রবেরির ডাল নিয়ে পালিয়েছিলে না তুমি? কি কাণ্ড! ওসব নিয়েও আবার কেউ পালায় নাকি!' হা-হা করে হাসতে গিয়ে চশমা খসে পড়ল তাঁর। চেনে ঝুলতে লাগল। আবার তুলে নাকে বসালেন তিনি।

'হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছেন,' জবাব দিল ফারিহা। 'লেডি অরগানন আমাকে দেখতে চেয়েছেন।'

'দেরি করে ফেলেছ। এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। আমি ছাড়া কথা বলার জন্যে আর কাউকে পাবে না এখন,' যেন এটাও একটা মহারসিকতা, হা-হা করে হাসতে গিয়ে আবার চশমা খসল মিস টোমারের।

মনে মনে গুনল ফারিহা, 'দুই!'

'পিটার কোথায় জানেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা। লেডি অরগাননের সঙ্গে দেখা হলো না বলে মন খারাপ করল না। তার দরকার তথ্য, সেটা জোগাড় করতে পারলেই হয়, যার কাছ থেকেই হোক।

'লেডি অরগানন কি তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে?' ফারিহা জানতে চাইল।

'না, তাড়াননি। বেড়ালটা খুব সুন্দর ছিল, তাই না? বিকেল চারটের সময়ও খাঁচায় দেখেছিলাম ওটাকে।'

'হ্যাঁ,' মুসা বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার আম্মাও ছিল। পিটারকে ছাড়া খাঁচার কাছে আর কাউকে দেখেননি?'

'না, কাউকে না। পিটার ওখানে কাজ করছিল। আমি আর তোমার আম্মা বেশিক্ষণ ছিলাম না, এই দু-তিন মিনিট। চা দেয়া হয়ে গিয়েছিল, একা পারছিলেন না লেডি অরগানন। তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে। পার্টি শেষ হওয়ার আগে আর মুহূর্তের ফুরসত পাইনি।'

'তাহলে আপনার পক্ষে বেড়ালটা চুরি করা সম্ভব ছিল না,' হেসে বলল মুসা।

এতটাই চমকে গেলেন মিস টোমার, নাক থেকে চশমা খসে গেল। লাল নাকের ডগাটা আরও লাল হয়ে উঠল। 'কি যে বলো!' কলারের লেসে আটকে যাওয়া চশমাটা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'চুরি জিনিসটা আমি সাংঘাতিক ঘৃণা করি। ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'বেড়ালগুলো দেখা যাবে, মিস টোমার?'

'কেন যাবে না। এসো।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরতে যেতেই আবার চশমা খসে গেল তাঁর।

জোরেই বলে উঠল ফারিহা, 'চারবার!'

ফিরে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে মিস টোমার জিজ্ঞেস করলেন, 'চারবার কি?' হাসতে গিয়ে গাল ছড়িয়ে নাক নিচু হয়ে যাওয়ায় আবার চশমা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি হাত তুলে সেটা ঠেকালেন।

'ধরবেন না, ধরবেন না!' প্রায় চিৎকার করে বলল ফারিহা, 'পড়ুক! কয়বার পড়ে আমি গুনছি!'

কথাটা সহজভাবে নিতে পারলেন না মিস টোমার, হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। চশমাটা ধরে রাখলেন, যাতে আর না পড়ে।

চুপ হয়ে গেল ফারিহা। বুঝল, কথাটা বলা উচিত হয়নি।

বেড়ালের ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

বেড়ালের জন্যে খাবার তৈরি করছে আইলিন। মুখ তুলে তাকাল। তার গোলগাল, হাসিখুশি মুখে উদ্বেগ। 'হাল্লো। বেড়াল দেখতে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ফারিহা। 'মিস ডেনভার, টিকসির হারিয়ে যাওয়াতে খুব দুঃখ লাগছে না?'

'লাগছে,' একটা পাত্রে কাঠি দিয়ে খাবার মেশাতে মেশাতে জবাব দিল আইলিন। 'কেন যে বেরোলাম সেদিন! কাজ না থাকলে অবশ্য যেতাম না। আমি চেয়েছিলাম একদিনের ছুটি, লেডি দিলেন একবেলার। ওই একবেলায় কাজ সেরেই যদি ফিরে আসতাম তাহলে চুরিটা আর হত না।'

'দেরি করে আসায় লেডি কিছু বলেননি?' জানতে চাইল মুসা।

'না। আমার কাজটা করে দিয়েছে হারপিগ। আমাকে একবেলা ছুটি দেয়া হয়েছে শুনে সে বলল, ইচ্ছে করলে আমি সারাদিনই কাটিয়ে আসতে পারি। বেড়ালগুলোকে দেখার দায়িত্ব নেবে সে। খুব খুশি হলাম। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তখন কি আর জানি, চুরি হবে! তাহলে কোনমতেই যেতাম না।'

'খাইছে! যেচে এসে দায়িত্ব নেয়ার কথা বলল!' অবাকই হলো মুসা। হারপিগ যে কারও প্রতি দয়া দেখাতে পারে, বিশ্বাসই হয় না। 'ও তো ওরকম লোক নয়!'

'আমারও অবাক লেগেছে,' মৃদু হাসল আইলিন। 'তবে বাড়ি যাওয়ার খুবই দরকার ছিল আমার। বাড়ি অনেক দূরে, যেতে আসতে সময় লাগে, একবেলার ছুটিতে অসুবিধে হত। তাই তার প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছি।'

'কি ভাবে যেতে হয়? ট্রেন না বাস?'

'দুটোতেই যাওয়া যায়। তবে আমার ট্রেনে যেতেই ভাল লাগে।'

ফারিহা বলল, 'ও ট্রেন! টিকেটগুলো আছে? রেলের টিকেট সংগ্রহ করি আমি, ভাল লাগে।'

অনেক ছেলেমেয়ে, এমনকি বড়দেরও রেলের টিকেট সংগ্রহ করার বাতিক আছে, আইলিন জানে। হেসে বলল, 'ফেরার পথে রাত হয়ে গিয়েছিল, তাড়াহুড়ো, তাই গেটে চেকারকে টিকেট দেয়ার পর ফেরত নিতে ভুলে গেছি। তবে যাওয়ার সময়েরটা আছে। নেবে?'

পকেটেই আছে টিকেটটা। বের করে দিল আইলিন।

খুব আগ্রহের সঙ্গে সেটা নিয়ে পকেটে রাখল ফারিহা। 'অনেক ধন্যবাদ।'

'মিস ডেনভার,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয় পিটারই বেড়ালটা চুরি করেছে?'

'না,' একটুও দ্বিধা না করে জবাব দিল আইলিন, 'আমার তা মনে হয় না। ছেলেটা কিছুটা বোকা, হুটহাট করে বোকার মত কাজও করে বসে, তবে চোর নয়। তবে কে নিয়েছে আন্দাজ করতে পারছি,' বলেই এদিক ওদিক তাকাল সে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'ওর এক আত্মীয় আছে, সার্কাসে কাজ করে! কি যেন নাম···হ্যাঁ, রোজার।'

এটা একটা খবর বটে গোয়েন্দাদের কাছে। সার্কাসে চাকরি-করা আত্মীয়! কই, পিটার তো তাদেরকে কখনও বলেনি! কেন বলল না?

'রোজার এখানে আসত?'

'না। পাশের শহরে থাকে সে, সার্কাসটা ওখানেই। টিকসিকে দিয়ে দারুণ খেলা দেখানো যাবে সার্কাসে। বেশ কয়েকটা খেলা আমি শিখিয়েছি তাকে। আরও শেখানো যায়।'

অধৈর্য হয়ে উঠছেন মিস টোমার, চায়ের সময় হয়ে গেছে। গলা খুসখুস করে উঠল। চশমা পড়ে যাওয়ার ভয়ে খুব আস্তে দু-বার কাশলেন, কিন্তু তাতেও ধরে রাখা গেল না, পড়লই। ফারিহা সেটা দেখল, গুণলও মনে মনে, তবে কিছু বলল না।

আইলিনকে ধন্যবাদ দিয়ে মিস টোমারের দিকে ফিরল মুসা। 'আপনি চলে যেতে পারেন আমাদেরকে আর এগিয়ে দেয়া লাগবে না, থ্যাংকিউ। দেয়াল টপকে চলে যেতে পারব আমরা'

'না না, ওভাবে যাওয়া উচিত হবে না গেট দিয়েই যাও। চলো, এগিয়ে দিচ্ছি...'

বাধা দিয়ে ফারিহা বলে উঠল, 'ওই যে হারপিগ!'

মালীর নাম শুনে এতটাই চমকালেন মিস টোমার, আবার চশমা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাদের যে ভাবে ইচ্ছে যাও, আটকাব না তোমরা এসেছিলে লেডি অরগাননকে বলব। গুড-বাই!'

আর একটা মুহূর্তও দাঁড়ালেন না মিস টোমার, তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন

'মোট আটবার পড়েছে,' দেয়াল টপকানোর সময় বলল ফারিহা। 'মুসা, পিটার যে রোজারের কথা বলেনি আমাদেরকে, অবাক লাগছে না তোমার?'

এগারো

চায়ের সময় হয়েছে। খেতে খেতে কিশোর আর রবিনকে সব জানাল মুসা ও ফারিহা।

'পিটার আজ কাজে আসেনি,' মুসা বলল, 'কেমন লাগছে না? তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেননি লেডি অরগানন। রোজারের কথাটাই বা আমাদের বলল না কেন সে? সব কথাই বলেছে, সার্কাসে কাজ করে তার একজন আত্মীয়, এমন সাংঘাতিক একটা খবর কেন চেপে গেল?'

'আচ্ছা,' উসখুস করে বলল রবিন, 'সত্যিই বেড়ালটাকে বের করে নিয়ে গিয়ে রোজারকে দিয়ে দেয়নি তো পিটার?'

এই প্রথম পিটারের ব্যাপারে সন্দেহের একটা হালকা ছায়া দোল খেয়ে গেল গোয়েন্দাদের মনে।

ফারিহা বলল, 'পিটার আর রোজার এ কাজ করেছে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমারও না,' রবিন বলল। 'সন্দেহটা তার ওপর পড়ে, সেজন্যে বললাম। আরগফের বাড়ি পোড়ার রহস্যের চেয়ে এ দেখছি অনেক কঠিন! কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

মুসা বলল, 'আমাদের সন্দেহের তালিকার সবার নামই কেটে দিতে হচ্ছে। যাদের যাদের নাম লিখেছি, তাদের কেউই টিকসিকে চুরি করেনি।'

'কি করে জানছ?' এই প্রথম কথা বলল কিশোর

'চুরি যখন হয়, সেই সময় টি-পার্টিতে ছিলেন লেডি অরগানন,' ব্যাখ্যা করল মুসা। 'এত লোকের সামনে থেকে উঠে এসে সবার চোখ এড়িয়ে বেড়াল চুরি করার মত সুযোগ তাঁর ছিল না পার্টির সময় সাংঘাতিক ব্যস্ত ছিল চাকরানী আর রাঁধুনী, তাদেরও সরার সুযোগ ছিল না। সরলে চোখে পড়ে যেত। মিস টোমারও লেডিকে

সাহায্য করার জন্যে সারাক্ষণ তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। দশ মিনিটের জন্যে সরলেও লেডি অরগানন লক্ষ করতেন ব্যাপারটা।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার তালিকাটা বের করো তো। এক এক করে কাটো।'

'আইলিনকেও বাদ দেয়া যায়,' মুসা বলতে থাকল। 'কাল বেড়াল চুরির সময় গ্রীনহিলসেই ছিল না সে, বহু মাইল দূরে আরেক গাঁয়ে চলে গিয়েছিল। রাতে ফিরেছে। টিকেটটাও দিয়েছে ফারিহাকে। সুতরাং তাকেও বাদ দেয়া যায়।'

'তারমানে সবাইই বাদ,' খ্যাচ করে আইলিনের নামটাও কেটে দিয়ে রবিন বলল, 'বাকি রইল কেবল পিটার। ভাবতে ইচ্ছে করছে না, তবু বলি, রোজার হয়তো তার সামনে দিয়েই খাঁচার কাছে গিয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ টিপে মুচকি হেসে আরামসে গিয়ে ঢুকেছে খাঁচার মধ্যে। বেড়ালটাকে বের করে নিয়ে চলে গেছে। পিটার দেখেও না দেখার ভান করেছে। যদিও আমি বিশ্বাস করি না এ কথা।'

'আমি জানি পিটার এখন কোথায়,' মুসা বলল। 'সার্কাসে। তার আত্মীয়র ওখানে গিয়ে লুকিয়েছে। সার্কাসটা শহর থেকে যখন বেরিয়ে যাবে সে-ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

মুসার সঙ্গে একমত হলো সবাই, ওই একটিমাত্র জায়গাতেই এখন পিটারের থাকার সম্ভাবনা বেশি।

'তাহলে চা খেয়েই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা,' ঘোষণা করল কিশোর। 'পাশের শহরে গিয়ে পিটারের সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক বলেছ!' টেবিলে চাপড় মারল রবিন। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'জলদি খাওয়া শেষ করো!'

এই সময় চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মুসার আম্মা। ছেলেমেয়েদের ওভাবে নাকেমুখে খাবার গুঁজতে দেখে অবাক হলেন। 'কি হলো, রাক্ষস হয়ে গেলি নাকি সব? দুপুরে খেয়ে পেট ভরেনি?'

'ভরেছে,' জবাব দিল কিশোর, 'টেবিলে বসে থাকতে ভাল্লাগছে না, তাই তাড়াতাড়ি করছি। চায়ের পর সাইকেল নিয়ে বেড়াতে যাব তো।'

'পাশের শহরে...' ফস করে বলে ফেলল ফারিহা। টেবিলের নিচ দিয়ে পায়ে মুসার লাথি খেয়ে চুপ হয়ে গেল।

আরও অবাক হলেন মিসেস আমান, 'পাশের শহরে কি কাজ? ওখানে দেখার মত কিছু আছে বলে তো শুনিনি?'

তারমানে সার্কাস আসার খবরটা জানেন না তিনি, বুঝল রবিন। ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করল, 'আসলে সাইকেল চালানোটাই বড় কথা, অনেকক্ষণ ধরে চালাতে পারব। সেজন্যেই দূরে যেতে চাইছি। গিয়ে ওখানে দেরি করব না।'

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মিসেস আমান। তবে আর কিছু জানার জন্যে চাপাচাপিও করলেন না।

বাড়ি থেকে গিয়ে সাইকেল নিয়ে আসতে হলো কিশোরকে। টিটুও খুশি, কারণ তাকেও ফেলে যাওয়া হবে না। শহরটা খুব বেশি দূরে না, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে

যেতে পারবে সে।

এগিয়ে চলল সাইকেলের মিছিল। পথের একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে আরেকটা সাইকেল চোখে পড়ল ওদের। পেটের কাছটায় অতিরিক্ত মোটা, ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ সাইকেল চালিয়ে চলেছে।

'খাইছে! ঝামেলা!' বলে উঠল মুসা। 'এই, আরও আস্তে চালাও। সামনে থেকে যাক, তারপর জোরে এগোব।'

কিন্তু গেল না ফগ। সে-ও যেন একই দিকে চলেছে, ওরা যেখানে যাচ্ছে সেখানে।

'পিটারকেই খুঁজতে যাচ্ছে না তো?' অস্বস্তি লাগছে কিশোরের। 'হয়তো রোজারের কথা জেনে ফেলেছে সে-ও। তাহলে আমাদের আগে তাকে কিছুতেই যেতে দেয়া চলবে না। রোজার একটা বড় সূত্র।'

হঠাৎ করেই এমন একটা ঘটনা ঘটল, সমাধান হয়ে গেল সমস্যার। ফগের সাইকেলের পেছনের চাকা পাংচার হয়ে গেল, কাঁচের টুকরো কিংবা পেরেক ঢুকেছে। গোয়েন্দারা দেখল, আচমকা বসে গেল চাকাটা। ক্ষণিকের জন্যে টালমাটাল হয়ে গেল ভারসাম্য, সামলে নিল ফগ, সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল।

সাইকেলটা রাস্তার পাশে সরিয়ে চাকা মেরামতের জন্যে টুল-বক্স খুলে নিল সে। হাসতে হাসতে তার পাশ কাটাল ছেলেমেয়েরা।

তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিশোর, 'ইভনিং, মিস্টার ফগ। আপনাকে বিপদে পড়তে দেখে খারাপই লাগছে।'

ওদেরকে শহরের দিকে যেতে দেখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল ফগ। তারপর চাকা মেরামতে মন দিল। জলদি সারার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে লাগল।

গতি বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দারা। ওরাও তাড়াহুড়ো করছে। নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই পনেরোটা মিনিট হাতে পেয়ে গেছে ওরা। যত তাড়াতাড়িই করুক, এর কমে চাকার ফুটো মেরামত করতে পারবে না ফগ।

একটা পাহাড় পার হয়ে ওপাশে আসতেই ফারিহা বলে উঠল, 'ওই যে সার্কাসের তাঁবু।'

একটা ক্যারাভানের পাশে সারি সারি বাক্স দেখা গেল, ওগুলোতে নানা রকম জন্তু-জানোয়ার। পায়ে শেকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা হাতি। খাঁচায় বন্দি পাঁচটা বাঘ থেকে থেকেই হাঁক ছাড়ছে খাবার দিয়ে যাওয়ার জন্যে। তৃণভূমিতে চরে খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে দশ-বারোটা কালো রঙের চমৎকার ঘোড়া।

ক্যারাভানের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বাতাসে খাবারের সুগন্ধ।

বেড়ার গায়ে সাইকেল হেলান দিয়ে রাখতে রাখতে রবিন বলল, 'আমাদের প্ল্যান কি? পিটারকে খুঁজব, না রোজারের কথা জিজ্ঞেস করব?'

'রোজারকেই খুঁজব,' জবাব দিল কিশোর। 'পিটারকে এখানে কেউ চেনে না, আর চিনলেও রোজারের চেয়ে বেশি নয়। ফারিহা এখানে থাকুক, আমাদের সাইকেলগুলো পাহারা দিক। ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব আমরা। একা একা ঘুরলে সহজে

কারও চোখে পড়ব না। ওই দেখো না কত ছেলেমেয়ে ঘোরাঘুরি করছে।'

আলাদা আলাদা হয়ে খুঁজতে চলল তিন গোয়েন্দা সামনে যাকে পেল তাকেই জিজ্ঞেস করল রোজারকে চেনে কিনা।

সার্কাসে কাজ করে একটা ছোট মেয়ে, মুসার সামনে পড়ল সে। রোজারের কথা জিজ্ঞেস করতেই প্রথমে জিভ দেখিয়ে ভেঙচাল, তারপর আজেবাজে কথা বলে ছড়া কাটতে লাগল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। এইসব মেয়েগুলো যে কেন এ রকম হয়, বুঝতে পারে না সে; কিছুতেই যেন স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না ওরা। এগোতে যাবে, এই সময় ডেকে তাকে থামাল মেয়েটা। নীরবে হাত তুলে একটা লোককে দেখিয়ে দিল। আরও অদ্ভুত লাগল মুসার। প্রথমে খারাপ আচরণ করল, তারপর···মরুকগে! ওদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, জবাব পাবে না।

ঘোড়াকে পানি খাওয়াচ্ছে একজন বিশালদেহী মানুষ। তার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা।

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। 'কী?'

'আপনি মিস্টার রোজার?'

'হ্যাঁ।'

'পিটার নামে একটা ছেলেকে খুঁজছি। একটা খবর আছে তার। ও কি এখানে আছে?'

'না,' জবাব দিল লোকটা, 'অনেক দিন হলো দেখি না।'

'ও। তার ঠিকানা জানেন?'

'না!' আচমকা রুক্ষ হয়ে উঠল লোকটার কণ্ঠ, 'আমি কি তার ঠিকানা নিয়ে বসে আছি নাকি? যাও যাও, নিজের কাজে যাও! বিরক্ত করো না!'

এই সময় সেখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। লোকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি মিস্টার রোজার?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'পিটারকে দেখেছেন?'

'অনেক দিন ধরে নাকি দেখা নেই।'

লোকটার দিকে ফিরল কিশোর। গলাটা মোলায়েম করে বলল, 'দেখুন, আমরা পিটারের বন্ধু। বিশ্বাস করুন। তার সঙ্গে কথা বলাটা জরুরী।'

'বললামই তো সে কোথায় আছে জানি না আমি,' কড়া গলায় জবাব দিল রোজার। 'অনেক দিন দেখা হয় না। সরো, আমাকে কাজ করতে দাও।'

ওরা যখন কথা বলছে ফারিহা তখন সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখছে পাহাড়ের দিকের রাস্তাটার দিকেও তাকাচ্ছে ফগ আসে কিনা দেখার জন্যে। ভেবে রেখেছে, তাকে আসতে দেখলেই পাতাবাহারের বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়বে। কিন্তু সে লুকানোর আগেই যদি ফগ তাকে দেখে ফেলে, এখানে কি করছে জিজ্ঞেস করতে আসে?

ঝুঁকি না নিয়ে ফগ আসার আগেই তাই আড়ালে লুকিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল সে ঢুকে পড়ল একটা গাছের জটলার মধ্যে। কাছেই একটা লাল রঙের ক্যারাভান মুখ তুলে তাকাতেই ভীষণ চমকে গেল। পর্দা দেয়া জানালার ওপাশ

থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা মুখ। মুখটা আর কারও না, পিটারের!

বারো

দম বন্ধ করে পড়ে রইল ফারিহা।

আরেকটু সরে গেল পর্দা। নিঃশব্দে মাথা বের করল পিটার। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ফারিহা, কেন এসেছ? সার্কাস দেখতে?'

'না।' উঠে দাঁড়িয়ে স্বর নামিয়ে বলল ফারিহা, 'শুনলাম তোমার এক আত্মীয় এখানে কাজ করে। তুমি এখানে তার কাছে আছ কিনা দেখতে এসেছি।'

'সে আমার চাচা। খুব একটা পছন্দ করি না তাকে, তবু আর কোন উপায় না দেখে তার কাছেই আসতে হলো। নইলে আমাকে জেলে ঢোকাত ওরা। পালিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু টিকসিকে তো তুমি চুরি করোনি।'

'তা তো করিইনি। ওরা বিশ্বাস করে না। তুমি একা এসেছ?'

'না, কিশোররাও এসেছে। রোজারকে খুঁজতে গেছে ওরা, তোমার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে।'

'তাই? টিকসির কথা চাচাকে বলিনি, আবার কি ভেবে বসে সে-জন্যে। বলেছি আমার সৎবাপ আমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করছে, টিকতে না পেরে পালিয়েছি। কাল রাতে বাবা আমাকে অনেক মেরেছে, দাগগুলো দেখিয়েছি চাচাকে। সার্কাসে একটা কাজ জোগাড় করে দিতে বলেছি। বলেছে দেবে। এখান থেকে সার্কাস পার্টি অন্য কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়েও রাখবে।'

'ইস্, পিটার, তোমার জন্যে সত্যি কষ্ট হচ্ছে আমার! খুব খারাপ সময় যাচ্ছে তোমার। কিশোররা বেড়াল চুরির কথা এখন তোমার চাচাকে না বললেই হয়।'

'বললে আর কি, চাচাও বের করে দেবে। পুলিশের ঝামেলায় কেউ যেতে চায় না। ফারিহা, আমি যে এখানে আছি কাউকে বোলো না!'

'না, বলব না। কেবল কিশোরদেরকে ছাড়া।'

কথা শোনা গেল, এগিয়ে আসছে। ঝট করে আবার জানালাটা লাগিয়ে দিল পিটার।

অন্য কেউ নয়, গোয়েন্দারাই আসছে। হতাশ হয়েছে খুব, পিটারের কোন খোঁজ পায়নি বলে।

ফারিহাকে দেখে মাথা নেড়ে কিশোর বলল, 'কোন লাভ হলো না, বুঝলে। রোজারকে পেয়েছি, কিন্তু একটা কথাও বের করতে পারলাম না তার কাছ থেকে...'

হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। ফারিহার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল। 'কি ব্যাপার? কিছু বলবে মনে হচ্ছে?'

'আমি জানি কোথায় আছে।'

হাঁ করে ফারিহার দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'তুমি জানো মানে! কোথায়?'

'আস্তে!' এদিক ওদিক তাকিয়ে, কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফারিহা বলল, 'এই লাল ক্যারাভানটার ভেতর। আমার সঙ্গে কথা বলেছে। রোজার তার চাচা, তাকে বেড়াল চুরি হওয়ার কথা বলেনি। পুলিশের ভয়ে যে পালিয়ে এসেছে তা-ও বলেনি। কাউকে বলতে মানা করেছে আমাদের। চাচাকে বলেছে, সৎবাপের মার খেয়ে পালিয়েছে।'

'আমরা কাউকে বলিনি বেড়াল চুরির কথা, বলবও না।' জানালাটার দিকে তাকাল মুসা, 'তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

শিস দিয়ে সঙ্কেত জানাল সে। খুলে গেল জানালা। পর্দা কেঁপে উঠল। উঁকি দিল পিটার।

'হাল্লো, পিটার,' নিচু স্বরে বলল কিশোর, 'রোজারকে বেড়াল চুরির কথা কিছু বলিনি আমরা, ভয় পেয়ো না। সত্যিই তুমি সার্কাসের সঙ্গে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তাহলে তো সবাই ভাববে সত্যি সত্যি টিকসিকে চুরি করে ভয়ে পালিয়েছ তুমি, সেটা কি উচিত হবে? অপরাধ না করেও দোষ ঘাড়ে নিয়ে পালানোটা কোন কাজের কথা নয়।'

বেড়ার বাইরে সাইকেল থেকে নামার শব্দ হলো। ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে লোকটার, হাঁপাচ্ছে। না দেখেও আন্দাজ করতে পারল গোয়েন্দারা, ফগর‍্যাম্পারকট ছাড়া কেউ না। চাকা মেরামত করে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে গেছে।

বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি দিতেই গোয়েন্দাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো তোমাদের সাইকেল? এখানে কি করছ?'

'সার্কাস দেখতে এসেছি,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'বাঘের খাঁচা দেখেছেন? অনেক বড় বড়। সাবধান, কাছে যাবেন না, খেয়ে ফেলবে! কারও গায়ে এত মাংস দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না।'

রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ফগ। 'ঝামেলা! বেশি বাড় বেড়েছে, না? সার্কাস দেখতে আসোনি তোমরা, আমি খুব ভাল করেই জানি। পিটারকে পেয়েছ?'

'পিটার?' চোখ বড় বড় করে ফেলল কিশোর। 'কোন পিটার?'

'ঝামেলা! পিটারকে চেনো না? টিকসিকে যে চুরি করেছে।'

'বলেন কি! পিটার এখন আসবে কি করতে? তা ছাড়া ও চোর নয়, প্রমাণ করতে পারবেন না। নিশ্চয় এখন লেডি অরগাননের বাগানে ফুলের বেড সাফ করছে।'

'ভাগো এখান থেকে, যাও!' ধমকে উঠল ফগ। 'এখানে কোন কাজ নেই তোমাদের। পুলিশের কাজে বাগড়া দিতে এসেছ!'

'সার্কাস দেখাটা কি পুলিশের কাজে বাগড়া দেয়া? তাহলে সার্কাসের পুরো দলটাকেই ধরে হাজতে ভরছেন না কেন?'

'ঝামেলা!' রাগত ভঙ্গিতে আবার সাইকেলে চড়ে গেটের দিকে এগোল ফগ।

পিটারের সঙ্গে কথা বলতে আর সাহস করল না ওরা। বেড়ার অন্যপাশে এসে দেখল, একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে ফগ। হাত তুলে রোজারকে দেখিয়ে দিল লোকটা। ঘোড়াকে এখন ছোলা খাওয়াচ্ছে রোজার। তার দিকে এগিয়ে গেল ফগ।

'আর কোন সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল, 'রোজারের কথা জেনে ফেলেছে সে। ভাতিজার কথা এখন রোজার বলে না দিলেই হয়!'

'এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত,' মুসা বলল। 'এই ক্যারাভানের কাছে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলে ফগের সন্দেহ জাগতে পারে।'

এখানে আর কোন কাজ নেই। সাইকেলে চেপে বাড়ি রওনা হলো ওরা।

'তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিয়েছে পিটার,' প্যাডাল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল রবিন। 'রোজারের কাছেও ভাল থাকবে না সে। তার সৎবাপ কিংবা হারপিগের চেয়ে খুব একটা ভাল নয় তার চাচা।'

বাড়ি ফিরতে প্রায় রাতই হয়ে গেল।

বিদায় নিয়ে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল কিশোর আর রবিন।

রাতের খাওয়ার পর শুতে গেল মুসা আর ফারিহা। সারাদিন পরিশ্রম করেছে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুঃস্বপ্ন দেখল মুসা—সাইকেলে করে ফগ তাকে তাড়া করেছে। ফগের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রোজার, বিশাল এক বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছে লোকটা। প্রাণপণে ছুটছে মুসা, ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। শিস শুনতে পেল এই সময়।

ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরল সে। বেজেই চলেছে শিস, বেজেই চলেছে যেন অনন্তকাল ধরে···

কিসে যেন কাঁধ খামচে ধরল তার। ভেঙে গেল ঘুম। লাফ দিয়ে উঠে বসল, চোখে স্বপ্ন আর ঘুমের ঘোর নিয়ে। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটা চিৎকার।

'আস্তে!' ফারিহার কণ্ঠ। 'শব্দ কোরো না!'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?' রেগে উঠল মুসা। 'উফ্, আরেকটু হলেই হার্টফেল করে মরতাম!'

'শোনো, বাগানে শিস দিচ্ছে! পিটার ছাড়া আর কেউ না! চিনতে পারছ না? আমাদের ডাকছে না তো?'

পুরো সজাগ হয়ে গেছে এতক্ষণে মুসা। বুঝতে পারল, স্বপ্নের মধ্যে এই শব্দই কানে ঢুকেছিল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। বলল, 'পিটারই! নিশ্চয় সার্কাস থেকেও পালিয়েছে! তুমি এখানে থাকো, আমি দেখে আসি কি চায়?'

'আমিও আসব। কারণ আমি শুনেই তোমাকে জাগিয়েছি।'

'অন্ধকারে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাবে। শব্দ করে দেবে মাকে জাগিয়ে।'

'কিছুই করব না। আমি কি গাধা নাকি!'

'হয়েছে, চেঁচিও না! এসো। তবে কিছু করে মাকে যদি তোলো, মজা বোঝাব।'

কাপড় বদলানোর প্রয়োজন মনে করল না ওরা। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। কয়েক ধাপ নেমেই কিসে যেন পা পড়ল মুসার, পড়েই যাচ্ছিল,

থাবা দিয়ে রেলিঙ ধরে সামলে নিল।

'কি হলো?'

'বেড়াল! হতচ্ছাড়া পাজী ওই মাছচোর হুলোটাই হবে! ধরে ভালমত ধোলাই দেব একদিন! আল্লাই জানে, মা শুনে ফেলল কিনা!'

সিঁড়িতেই চুপ করে বসে কান পাতল দু-জনে, কেউ শুনলে সাড়া দেবে কিন্তু মায়ের বেডরুম থেকে কোন শব্দ শোনা গেল না। সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে বেড়ালটা। অন্ধকারে জ্বলছে ওটার চোখ।

'ইচ্ছে করে পায়ের নিচে পড়েছে শয়তানটা!' রাগে হিসহিস করে উঠল মুসা। চাপা স্বরে গাল দিল, 'হেই বেড়াল, যা-যাহ্!'

'আমাকে ধমকেছ শব্দ করব বলে, এখন যে তুমি করছ?' ফারিহা বলল

ছুটে পালাল বেড়ালটা।

অন্ধকারে আবার হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, পেছনের দরজা খুলে বাগানে বেরিয়ে এল দু-জনে। মুসার হাত আঁকড়ে ধরে আছে ফারিহা। অন্ধকারকে তার ভয়।

আবার শোনা গেল শিস।

'বাগানের ওই দিকটা থেকে আসছে,' হাত তুলে কোন্ দিক দেখাল মুসা, অন্ধকারে বুঝতে পারল না ফারিহা। 'এসো। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটবে, খোয়ায় পা ফেলবে না খবরদার, শব্দ হবে।'

পা টিপে টিপে এগোল ওরা। বাড়ির পেছনের বাগান পেরিয়ে, ফেলে রাখা বাতিল জিনিসের একটা স্তূপের পাশ দিয়ে এসে ছাউনির দিকে তাকাতেই নড়াচড়া চোখে পড়ল। একটা ছায়ামূর্তি।

পিটার! অন্ধকারে তার গলা শুনতে পেল ওরা। তারমানে সত্যি সত্যি পালিয়ে এসেছে সে।

তেরো

বাইরে নিরাপদ নয়, পিটারকে তাই ছাউনির ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা বাক্সে বসেছে সে।

'পিটার,' জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি ব্যাপার? সার্কাস থেকে চলে এলে কেন?'

'ওই পুলিশটা আমার চাচাকে বেড়াল চুরির কথা বলে দিয়েছে। বলেছে, আমি নাকি চুরি করেছি। বেড়ালটা চাচার কাছে লুকিয়েছি কিনা আকারে-ইঙ্গিতে এ কথাও জানতে চেয়েছে।'

'তারপর? তোমার চাচা তোমার কথা বলে দিয়েছে?'

'না। বলেছে, বেড়াল চুরির কথা সে শোনেনি, অনেক দিন আমার সঙ্গে দেখা নেই। পুলিশের কাছে আমাকে তুলে দেয়নি সে। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেনি ফগ। তার ধারণা, সার্কাসেই কোথাও আছে টিকসি। আমার মনে হলো,

বেড়ালটার জন্যে তল্লাশি চালাতে সে আসবেই।'

'তারমানে তোমাকেও খুঁজবে,' ফারিহা বলল

'সে তো বটেই। ফগ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল চাচা, তারপর এসে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলল। বলল, সৎবাপের কাছ থেকে পালানো সে সহ্য করতে রাজি আছে, কিন্তু পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে আসা কিছুতেই সহ্য করবে না।'

'খাইছে! তাহলে তো এখন আর সৎবাপের কাছেও যেতে পারবে না!' মুসা বলল, 'ভাল বিপদে পড়েছ দেখছি!'

'প্রশ্নই ওঠে না। গেলে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। বুঝতে পারছি না কি করব! প্রথমেই তোমাদের কথা মনে পড়ল, তাই চলে এলাম। আমার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। না খেয়ে আছি সেই দুপুর বারোটা থেকে। খিদেয় পেট জ্বলছে।'

পিটারের জন্যে খুব কষ্ট হলো ফারিহার। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসো, দেখি রান্নাঘরে কি আছে।'

হাত ধরে তাকে টেনে থামাল মুসা, 'গাধামি কোরো না। সকালে খাবারগুলো নেই দেখলে মা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। মিথ্যে বলতে পারবে না যে কাউকে দিয়েছ। তখন জানতে চাইবে কাকে দিয়েছ।'

'তাহলে কি করব? পিটার কি খিদেয় মরবে?'

গাল চুলকে চিন্তা করে নিল মুসা। 'এক কাজ করা যেতে পারে, রান্না করা কোন খাবারে হাত না দিয়ে রুটি, মাখন আর চিনি এনে দিতে পারি। ওগুলো সরালে টের পাবে না মা।'

অন্ধকারকে ভয় পেলেও এখন উত্তেজনায় সেটা যেন আর টেরই পেল না ফারিহা। প্রায় দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে রুটি-মাখন এনে দিল।

থাবা দিয়ে তার হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল পিটার। কতটা ক্ষুধার্ত সে বোঝা গেল। তাতে আরও কষ্ট লাগল ফারিহার।

খেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে পিটার বলল, 'ক্ষুধার চেয়ে বড় যন্ত্রণা পৃথিবীতে আর কিছু নেই! উফ্, মনে হচ্ছিল মারা যাচ্ছি!'

'তা তো হলো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'ঘুমাবে কোথায়?'

'জানি না। হয়তো কোন ঝোপের মধ্যে। ভবঘুরেই হয়ে যেতে হবে দেখছি!'

'বরং আমাদের এখানেই থাকো,' ফারিহা বলল। 'এ ঘরেই থাকতে পারবে। আমরা ছাড়া এখানে কেউ আসে না। বিছানার ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে। ঘুমাতে পারবে।'

'তা ঠিক,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মুসা। 'দিনের বেলা কোন না কোন ভাবে খাবারও এনে দিতে পারব। মজাই হবে!'

মাথা নাড়ল পিটার, 'না, তোমাদের বিপদে ফেলতে চাই না।'

'তা পড়ব বলে মনে হয় না। আর পড়লে পড়লাম, সে তখন দেখা যাবে। ইতিমধ্যে বেড়ালটা কি করে উধাও হলো, সে রহস্যেরও সমাধান আমরা করে ফেলতে পারব হয়তো। তখন আবার চাকরিতে ফিরে যেতে পারবে তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'দাঁড়াও, বিছানা পাতার জন্যে কিছু নিয়ে আসি,' আবার অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল ফারিহা।

গদি, চাদর, বালিশ এ সব একা আনতে পারবে না সে, তাই তাকে সাহায্য করতে চলল মুসা।

পুরানো একটা ম্যাট্রেস বয়ে আনল দু-জনে। কয়েকটা বাক্সকে পাশাপাশি সাজিয়ে চৌকির মত বানিয়ে তার ওপর পাতল ওটা। গ্যারেজে পুরানো কম্বলও পাওয়া গেল একটা।

'বাহ্, রাজার বিছানা হয়ে গেল দেখি!' খুশিমনে বলল পিটার।

'সকালে নাস্তা নিয়ে আসব,' কথা দিল ফারিহা।

'যদি তোমাদের মালী আসে?' কথাটা মনে পড়তে আবার অস্বস্তি বোধ করল পিটার। 'ক'টার সময় আসে? এখানে ঢোকে?'

'ওর অসুখ,' মুসা জানাল। 'কয়েক দিন ধরে আসছে না। সব্জীর বাগানটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে মা। আমাকে আর ফারিহাকে বলছে কষ্ট করে একবার নিড়ানি দিয়ে দিতে। কিন্তু আমার ওসব ভাল্লাগে না।'

'যাক,' নিশ্চিন্ত হলো পিটার, 'যে কদিন না আসে, বাঁচব। তোমরা এখন যাও, ঘুমাওগে। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই পিটারের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা আর ফারিহা। প্রথমেই ভাবল মুসা, কি নাস্তা দেবে তাকে? মাংসভাজি হয়তো খানিকটা সরাতে পারবে, কিন্তু সেদ্ধ ডিম চুরি করলে ধরা পড়ে যাবে। গুণে গুণে সেদ্ধ করে মা। তবে রুটি আর মাখন নিতে অসুবিধে নেই।

ফারিহাও ঠিক একই কথা ভাবল। বিছানা ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিচে নামল। রান্নাঘর তখনও খালি, কেউ ঢোকেনি। তাড়াতাড়ি কয়েক টুকরো রুটি কেটে নেয়ার জন্যে ছুরি বের করল। ভাবল, এত তাড়াতাড়ি খালা আসবে না। কিন্তু যেই রুটিতে পোঁচ বসিয়েছে সে, অমনি ঘরে ঢুকলেন তিনি। থমকে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'কি হলো তোর? এত জলদি ঘুম থেকেই উঠতে দেখি না কোনদিন, আজ একেবারে খিদে পেয়ে গেল! এত্তবড় রুটি নিয়েছিস!'

কি আর করে বেচারি ফারিহা। রুটিগুলো নিজের প্লেটে নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিবাতে শুরু করল। মুসা এসে তার প্লেটের রুটি দেখে চোখ কপালে তুলল। পরক্ষণেই আন্দাজ করে নিল ঘটনাটা কি ঘটেছে।

নাস্তা করতে বসল ওরা। মুসার বাবাও এসে ঢুকলেন।

বড় এক ডিশ মাংস ভেজে নিয়ে এলেন মা।

চামচ দিয়ে নিজের প্লেটে এতটাই মাংস নিয়ে ফেলল মুসা, যা তার মত পেটুকও কোনদিন খেতে পারে না। দেখাদেখি ফারিহাও অনেকখানি নিয়ে নিল তার প্লেটে। দু-জনেরই ইচ্ছে মা একটু সরলেই খানিকটা করে তুলে নিয়ে কাগজে মুড়ে ফেলবে।

কিন্তু এত বেশি করে নেয়াটা মায়ের চোখ এড়াল না। বললেন, 'কি হলো আজ তোদের? এতই খিদে পেয়েছে?'

মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না মুসা, নীরবে কেবল মাথা ঝাঁকাল।

ডিম ভাজতে আবার চুলার কাছে চলে গেলেন মা। বাবা খবরের কাগজের ওপাশে মুখ ঢেকে আছেন। এই সুযোগে চট করে খানিকটা করে মাংস কাগজে মুড়ে ফেলল মুসা ও ফারিহা দু-জনেই।

রান্নাঘরে ঢুকল তাদের ঠিকে কাজের মেয়ে নুরিয়া। মুসার আম্মাকে বলল, 'ম্যাডাম, আমাদের লোকাল হাসপাতালের জন্যে সাহায্য চাইতে এসেছে বেটিনা। কিছু দেবেন?'

'দেব।' টাকা আনতে ওপরতলায় চলে গেলেন মিসেস আমান।

মুসা আর ফারিহার পোয়াবারো। দ্রুতহাতে যতটা সম্ভব খাবার সরিয়ে কাগজে মুড়ে মুড়ে পকেটে রাখতে লাগল। ব্যাপারটা দেখে ফেললেন মিস্টার আমান। তবে মুসার আম্মার মত অতটা সন্দেহপ্রবণ নন তিনি। ভাবলেন, বাচ্চাদের ছেলেমানুষী। হেসে বললেন, 'পরে খাওয়ার জন্যে রাখছ নাকি?'

চমকে গেল মুসা আর ফারিহা। 'হ্যাঁ-না' করে দায়সারা গোছের একটা জবাব দিয়ে দিল মুসা। আর মাথা ঘামালেন না মিস্টার আমান। আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিলেন।

এত খাবার পেয়ে পিটারের তো চোখ কপালে। আরাম করে বসে খাবার চিবাতে লাগল সে। সেই সঙ্গে চলল নিচু স্বরে কথা বলা।

'খাও,' মুসা বলল। 'সময় হলে আবার এনে দেব।'

বোতল থেকে পানি খেতে খেতে মাথা ঝাঁকাল পিটার।

বাইরে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

'ওই যে,' হাসিমুখে বলল ফারিহা, 'টিটু আর কিশোর এসে পড়েছে।'

ভেতরে ঢুকেই পিটারকে দেখে খুশি হয়ে তার হাত চেটে দিতে ছুটে এল টিটু।

দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল কিশোর। বিশ্বাসই করতে পারছে না নিজের চোখকে।

হেসে ফেলল ফারিহা। বলল, 'কাল রাতে এসেছে। খাবার জোগাড় করে দিয়েছি আমরা। কিশোর, বেড়ালটা কে চুরি করেছে, তদন্ত করে বের করা দরকার যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। পিটার খুব বিপদে আছে।'

সব কথা জানাতে লাগল কিশোরকে মুসা আর ফারিহা। ইতিমধ্যে রবিনও এসে হাজির হলো। সে-ও শুনল সব।

পিটারকে বাঁশিটা দেখানো হলো।

কিশোর বলল, 'এটা আমরা বেড়ালের খাঁচায় পেয়েছি। ফগ পেয়ে যেত, হারপিগ তাকে বলে দিত যে বাঁশিটা তোমার, ভীষণ বিপদে পড়ে যেতে। সেজন্যেই আমরা বের করে নিয়ে এসেছি নানা রকম ফালতু সূত্র ফেলে দিয়েছি খাঁচায়। দেখলে তোমার হাসি পেত।'

কি কি রেখেছে জানাল পিটারকে।

'ও, এই জন্যেই,' শিস দিয়ে উঠল পিটার, 'আমার চাচাকে সিগার খেতে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ফগ। অবাক লাগছিল আমার, বুঝতে পারছিলাম না কেন।'

'কি ব্র্যান্ড বলো তো?' বলল পিটার।

হেসে বলল কিশোর, 'আমার চাচাও এই ব্র্যান্ডই খায়।'

ফগ কি ভাবে বোকা বনেছে আলোচনা করে হাসাহাসি করতে লাগল সবাই।

বাঁশিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে পিটার বলল, 'আমিই বানিয়েছি এটা। বাগানেই কোথাও ফেলে দিয়েছিলাম। খাঁচার মধ্যে কি করে গেল বুঝতে পারছি না।'

রহস্যটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। সমাধান বের করতে পারল না।

যাই হোক, মুসাদের ছাউনিতেই থাকতে লাগল পিটার। খাবারের অসুবিধে হলো না তার মুসা আর ফারিহা তো সুযোগ পেলেই রান্নাঘর থেকে সরিয়ে ফেলে, রবিন আর কিশোরও যা পারে খাবার নিয়ে আসে পিটারের জন্যে। হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে পানি, সাবান এবং তোয়ালের ব্যবস্থাও করা হলো।

পিটারও বসে বসে খায় না, বিনিময়ে সামান্য যা কিছু কাজ করে দেয়া সম্ভব করে দিতে লাগল। মুসার আম্মা যখন বাড়ি থাকেন না তখন ছাউনি থেকে বেরিয়ে সব্জী বাগানের নিড়ানি দেয়া থেকে শুরু করে সব রকমের পরিচর্যা করে। এতে করে তাকে আরও বেশি পছন্দ করে ফেলল ছেলেমেয়েরা।

তিনদিন পর ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

চোদ্দ

বিকেল বেলা রাস্তায় কিশোর আর টিটুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ফগের।

হাত তুলে তাকে থামাল ফগ, 'দাঁড়াও। কথা আছে।'

'দেখুন,' যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বলল কিশোর, 'আমার কাজ আছে। এখন...'

'যা বলি শোনো!' রেগে গেল ফগ। 'বললাম না কথা আছে!'

'আপনার আর কি কথা থাকবে। বড়জোর *ঝামেলা* কিংবা *যাও, ভাগো!* আর কি...'

'দেখো ছেলে, বেয়াদবের মত কথা বোলো না! আমার বিশ্বাস, পিটার কোথায় আছে জানো তোমরা। সাবধান করে দিচ্ছি, তাকে লুকিয়ে রাখলে, কিংবা কোথায় আছে যদি পুলিশকে না জানাও, বিপদে পড়বে। সাংঘাতিক বিপদ!'

চমকে গেল কিশোর। ফগের এ রকম সন্দেহ হলো কেন?

'আপনি জানেন আমরা রেখেছি? বের করতে পারবেন?'

কিশোরের চ্যালেঞ্জে দ্বিধায় পড়ে গেল ফগ। সরাসরি জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে বলল, 'জানি অনেক কিছুই। সময়ে টের পাবে।' কালো খাতাটা ঝটকা দিয়ে বন্ধ করে পকেটে ফেলে গটমট করে চলে গেল সে।

কিশোর চলল তার নিজের পথে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে। ভাবছে, পিটারের কথাটা জানল কি করে ফগ? দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে হারপিগ দেখে তাকে বলে দেয়নি তো? পিটারকে আর ছাউনিতে রাখাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি করা যায়? কিছু টাকা দিয়ে বলবে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে?

দলের সবাইকে খবরটা জানাল কিশোর। ওরাও চিন্তিত হয়ে পড়ল। ফারিহা তো মুষড়েই পড়ল। বলল, 'না না, পিটারকে যেতে দেয়া যাবে না। একটাই উপায়, রহস্যটার সমাধান করে লেডি অরগাননকে গিয়ে বলা।'

'কিন্তু সমাধান কি করে করব বুঝতে পারছি না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আসলে যতটা চালাক ভেবেছি নিজেদেরকে, ততটা বোধহয় নই। বড় জটিল রহস্য এটা, সমাধান স্বয়ং ক্যাপ্টেন রবার্টসনও করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

'আচ্ছা,' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল রবিন, 'তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলেও তো পারি আমরা?'

মুসা বলল, 'ঠিক। সব কথা তাঁকে জানাই আমরা। পিটারের কথাও বলি। একটা ব্যবস্থা তিনি করবেনই।'

কিশোর বলল, 'ফোন করব তাঁকে।'

সেদিনই বাড়ি ফিরে ক্যাপ্টেনকে ফোন করল সে। পাওয়াও গেল তাঁকে। কিশোর নিজের নাম বলল।

'ও, কিশোর,' খুশি হলেন ক্যাপ্টেন, 'কেমন আছ?'

'ভাল, স্যার।'

'তা কি খবর? নতুন কোন রহস্য পেলে?'

'সেজন্যেই তো ফোন করলাম, স্যার। বড় জটিল রহস্য, মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি হয়তো শুনেছেন, অনেক দামী একটা বেড়াল চুরি হয়েছে।'

মনে করার চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। ওরকম একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট। কেসটার দায়িত্ব নিয়েছে সে।'

'কিন্তু আপনি তো জানেন, স্যার, আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল না। বরং যাকে চোর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সে-ই আমাদের বন্ধু। একটা জটিলতার মধ্যে পড়ে গেছি, দিশে পাচ্ছি না। আপনাকে ফোন করলাম পরামর্শের জন্যে।'

'ঠিক আছে, এক কাজ কোরো, কাল নদীর ধারে চলে এসো। আলাপও করব আমরা, একটা পিকনিকও করে ফেলব। অবশ্য চায়ের পিকনিক, বেশি কিছু না, কি বলো?'

'ওহ্, স্যার, দারুণ হবে!' টেলিফোনেই চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'এক্ষুণি গিয়ে খবর দেব সবাইকে!'

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'তাহলে কাল বিকেল, চারটেয়। রাখি?'

'থ্যাংক ইউ, স্যার। গুড-বাই।'

রিসিভারটা রেখেই দৌড় দিল কিশোর। খবরটা জানানোর জন্যে আর তর সইছে না। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো মুসাদের বাড়িতে। ছাউনিতেই পাওয়া গেল সবাইকে।

'টেলিফোন করেছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'কথা হয়েছে। কাল বিকেলে নদীর ধারে দেখা করব, চা খাওয়ার পিকনিক হবে। ওখানেই সব কথা তাঁকে খুলে বলব আমরা।'

ক্যাপ্টেন সত্যি আসছেন! চেঁচামেচি শুরু করল সবাই। এ ভাবে কপাল খুলে

যাবে, বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন।

'ভাল করে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে,' মুসা বলল। 'নিজেই যেচে দাওয়াত নিয়েছেন। কি খাওয়ানো যায় বলো তো?'

'খালাকে বলি, খালাই ব্যবস্থা করবে,' ফারিহা বলল।

মুসার আম্মাকে জানানো হলো যে ক্যাপ্টেন রবার্টসন আসছেন, চা খেতে চেয়েছেন। খুশি হয়েই পরদিন নাস্তার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। সুন্দর করে প্যাকেটও করে দিলেন।

খুশিমনে খাবার নিয়ে নদীর ধারে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

পথ আটকাল ফগ। সাইকেল থেকে নেমে বলল, 'কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।'

'আহ্, ঝামেলা!' ফগের অনুকরণে বলল মুসা। 'এখন আমাদের সময় নেই। পিকনিকে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন। খুব মজা হবে।'

খাবারের প্যাকেটের বহর দেখে অবাক হলো ফগ। 'এত খাবার নিয়ে যাচ্ছ? সব তোমরা খাবে?' সন্দেহ ফুটেছে তার নীল চোখে।

ফগ কি ভাবছে আন্দাজ করে ফেলল কিশোর। লোকটা ভাবছে, এত খাবার যখন, নিশ্চয় পিটারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। হাসল সে। 'না, আমরা সবাই মিলেও খেয়ে শেষ করতে পারব না। আরেকজন আছে। তবে তার নাম আমরা বলব না। গোপন কথা গোপন রাখতে পছন্দ করি আমরা।'

'হুঁম, ঝামেলা!' নীল চোখে সন্দেহ ঘন হলো আরও। 'কোথায় যাচ্ছ পিকনিক করতে?'

'কেন, বলা হলো না, নদীর ধারে।'

ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ফগ। তারপর সাইকেলে চেপে চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর। 'ঝামেলা ভেবেছে পিটারের জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছি। কল্পনাই করতে পারেনি কে আসছেন। আমাদের পিছু নিয়ে নদীর ধারে যাক খালি একবার, পিলে এমন চমকানো চমকাবে বদনা নিয়ে দিনে দশবার বাথরুমে ছুটতে হবে তাকে।'

হা-হা করে হাসতে লাগল সবাই।

আগের বার যেখানে মাছ ধরতে দেখেছিল ওরা, এবারও সেখানেই বসেছেন ক্যাপ্টেন। কিশোর বয়েসী বন্ধুদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আন্তরিক ভাবে হাত মেলালেন সবার সঙ্গে। খাবারের প্যাকেটগুলো দেখে সামান্য কুঁচকে গেল ভুরু। বললেন, 'এত!'

'হ্যাঁ, মা দিয়ে দিল,' মুসা বলল।

'তাহলে আর দেরি কেন? খুলে ফেলো, দেখি কি দিয়েছেন মা। প্যাকেট দেখেই পানি এসে যাচ্ছে জিভে। বসব কোথায়? আহ্, একটা ভাল জায়গা বাছো না, জলদি!'

পনেরো

পানির ধারেই বসার মত সুন্দর একটা জায়গা খুঁজে বের করা হলো। পেছনে নদীর খাড়া পাড়, গাছপালায় ছাওয়া। ওপর থেকে কেউ দেখতে পাবে না তাদের। আরাম করে বসে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।

অনেক খেলেন ক্যাপ্টেন। মুসার সঙ্গে পাল্লা দিলেন, কে জিতল বলা মুশকিল। বড় বড় ঢেকুর তুলে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বললেন তিনি, 'হ্যাঁ, এইবার কথা শুরু করা যাক। ফগের পাঠানো রিপোর্টটা আসার আগে ভাল করে পড়েছি। জানি কি কি ঘটেছে। তবু তোমাদের মুখ থেকে আরেকবার শুনতে চাই। পিটারের কথা বলো। ও তোমাদের বন্ধু, না?'

বলতে শুরু করল গোয়েন্দারা। সব কথা খুলে বলল। কিছুই গোপন করল না, কেবল বেড়ালের খাঁচায় ফালতু সূত্রগুলো রেখে আসার কথাটা বাদে। ওটা বলতে লজ্জা লাগল ওদের।

সার্কাসে কি ভাবে পিটারের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বলল। জানাল, রাতের বেলা কি ভাবে পালিয়ে এসেছে পিটার।

'তারপর থেকে আমাদের ছাউনিতেই আছে সে,' মুসা বলল। 'এতদিন অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু এখন মনে হয় মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট সন্দেহ করে বসেছে, কোনভাবে টের পেয়ে গেছে সে। বিপদে ফেলে দিতে পারে আমাদের।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন, 'সময়মতই জানিয়েছ আমাকে। তবে পিটারকে ওভাবে লুকিয়ে রাখাটা উচিত হয়নি। কেউ পালিয়ে গেলে তার ওপর সন্দেহ বাড়ে। যাই হোক, যা করে ফেলেছ, ফেলেছ, সে অপরাধী না হলে কোন অসুবিধে হবে না। তোমরা ভাবছ বেড়ালটা সে চুরি করেনি?'

'না,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'পিটার খুব ভাল ছেলে। ও এ রকম কাজ করতেই পারে না।'

'বেশ। তাহলে তাকে আবার গিয়ে কাজে যোগ দিতে বলো। কোথায় গিয়েছিল সে, কারা লুকিয়েছিল, এ সব কথা কাউকে জানানোর দরকার নেই। লেডি অরগানন বড় জোর কয়েক দিনের বেতন কাটতে পারেন। আর যদি তা-ও মাপ করে দেন, সেটা তাঁর ব্যাপার।'

'কিন্তু থাকবে কোথায়?' ফারিহা বলল, 'একমাত্র জায়গা তো তার সৎবাপের বাড়ি। কিন্তু যা একখান বাপ, একেবারে জল্লাদ! মেরে দাগ ফেলে দেয়!'

'আর ফেলবে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করব। রহস্যটা নিয়েও ভাল করে ভাবব। দেখি, সমাধান বের করতে পারি কিনা। ইনটারেসটিং কেস মনে হচ্ছে...'

হঠাৎ কিশোর বলে উঠল, 'এই টিটু, এমন করছিস কেন?'

ওদের কাছ থেকে সরে গিয়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে পাড়ের

দিকে ছুটে যাচ্ছে কুকুরটা।

ওপর থেকে শোনা গেল কিশোরের প্রশ্নের জবাব, 'আহ্,' ঝামেলা! এই তোমাদের কুত্তা সরাও! নইলে ভাল হবে না বলে দিলাম! ওকেও হাজতে পাঠাব আমি!'

'এসে গেছে ঝামেলা!' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'তার মানে সত্যিই আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। টিটুর কাছে গিয়ে পাড়ের ওপরের ঘন ঝোপ দু-হাতে টেনে ফাঁক করতেই দেখতে পেল ফগের ভীষণ রেগে যাওয়া চেহারা।

'জানতাম!' তাকে দেখেই মাথা দোলাতে লাগল ফগ। 'সঙ্গে কে আছে, তা-ও জানি।'

'কে, বলুন তো?'

'কে আবার! শয়তানটা!'

'আহা, আরেকটু ভদ্রভাবে বলুন। তিনি শুনলে রাগ করতে পারেন।'

'ভদ্রভাবে বলব? একটা চোরকে নিয়ে বসে আছ, হাতেনাতে ধরেছি, এইবার গোষ্ঠীসুদ্ধ পাঠাব হাজতে। বলেছিলাম না বিপদে পড়বে। কুত্তা সরাও, নামি। জলদি করো, নইলে শাস্তি আরও বেড়ে যাবে।'

ফগের পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসল কিশোর। টিটুর কলার ধরে টেনে সরাল। নিচে নামার জায়গা করে দিল ফগকে।

ঝোপ আরও ফাঁক করে পথ করে নিয়ে লাফিয়ে পাড়ের নিচে নামল ফগ। আশা করেছিল, একদল ভীত-চকিত ছেলেমেয়েকে দেখবে। কিন্তু তার বদলে যাঁকে দেখল, পিলে চমকে গেল তার। বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। তার বস্ স্বয়ং ক্যাপ্টেন রবার্টসন বসে আছেন।

'গুড আফটারনুন, ফগর‍্যাম্পারকট,' শান্তকণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন।

ফোলা ভুঁড়ির ওপরে বেল্টটা অহেতুক টানল ফগ। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। স্যালুট করে বলল, 'গু-গু-গু-গু!' ঢোক গিলল সে। কথা বের করতে পারছে না। অনেক চেষ্টায় বলল, 'গু-গু-ড আফটারনুন, ক্যা-ক্যা-ক্যাপ্টেন! আপনি এখানে থাকবেন ভাবিনি! ঝামেলা!'

'কি ভেবেছিলে? চোর ধরবে?'

খানিক আগে যে 'শয়তান, চোর' বলে গালাগাল করেছিল, সে কথা ভেবে কুঁকড়ে গেল ফগ। আরও জোরে ঢোক গিলল। মোটা ঘাড়ের ঘাম মুছল। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল, অস্বস্তি মেশানো হাসি। 'আমি আরেকজনকে আশা করেছিলাম, স্যার আপনি বসে আছেন কল্পনাই করতে পারিনি!'

'এই ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ডেকে এনেছে আজ। হারানো বেড়ালটার ব্যাপারে কথা বলতে। বসো। ওরা ওদের কথা বলেছে, তোমার মুখ থেকেও শুনি। আমার ধারণা, খুব একটা এগোতে পারোনি কেসটায়?'

'ইয়ে, স্যার,' নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ফগ. 'অনেকগুলো সূত্র পেয়েছি।' বসকে খুশি করার জন্যে বলল, 'আপনি আসায় ভালই হয়েছে, সেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারব। আপনার পরামর্শ

এখন খুব দরকার।'

পকেট থেকে সাদা একটা খাম বের করে তার ভেতর থেকে সূত্রগুলো বের করতে লাগল সে। তিনটে পোড়া সিগারেটের টুকরো, একটুকরো লাল ফিতে, চিউয়িংগামের মোড়ক, জুতোর ফিতে⋯

ওগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'এ সব কি?'

'সূত্র। চুরিটা যেখানে হয়েছে সেখানে পেয়েছি, স্যার, বেড়ালের খাঁচার মধ্যে।'

আরও অবাক হলেন ক্যাপ্টেন। 'এই জিনিস তুমি বেড়ালের খাঁচায় পেয়েছ! চিউয়িংগামের মোড়কটাও?'

'হ্যাঁ, স্যার, সব। কেবল সিগারেটের তিনটে টুকরোর মধ্যে দুটো পেয়েছি খাঁচার বাইরে।' বসকে অবাক হতে দেখে খুশি হলো ফগ 'একসঙ্গে এক জায়গায় এত সূত্র জীবনে কোথাও পাইনি।'

'আমিও না।' এক এক করে ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন।

ঘাবড়ে গেল ওরা। জিনিসগুলো যে ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে বসবে ফগ, ভাবতে পারেনি।

হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের চোখে। 'ফগ, একসঙ্গে এত সূত্র পাওয়ার জন্যে স্বাগত জানানো উচিত তোমাকে।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কিছু পাওনি?'

অহেতুক একবার কাশি দিল কিশোর। দ্বিধা করল, তারপর পকেট থেকে বের করল আরেকটা খাম। মুখ খুলে ভেতরের জিনিসগুলো ঢেলে দিল ক্যাপ্টেনের সামনে। হেসে ফেলতে যাচ্ছিল ফারিহা, কিন্তু হাসাটা ঠিক হবে না ভেবেই বোধহয় চেপে গেল।

কিশোর বলল, 'এগুলো পেয়েছি, স্যার।'

হাঁ হয়ে গেল ফগ। বিড়বিড় করল, 'তাজ্জব ব্যাপার! ঝামেলা!'

'হ্যাঁ, গাধাদের জন্যে তাজ্জব ব্যাপারই,' কঠিন কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার, ফগর‍্যাম্পারকট। যাই হোক, এই ছেলেমেয়েগুলো পুলিশকে সাহায্য করতে চায়, আমার তো সে-রকমই ধারণা, তুমি নাকি অন্য কথা বলো?'

'না না, স্যার! কে বলে, স্যার!' মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেল ফগ, কিন্তু মুখে দেখা গেল শুধু ভয়। তার এত সাধের সূত্রগুলোর কাটা অংশ কিশোরের খামে দেখে এতক্ষণে ঠাহর করতে পারল সব কিছু।

'ফগর‍্যাম্পারকট,' কণ্ঠস্বর আরও কঠিন করে তুললেন ক্যাপ্টেন, 'এখন গিয়ে পিটার ছেলেটাকে বলব আমরা, বেরিয়ে এসে তার কাজে যোগদান করতে। শুধু শুধু তাকে ভোগানো ঠিক হচ্ছে না।'

কথা শুনে ঝুলে পড়ল ফগের নিচের চোয়াল। এক বিকেলে কত আর চমক সইতে হবে! চমক তো নয়, মুগুর দিয়ে যেন একের পর এক বাড়ি মারা হচ্ছে তার মাথায়। বুঝতে পারছে না, পিটার কোথায় লুকিয়েছে—এ কথা ক্যাপ্টেন জানলেন কি করে। জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একবার 'হতচ্ছাড়া' ছেলেমেয়েগুলোর দিকে। পিটারকে ধরতে পারলে ভয় দেখিয়ে তার প্রাণ উড়িয়ে দেয়ার যে পরিকল্পনাটা

করেছিল, সেটা একেবারেই মাঠে মারা গেল দেখে আরও রেগে গেল। কিন্তু কোন উপায় নেই। ক্যাপ্টেন যাচ্ছেন সঙ্গে।

উঠে দাঁড়িয়ে কোনমতে বলল, 'চলুন, ক্যাপ্টেন। আসুন।'

ষোলো

ইচ্ছে করে ফগের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে লাগল কিশোর। আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। কেন এ সব করছে, ঠিকই বুঝতে পারল ফগ। মনে মনে পিত্তি জ্বলে গেলেও বসের সামনে সামান্য একটা ধমকও দিতে পারল না সে কিশোরকে। সব চুপচাপ হজম করতে হলো।

নিজেদের বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল মুসা, 'এখানেই আছে। গিয়ে পিটারকে বলব আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'চলো, আমিই যাচ্ছি। কি অবস্থায় আছে সে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

ক্যাপ্টেনকে ছাউনিতে নিয়ে এল মুসা।

কিন্তু ভেতরে নেই পিটার।

গেল কোথায়! এদিক ওদিক তাকাল মুসা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ওই দেখুন, স্যার, বাগানে কাজ করছে। কারও কাছ থেকে সাহায্য নিতেও তার আপত্তি। যেহেতু আমরা খেতে দিচ্ছি, কাজ করে শোধ করে দিতে চায়। এমন মানুষ চুরি করবে বিশ্বাস হয় আপনার?'

'ভাল ছেলে,' আনমনে বিড়বিড় করলেন ক্যাপ্টেন। 'ওকে ডাকো। একলা ওর সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'পিটার, এই পিটার!' গলা চড়িয়ে ডাকল মুসা। 'এদিকে এসো। আমাদের আরেকজন বন্ধু এসেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

ঘুরে তাকাল পিটার। পুলিশের পোশাক পরা বিশালদেহী মানুষটাকে দেখে রক্ত সরে গেল মুখ থেকে। পাথরের মত স্থির হয়ে গেল।

আস্তে উঠে দাঁড়াল পিটার। এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। তার অবস্থা দেখে মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। কাছে এসে কাঁপা গলায় বলল, 'আ-আমি বেড়ালটা চুরি করিনি!'

'চলো, ছাউনিতে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'যা যা জানো, খুলে বলবে আমাকে।'

হাত ধরে তাকে ছাউনিতে টেনে নিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

বাইরে অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল গোয়েন্দারা। ভেতরে এতক্ষণ কি করছেন ক্যাপ্টেন?

অনেকক্ষণ পর অবশেষে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পেছনে পিটার। মুখে হাসি ফুটেছে তার। দৌড়ে গেল ফারিহা। উদ্বিগ্ন হয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কোন ভয় নেই তো? পিটার বেরোতে পারবে?'

'পারবে,' হেসে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন 'ও আমাকে সব কথা বলেছে।

চাকরিতে যেতেও আর কোন দ্বিধা নেই ওর।'

'কিন্তু তার সৎবাপের সঙ্গে কথা বলা বাকি রয়ে গেল এখনও।'

'সেটারও ব্যবস্থা হবে। আমিই যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে,' ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এখন তাঁকে। 'ফগর্‌র‍্যাম্পারকট, আমার হয়ে কাজটা তোমাকেই করতে হবে। পিটারের বাবার সঙ্গে দেখা করে বলবে আর যেন দুর্ব্যবহার না করে তার সাথে। হারপিগের সাথে দেখা করে বলবে, লেডি অরগাননের অনুমতি নিয়ে ছেলেটাকে আবার কাজে বহাল করতে।'

সেদিন বিকেলে আরও একবার হাঁ হয়ে যেতে হলো ফগকে। ছেলেটার সৎবাবা আর হারপিগ দু-জনকেই বলেছিল তার সঙ্গে আরও খারাপ ব্যবহার করতে, এখন কি করে গিয়ে উল্টো কথা বলবে!

ইচ্ছে করেই তাকে পাঠাচ্ছেন ক্যাপ্টেন, বুঝতে পারল কিশোর। অহেতুক একটা নিরীহ ছেলের সঙ্গে খারাপ আচরণের শাস্তি।

'কি ব্যাপার, চুপ করে আছ কেন?' ধমক দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বুঝেছ আমার কথা?'

'হ্যাঁ, স্যার, বুঝেছি, স্যার!' তাড়াতাড়ি বলল ফগ। 'এখুনি যাচ্ছি ওর সৎবাপের কাছে। ওখান থেকে এসে হারপিগের সাথেও দেখা করব।'

'আবার যদি ছেলেটার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করা হয়, আমি তোমাকে ধরব ফগর্‌র‍্যাম্পারকট। সুতরাং সাবধান। যা বলেছি সেই মত কাজ করবে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, স্যার, বুঝেছি! চুরি যাওয়া বেড়ালটার ব্যাপারে কি করব, স্যার? কেসটা ক্লোজ করে দেব?'

'ক্লোজ করবে কেন? তবে অহেতুক আর কাউকে হয়রান কোরো না।' গোয়েন্দাদের দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। হাত মেলালেন সবার সঙ্গে। তারপর তাঁর কালো গাড়িটাতে করে চলে গেলেন।

কড়া চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল ফগ। 'আমি হারপিগের কাছে যাচ্ছি। মনে কোরো না কেসটা শেষ, সব কিছু ভুলে গেছি আমি। চোরটাকে ধরবই।' বাঁকা চোখে পিটারের দিকে এমন করে তাকাল সে, এখনও ছেলেটার ওপর থেকে সন্দেহ যায়নি তার।

আর কিছু না বলে হারপিগের সঙ্গে কথা বলার জন্যে চলে গেল ফগ।

পিটারকে ঘিরে ধরল ছেলেমেয়েরা, একসঙ্গে প্রশ্ন শুরু করল: আমাদের ক্যাপ্টেনকে কেমন লাগল? তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছে? সব বলো আমাদের।

'খুব ভাল লোক,' জবাব দিল পিটার। 'ফগের মত মোটেও না। কত ভদ্র, কত নরম ব্যবহার। কিন্তু কি করে আবার কাজে যাব, সৎবাবার কাছে ফিরে যাব, বুঝতে পারছি না। কোনটাই সহজ মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

রবিন বলল, 'অস্বস্তি লাগছে তো?'

'সব ঠিক হয়ে যেত,' মুসা বলল, 'যদি বেড়াল-চোরটাকে পাওয়া যেত।'

হঠাৎ একটা ঝোপে কি যেন নড়ল। ঘেউ ঘেউ করে সেদিকে ছুটে গেল টিটু। কয়েক সেকেন্ড প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি চলল ঝোপের ভেতর, তারপর লাফ দিয়ে গাছে

উঠে পড়ল একটা কি যেন। দেখতে গেল সবাই।

দেখে তো হাঁ গাছের ডাল থেকে ওদের দিকে নিরীহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা সিয়ামিজ ক্যাট

চিৎকার করে উঠল পিটার, 'আরি, টিকসি! লেজের মাখন রঙা লোম দেখেছ!'

সবাই তাকাল বেড়ালটার লেজের ডগার দিকে। এদিক ওদিক লেজ নাড়ছে ওটা, আর নিচে থেকে তাকে ধরার জন্যে লাফালাফি করছে টিটু।

'এই, টিটুকে সরাও!' সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে পড়েছে পিটার। 'ভয় দেখিয়ে আবার তাড়াবে বেড়ালটাকে!'

জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ছাউনিতে ভরে রাখা হলো কুকুরটাকে। খুব মন খারাপ হয়ে গেল তার। বেরোতে না পেরে কুঁই কুঁই করে প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

গাছের নিচে এগিয়ে গেল ফারিহা। মৃদু স্বরে ডাকতে লাগল বেড়ালটাকে।

লক্ষ্মী মেয়ের মত নেমে এল ওটা। দু-হাতে তুলে নিল ফারিহা। বলল, 'দেখেছ, রোগা হয়ে গেছে। সারা গায়ে কি কাদারে বাবা! ধুতে জান বেরোবে আইলিনের।'

সতেরো

বেড়ালটাকে পাওয়া গেছে, আর কি ওখানে দাঁড়ায় ওরা। তাড়াহুড়ো করে ওকে নিয়ে রওনা হলো পাশের বাড়িতে। সামনে পড়লেন লেডি অরগানন। ফারিহার হাতে বেড়াল দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'বেড়াল নিয়ে যাচ্ছ কোথায়! আইলিন দিয়েছে নাকি?'

'না, ম্যাডাম,' মোলায়েম স্বরে জবাব দিল কিশোর, 'এটা আপনার টিকসি। মুসাদের বাগানে ঝোপের মধ্যে পেলাম এইমাত্র।'

'বলো কি!' অবাক হয়ে বেড়ালটার লেজের লোমগুলোর দিকে তাকালেন লেডি অরগানন। 'হ্যাঁ, টিকসিই তো! ছিল কোথায় এতদিন! শুকিয়ে তো একেবারে আধখানা হয়ে গেছে!'

'বেড়ালরা কথা বলতে পারলে সুবিধে হত,' টিকসিকে আদর করতে করতে বলল ফারিহা। 'তাহলে বলতে পারত সব। ম্যাডাম, পিটারকেও নিয়ে এসেছি আমরা। পুলিশের ভয়ে আমাদের ছাউনিতে লুকিয়ে ছিল, আমরাই রেখেছিলাম। আপনি কি আবার চাকরিতে নেবেন ওকে?'

'নিশ্চয়। ক্যাপ্টেন রবার্টসন ফোন করেছিলেন আমাকে। পিটার, এখন তোমাকে নিতে আর কোন আপত্তি নেই আমার, চোর যে নও সেটা তো বোঝাই গেল।'

'টিকসিকে আইলিনের কাছে নিয়ে যাব? দেখলে খুশি হবে।'

'এসো আমার সঙ্গে।...ওই যে মিস টোমার আসছে।...মিস টোমার, দেখে যাও। টিকসিকে নিয়ে এসেছে।'

দেখেই চলার গতি বাড়িয়ে দিল মিস টোমার। ঝাঁকুনি লেগে সঙ্গে সঙ্গে চশমাটা পড়ে গেল। ওটা তুলে আবার পরে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেল? কে আনল?'

তাকে সব কথা খুলে বলল ছেলেমেয়েরা। তারপর এল বেড়ালের খাঁচার কাছে। সেখানেই পাওয়া গেল আইলিনকে। বেড়ালটাকে দেখে সে-ও অবাক। দু-হাত বাড়িয়ে ফারিহার কাছ থেকে নিয়ে নিল টিকসিকে। ওটাও গিয়ে তার বাহুতে মাথা ডলতে ডলতে মৃদু গরগর করতে লাগল।

'পেলে কোথায় ওকে?' জানতে চাইল আইলিন।

জানানো হলো তাকেও।

শুনে বলল সে, 'আমার মনে হয়, যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে পালিয়েছে টিকসি। বহুদূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে, দেখছ না গায়ের দশা। বন, মাঠ, এ সব পেরিয়ে আসতে হয়েছে।'

এই সময় দেখা গেল, ফগের সঙ্গে এদিকেই আসছে হারপিগ। মালীর চেহারা থমথমে, নিশ্চয় ক্যাপ্টেনের নির্দেশ জানানো হয়েছে তাকে। পিটারের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন সে একটা কেঁচো। তারপর চোখ পড়ল টিকসির ওপর। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল যেন সে। হাঁ হয়ে গেল মুহূর্তে।

সারা বিকেল থেকে বহুবার হাঁ হতে হয়েছে ফগকে, আরও একবার হলো। লাফ দিয়ে হাতে বেরিয়ে এল কালো নোটবুক। 'রিপোর্ট দিতে হবে ক্যাপ্টেনের কাছে। লেডি অরগানন, বেড়ালটা কখন ফিরল?'

আরও একবার বেড়ালটা ফিরে পাওয়ার গল্প করতে হলো ছেলেমেয়েদের।

দ্রুত নোটবুকে লিখে নিল ফগ।

টিকসিকে দেখে একমাত্র হারপিগই যেন খুশি হতে পারল না, কালো করে রাখল মুখটা। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, কেন ফিরে এল বেড়ালটা সে-জন্যে তাকে চড়িয়ে সিধে করতে ইচ্ছে করছে।

যাওয়ার জন্যে ঘুরছিল সে, লেডি অরগানন ডাকলেন, 'হারপিগ, শোনো, ক্যাপ্টেন রবার্টসন আমাকে ফোন করেছিলেন। পিটারকে আবার কাজে নিতে অনুরোধ করেছেন আমাকে। কাল থেকেই ও কাজ শুরু করুক। তার সঙ্গে যেন আর কোন দুর্ব্যবহার করা না হয়।'

চলে গেলেন লেডি অরগানন। পেছনে গেলেন মিস টোমার।

'ঝামেলা গেল,' ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল ফগ, 'এবার তোমরাও যেতে পারো।'

বাগানটা আপনার নয়, যাব কি যাব না সেটা আমাদের ইচ্ছে— বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের, কিন্তু এখন আর লাগালাগির মধ্যে যেতে মন চাইল না।

ফিরে চলল গোয়েন্দারা।

'কেসটার সমাধান কিন্তু এখনও হয়নি,' রবিন বলল। 'আমরা জানি না টিকসিকে কে চুরি করেছিল। খাঁচা থেকে আপনাআপনি বেরিয়েছিল কিনা তা-ও জানা হলো না। হতে পারে, দরজাটা আলগা ছিল, ঠেলে ফাঁক করে বেরিয়ে গিয়েছিল সে।'

'সেটা সম্ভব নয়,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর। 'বেড়ালটা চলে আসায় আপাতত জানতেও পারছি না সেটা তারমানে রহস্যটার মীমাংসা হলো না।'

যার যার বাড়ি ফিরে গেল ছেলেমেয়েরা।

পিটার গেল তার সৎবাবার কাছে। তার সঙ্গে কোন খারাপ আচরণ করা হলো না।

পরদিন সকালে কাজে এল পিটার। হারপিগ যে আর তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না, বিশ্বাস করতে পারল না সে। স্বাভাবিক হতে পারল না, ভয়টা রয়েই গেল, যদিও মালী তাকে ধমক দিল না, কিছুই বলল না।

পিটার এসেছে কিনা, কি অবস্থায় আছে, দেখার জন্যে দেয়ালে চড়ল গোয়েন্দারা।

ফারিহা ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'পিটার, কেমন আছ?'

'ভাল। তোমরা আমাকে কৃতজ্ঞ করে ফেললে। তোমাদের জন্যেই আবার কাজে আসতে পারলাম।'

'ও কিছু না,' রবিন বলল। 'তোমাকে সাহায্য করতে পেরে আমরা খুশি।'

ফারিহাকে বলল পিটার, 'কাজটা শেষ হোক, তোমাকে খুব সুন্দর কয়েকটা বাঁশি বানিয়ে দেব।'

খুশি হলো ফারিহা।

বেশিক্ষণ কথা বললে কাজের অসুবিধে হবে, তাই দেয়াল থেকে নেমে পড়ল গোয়েন্দারা।

তারপর থেকে ভালই কাটতে লাগল দিন। আর কোন গোলমাল নেই।

'দূর!' বিরক্ত হয়ে বলল একদিন কিশোর, 'জমল না এবারের রহস্যটা। কেমন যেন আধখাপচা হয়ে শেষ হলো। বলা নেই কওয়া নেই, উধাও হয়ে গেল একটা বেড়াল, আপনাআপনিই ফিরে এল আবার। কি করে বেরিয়েছিল সে, তার নিশ্চয় সহজ কোন ব্যাখ্যা আছে, আমরা বুঝতে পারছি না।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রবিন, 'রহস্যের কিনারা না হলে ভাল লাগে না। এই ছুটিতে বোধহয় আর কোন রহস্য পাবও না আমরা।'

'এমনই হয়,' মুসা বলল, 'তুমি যেটা চাইবে, সেটা হবে না কখনও, হবে আরেকটা!'

কিন্তু অনুমান ভুল হলো মুসার। রহস্য এসে হাজির হলো আবার। আবার উধাও হয়ে গেল টিকসি।

আঠারো

খবরটা গোয়েন্দাদেরকে জানাল পিটার। সেদিন বিকেলে সাড়ে-পাঁচটায় দেয়াল **টপকে মুসাদের** বাড়ির সীমানায় ঢুকল সে। ফ্যাকাসে চেহারা, চোখে ভয়। গোয়েন্দারা ভাবল, হারপিগ বুঝি তাকে মেরেছে।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'টিকসি আবার হারিয়ে গেছে! এবারও আমার নাকের ডগা দিয়ে উধাও!'

'বলো কি!' অবাক হয়ে গেল কিশোর। 'বসো বসো। খুলে বলো সব আশ্চর্য!'

ঘাসের ওপর ধপ করে বসে পড়ল পিটার। 'কি আর বলব, সবই আমার কপাল! বিকেল বেলা বেড়ালের খাঁচার সামনে রাস্তার পাশের ঘাস সাফ করছি, এই সময় চুরি গেল টিকসি। অথচ ত্রিসীমানায় দেখতে পাইনি কাউকে।'

'চুরি হলো যে জানলে কি করে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'মিসেস আইলিনের ছুটি ছিল আজ। দশটায় বেরিয়েছে, এসেছে দশ মিনিট আগে। খাঁচার কাছে গিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল টিকসি নেই টিকসি নেই বলে।'

'আশ্চর্য!' আবার বলল কিশোর।

'সবগুলো বেড়ালই আছে,' পিটার বলল, 'কেবল টিকসি বাদে।'

'তুমি যখন কাজ করছিলে তখন চুরি হয়েছে বুঝলে কি করে? আগেও তো হয়ে থাকতে পারে?'

'না, হয়নি। ইদানীং রোজই একবার করে বেড়ালগুলোকে দেখতে আসেন লেডি অরগানন, তিনটের একটু আগে। সঙ্গে আসে আইলিন। আজও এসেছিলেন। আইলিন না থাকায় আজ সঙ্গে ছিল হারপিগ। তখনও ছিল বেড়ালটা। কাছাকাছিই ছিলাম আমি। হারপিগকে বলতে শুনেছি, লেডি অরগানন, ওই যে টিকসি।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, তখন থেকেই থেকেছ তুমি খাঁচার কাছাকাছি, আইলিন না আসা পর্যন্ত? মুহূর্তের জন্যেও সরোনি?'

'না। আবার আমাকে দোষ দেয়া হবে, আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস করো, টিকসিকে ছুঁইওনি আমি!'

'টিকসি যে হারিয়েছে, আইলিন এসেই জানল কি করে?'

'আইলিনের যেদিন ছুটি থাকে, সেদিন বেড়ালগুলোকে দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে হারপিগের ওপর। আইলিনকে বলল, একটা বেড়াল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তারপর আমার চোখের সামনে দিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকল সে, অসুস্থ বেড়ালটাকে বের করে আনল। আইলিন ছিল খাঁচার কাছ থেকে সামান্য দূরে। এগিয়ে গিয়ে ভাল করে খাঁচার ভেতর তাকিয়ে টিকসিকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।'

'হারপিগ কোনভাবে খাঁচার দরজা দিয়ে বেড়ালটাকে বের করে দেয়নি তো?'

'না। খাঁচার ভেতরে কি করছিল হারপিগ, আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে দেখা যায় না, তবে দরজাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। বেড়ালটা বেরোলে দেখতে পেতাম। তা ছাড়া ভেতরে ঢুকেই শক্ত করে আবার দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছিল সে।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। পিটারের চোখের সামনে দিয়ে এ ভাবে আবার বেড়ালটা উধাও হয়ে যাওয়াতে খুবই বিস্মিত হয়েছে ওরা

কয়েকবার ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'খাঁচার কাছে আগাছা সাফ করার নির্দেশ দিয়েছিল তোমাকে কেউ? না নিজে নিজেই করেছ?'

'না,' মাথা নেড়ে জবাব দিল পিটার, 'নিজে নিজে কিছু করার হুকুম নেই আমার ওপর। প্রতিদিন সকালে কি কি কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দেয় আমাকে হারপিগ। বিকেল বেলা রাস্তার পাশের আগাছা পরিষ্কার করতে বলেছিল সে আজ।'

'আগের বারেও টিকসি যখন হারাল, খাঁচার কাছে কাজ করেছ তুমি,' মুসা বলল। 'এবারেও। সেবারেও আইলিন উপস্থিত ছিল না, এবারেও না গতবারেও খাঁচার ভেতরে গিয়েছিল হারপিগ, এবারেও। গতবারে সঙ্গে ছিল ফগ, এবারে আইলিন। অনেক কিছু একই রকম ঘটল। কেমন অদ্ভুত না?'

'হ্যাঁ। আগের বারেও আমি চুরি করিনি বেড়ালটা, এবারেও না। কিন্তু দোষটা চাপে আমার ঘাড়েই।'

'মজার রহস্য,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল কিশোর 'আমি দেখতে যাচ্ছি। আগের বার খাঁচার মধ্যে পিটারের বাঁশি পাওয়া গিয়েছিল, এবার দেখি কি আছে? আমি শিওর, আবারও তার একটা জিনিস পড়ে থাকবে ভেতরে।'

'আগের বার ভুল করেও বাঁশিটা পড়ে থাকতে পারে,' মুসা বলল।

'আমার তা মনে হয় না। এবারেও যদি পিটারের কোন জিনিস পড়ে থাকতে দেখি, তাহলে শিওর হয়ে যাব ব্যাপারটা ভুল করে ঘটেনি। ইচ্ছে করে ফেলা হয়েছে।'

সবাই যেতে চাইল তার সঙ্গে। সুতরাং টিটুকে একটা গাছের গোড়ায় বেঁধে রেখে দেয়াল টপকাল সবাই।

বেড়ালের ঘরের কাছে চলে এল ওরা। কেউ নেই। আইলিন আর হারপিগ নিশ্চয় লেডি অরগাননকে খবরটা জানাতে চলে গেছে। নীল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে খাঁচার বেড়ালগুলো। গুণে দেখল ফারিহা, সাতটা।

'ওই দেখো!' হাত তুলল কিশোর, 'পিটারের আরেকটা বাঁশি!'

বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল পিটার। হঠাৎ কি মনে হতে গাছে ঝোলানো তার কোটটার কাছে ছুটে গেল। পকেটে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'চুরি করেছে কেউ! ফারিহার জন্যে বানিয়ে পকেটে রেখেছিলাম! নিয়ে গিয়ে ওখানে ফেলেছে!'

'আবার তোমার ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তাকিয়ে আছে খাঁচার মেঝেতে পড়ে থাকা বাঁশিটার দিকে।

'বের করবে না? আগের বারের মত করে?' ফারিহা জানতে চাইল।

'সময় নেই। আর কোন সূত্র মেলে কিনা দেখো, কুইক!'

খুঁজতে শুরু করল ওরা।

খাঁচার জালে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকল ফারিহা। 'আবার সেই গন্ধ!'

কিশোরও নাক ঠেকিয়ে শুঁকল। 'হ্যাঁ, তারপিনের গন্ধ। অবাক কাণ্ড! সব একেবারে ঠিকঠাক একই রকম ঘটল!'

'এই কিশোর, দেখে যাও,' হাত নেড়ে ডাকল রবিন। 'দেখো তো এটা সূত্র কিনা?'

ছোট একটা পাথর কুড়িয়ে নিল কিশোর। তাতে একফোঁটা রঙ লেগে আছে। দেখতে দেখতে বলল, 'পিটার তো বাঁশিতে রঙ করে। তার টিন থেকেই পড়েছে হয়তো। পিটার, এখানে বসে কখনও রঙ করেছ?'

'না, কক্ষণো না! বাগানের কোণে ছাউনিতে বসে করি। ওখানেই রঙ রাখি আমি। তা ছাড়া এই মরা, ফ্যাকাসে রঙ আমি ব্যবহার করি না। আমার পছন্দ উজ্জ্বল রঙ, লাল, সবুজ, নীল।'

'হুঁ!' কি ভেবে পাথরটা পকেটে রেখে দিল কিশোর।

এই সময় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। রাস্তা ধরে হেঁটে আসছেন লেডি অরগানন, মিস টোমার, হারপিগ আর আইলিন। আগে আগে আসছে হারপিগ, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বোঝানোর ভঙ্গি করছে। অন্য তিনজন বেশ অস্থির, বিশেষ করে মিস টোমার, বার বার তাঁর নাক থেকে চশমা খসে পড়ছে।

কাছে এসে খাঁচার ভেতরে তাকাল সবাই। টিকসি নেই।

হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠল আইলিন।

'কি হলো?' জানতে চাইলেন লেডি অরগানন।

'বাঁশি!'

ভুরু কুঁচকে ভাল করে তাকিয়ে হারপিগ বলল, 'ওটা তো পিটারের! তাকেই বানাতে দেখেছি! গেল কি করে ওর ভেতরে?'

চাবি দিয়ে দরজা খুলে খাঁচায় ঢুকল আইলিন। বাঁশিটা বের করে আনল।

'এটা তুমি বানিয়েছ?' পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন লেডি অরগানন।

মাথা ঝাঁকাল পিটার। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

কিশোর বলল, 'আমাদেরকে বাঁশি বানিয়ে দেয় ও। এটাও আমাদের জন্যেই বানিয়েছিল, বলেছে।'

'খাঁচার ভেতরে গেল কি করে?'

'এ তো সহজ ব্যাপার, ম্যাডাম, হারপিগ বলল। 'চুরি করতে ঢুকেছিল, কোনভাবে বাঁশিটা তার পকেট থেকে পড়ে গেছে। চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে, বেড়ালটাকে বের করে আবার লাগিয়ে দিয়েছে।'

'মিথ্যে কথা,' প্রতিবাদ করল পিটার, কিন্তু গলায় জোর নেই, 'চাবি কোথায় রাখা হয় এখন, সেটাই জানি না আমি!'

'সব সময় আমার পকেটেই থাকে,' আইলিন বলল, 'কেবল যেদিন আমার ছুটি থাকে সেদিন বাদে। সেদিন হারপিগের কাছে রেখে যাই। চাবিটা কোথায়, হারপিগ?'

'আমার জ্যাকেটের পকেটে রাখি। আজ বিকেলে ওটা খুলে গাছে ঝুলিয়ে রেখে কাজ করেছি। তখন সহজেই বের করে নেয়া সম্ভব ছিল। আমার বিশ্বাস, বেড়ালটা এখনও কাছেপিঠেই আছে কোথাও, এত তাড়াতাড়ি সরাতে পারেনি, খুঁজলে পাওয়া যাবে। আগেই বলেছিলাম আপনাকে, ম্যাডাম, এই ছেলেটাকে আর কাজে নেবেন না। চোর কখনও ভাল হয় না। মিস্টার ফগকে খবর দেব?'

'না,' লেডি অরগানন বললেন, 'ওই মাথামোটাকে দিয়ে কিছু হবে না ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে দরকার আমার। তাকে খবর দাও।'

ক্যাপ্টেনকে খবর দেয়ার কথা শুনে খুশি হলো ছেলেমেয়েরা। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না, জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। বাধ্য হয়েই তাই ফগকে ডাকতে হলো। ফগ এসেই গম্ভীর হয়ে ভারিক্কি চালে সূত্র খুঁজতে শুরু করল।

ভেবেছিল, এবারও একগাদা সূত্র পাবে খাঁচার মধ্যে। পেল না। বাঁশিটা তার হাতে তুলে দিলেন লেডি অরগানন।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ফগ, 'এবার কোন সূত্র পেয়েছ তোমরা?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ফস করে বলে বসল ফারিহা, 'পেয়েছি। খাঁচার মধ্যে একটা গন্ধ, আর একটা রঙ লেগে থাকা পাথর।'

রেগে গেল তিন গোয়েন্দা। চোখ পাকিয়ে তাকাল তার দিকে। মুসার কিলের ভয়ে দৌড়ে পালাল বেচারি ফারিহা।

'গন্ধ?' ভুরু কুঁচকে তাকাল ফগ। 'রঙ লেগে থাকা পাথর? আবার সেই চালাকি, না? আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা?'

হাঁপ ছাড়ল তিন গোয়েন্দা। যাক, ভালই হলো। একবার ধোঁকা খেয়ে এবার আর বিশ্বাস করেনি ফগ।

যদি আবার কোন প্রশ্ন করে বসে, এই ভয়ে আর ওখানে দাঁড়াল না ওরা। দ্রুত সরে এল দেয়ালের কাছে। দেয়াল টপকে এপারে এসে ঘাসের ওপর বসল।

মুসা বলল, 'ফারিহাটাকে ধরে নিই একবার! কয়টা তাল যে ফেলব পিঠের ওপর, বলতে পারি না! আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমাদের সূত্রগুলোকে শেষ করে! ভাগ্যিস ঝামেলা বিশ্বাস করেনি!'

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, 'বেড়াল উধাও হওয়ার এই ধাঁধাটা সত্যি জটিল!'

উনিশ

'অবাক লাগছে একটা কথা ভেবে,' কিশোর বলল, 'দুইবারই অবিকল একই রকম ঘটনা ঘটেছে!'

'এবার কিন্তু পিটার ছাড়া আর কারও ওপর সন্দেহ যায় না,' রবিন বলল। 'তিনটের সময় বেড়ালটা ছিল খাঁচায়, হারপিগ আর লেডি অরগানন দেখেছেন। তখন থেকে আইলিন না ফেরা পর্যন্ত খাঁচার কাছে ছিল পিটার। তার চোখ এড়িয়ে বেড়ালটা পালাতে পারার কথা নয়, কাউকে আসতেও দেখেনি সে, খাঁচার কাছে যাওয়া তো দূরের কথা।'

'কিন্তু টিকসি ঠিকই হারাল,' বলল মুসা। 'কি করে?'

কেউ জবাব দিতে পারল না।

অবশেষে কিশোর বলল, 'আজ আর আলোচনার সময় নেই। কাল ব্যাপারটা নিয়ে বসা যাবে। আজকে রাতে ভাবব আমরা, দেখি, কোন সমাধান বের করতে পারি কিনা।'

পরদিন সকালে ছাউনিতে মীটিঙে বসল ওরা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কারও কিছু বলার আছে? ভেবেছ?'

মুসা আর রবিনের কিছু বলার নেই। ফারিহার আছে, তবে শুনলে অন্যেরা যদি হেসে ফেলে এই ভয়ে উসখুস করতে লাগল শেষে বলেই ফেলল, 'আমার মনে হয়

জরুরী সূত্র একটা আছে আমাদের হাতে।'

'কী?' জানতে চাইল কিশোর।

'তারপিনের গন্ধ। এবারেও বেড়াল চুরি যাওয়ার পর খাঁচার মধ্যে পেয়েছি। এর কোন মানে আছে। হয়তো রহস্যটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এর। এটা নিয়ে ভাবা দরকার।'

'কি ভাবব?' মুসার প্রশ্ন।

'পাশের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পারি তারপিনের শিশি-টিশিগুলো কোথায় রাখে। হয়তো কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।'

'ফারিহা ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল, 'আমিও এটা নিয়ে ভেবেছি। দু-বারই তারপিনের গন্ধ পেয়েছি আমরা। কোথায় রাখা হয় ওগুলো দেখলে নতুন সূত্র পেতেও পারি।'

'চলো তাহলে,' রবিন বলল। 'এটাই সময়। হারপিগ কাজে ব্যস্ত। চুপি চুপি গেলে আমাদের দেখতে পাবে না। যা করার ওকে না দেখিয়ে করতে হবে। দেখলেই বাগড়া দিতে আসবে।'

আবারও টিটুকে ছাউনিতে আটকে রেখে দেয়াল টপকে পাশের বাড়ির বাগানে নামল চার গোয়েন্দা।

হারপিগ কোথায় আছে গিয়ে দেখে এল মুসা। জানাল, 'বাড়ির কাছে কি যেন করছে সে। আমরা নিরাপদ। এসো।'

খাঁচার কাছে এসে জালের গায়ে নাক ঠেকিয়ে আবার শুঁকতে লাগল ওরা। তারপিনের হালকা গন্ধ এখনও রয়েছে বাতাসে। এমন সময় আইলিন এল সেখানে। ছেলেমেয়েদের দেখে খুশি হলো না।

'খাঁচার কাছে কেউ আসাটা আর ভাল লাগছে না আমার,' কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বলে দিল সে। 'দুই দুইবার হারাল টিকসি, মাথাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। দেখো, কিছু মনে কোরো না, খাঁচার কাছে আর তোমরাও এসো না।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস ডেনভার, খাঁচা পরিষ্কার করতে কি আপনি তারপিন ব্যবহার করেন?'

অবাক মনে হলো আইলিনকে। 'তারপিন ব্যবহার করব কেন? তারপিনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না বেড়ালেরা। মাঝেসাঝে ডেটল পানিতে মিশিয়ে ঘর পরিষ্কার করি।'

'তাহলে খাঁচায় তারপিনের গন্ধ এল কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'শুঁকে দেখুন, গন্ধ পাবেন।'

কিন্তু আইলিন গন্ধ পেল না। হয় নাকের ক্ষমতা খুবই কম তার, নয়তো না পাওয়ার ভান করছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কাল বেড়ালটা চুরি যাওয়ার পর যখন খাঁচায় ঢুকেছিলেন তখনও পাননি?'

'কি জানি!' মনে করার চেষ্টা করল আইলিন। 'হয়তো পেয়েছি। খেয়াল নেই। বললাম না, টিকসি আবার হারানোয় মাথায় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার।'

আবার খাঁচার জালে নাক ঠেকিয়ে শুঁকতে লাগল ওরা।

আইলিন বলল, 'হয়েছে, এবার যাও। বেড়ালের খাঁচার কাছে এখন কাউকে দেখলেই ভয় লাগতে থাকে'

ওখান থেকে সরে এসে কিশোর বলল, 'চলো, ছাউনিতে।'

বাগানের কোণে দুটো ছাউনি। সেখানে এসে রবিন আর ফারিহাকে একটাতে খুঁজতে পাঠিয়ে কিশোর আর মুসা অন্যটাতে ঢুকল।

আঁতিপাতি করে খুঁজল মুসারা, কিন্তু তারপিনের শিশি দেখতে পেল না।

ঘরের কাছ দিয়ে পিটারকে যেতে দেখল মুসা। আবার মন খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার। শিস দিয়ে ডাকল সে।

চোখ তুলে তাকাল পিটার। মুসাকে হাত নাড়তে দেখে এগিয়ে এল।

'কি ব্যাপার?' মুসা বলল, 'মুখটাকে অমন করে রেখেছ কেন? কাঁচা তেঁতুল গিলেছ?'

'আমার অবস্থায় পড়লে তোমারও অমনই হত। ছাউনিতে কি করছ? হারপিগ এসে দেখে ফেললে বিপদে পড়বে।'

ছাউনির দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল কিশোর। বলল, 'তারপিন খুঁজছি।'

অবাক হলো পিটার। 'তারপিন? কেন? এটাতে তো নেই, অন্যটাতে। তাকের ওপর রাখা, এসো দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তারপিন দিয়ে কি করবে তোমরা?'

রবিন আর ফারিহা যেটাতে ঢুকেছে, সেটাতে ঢুকল পিটার। একটা তাক দেখাল, অনেক ধরনের টিন আর শিশি-বোতল রাখা তাতে। 'ওই তাকেই আছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ফারিহা আর রবিন। অনেক খুঁজেছে ওরা, কিন্তু তারপিনের শিশি পায়নি। পিটার বলাতে চারজনেই আবার ভাল করে খুঁজে দেখল। নেই।

রবিন বলল, 'তখনও ভাল করেই দেখেছিলাম আমরা।'

খুবই অবাক হলো পিটার। 'কিন্তু এখানেই তো ছিল! কালও দেখেছি। গেল কই?'

উত্তেজিত হয়ে উঠছে কিশোর, কেন সে নিজেই বলতে পারবে না। 'বোতলটা আমাদের দরকার।'

'কেন?'

'জানি না। তবে দরকার। তাকে নেই, তারমানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে অন্য কোথাও। খুঁজে বের করতে হবে।'

'টিটুকে লাগিয়ে দিলেই হয়,' মুসা বলল। 'ওর নাক আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।'

'ঠিক!'

কাজ করতে চলে গেল পিটার।

গোয়েন্দারা চলে এল দেয়ালের কাছে। মুসা আর কিশোর দেয়াল টপকে অন্যপাশে চলে এল। ছাউনিতে ঢুকল। ওদেরকে দেখে যেন পাগল হয়ে গেল টিটু, যেন কত বছর দেখেনি ওদের। একবার এর গায়ের ওপর পড়ে, একবার ওর গায়ে, হাত চেটে দিতে লাগল ঘন ঘন।

ঘরের কোণ থেকে একটা তারপিনের টিন বের করল মুসা।

'এদিকে আয় টিটু,' ডাকল কিশোর, 'একটা কাজ করতে হবে তোকে।'

কয়েক মিনিট পর দেয়াল টপকে আবার লেডি অরগাননের বাগানে ঢুকল মুসা, কিশোর ও টিটু। অন্য দু-জন অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

রবিন বলল, 'এত দেরি করলে! আমি তো ভয়েই বাঁচি না, পিগটা কোন সময় এসে পড়ে ভেবে!'

একটা ন্যাকড়ায় তারপিন ভিজিয়ে এনেছে মুসা। সেটা টিটুকে শোঁকাল কিশোর। বলল, 'ভাল করে শোঁক, মনে রাখ, তারপর খুঁজে বের কর কোথায় আছে।'

গন্ধটা মোটেও পছন্দ করল না টিটু। নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল। তারপর প্রচণ্ড হাঁচি দিল তিনবার।

'যা, এবার খুঁজে বের কর,' কিশোর বলল।

তার দিকে চোখ তুলে তাকাল টিটু। বুঝতে পারল তার মনিব কি চাইছে। জিনিস খোঁজার ট্রেনিং তাকে ভালমতই দিয়েছে কিশোর।

লম্বা জিভ বের করে, লেজটা উঁচু করে, অনেকটা টগবগিয়ে চলার মত করে চলতে লাগল টিটু। নাক নিচের দিকে।

'দূর,' বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল মুসা, 'তারপিন নয়, ব্যাটা খরগোশের গন্ধ খুঁজছে। ওই দেখো, গর্ত খুঁজে বের করেছে।'

গর্তটা রয়েছে একটা উঁচু ঢিবির একধারে। তার ভেতরে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার খোক-খোক ছাড়ল টিটু। তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করল। ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে।

'উঠে আয়, গাধা কোথাকার!' ধমক লাগাল কিশোর। 'কাজ পেল না আর! তোকে খরগোশের গর্ত বের করতে কে বলেছে?'

পেছনের পা ধরে টেনে টিটুকে সরিয়ে আনল সে। কুকুরটার দাঁত থেকে গোল একটা জিনিস গড়িয়ে পড়ল। একটা কর্ক।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জিনিসটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা। তারপর কুড়িয়ে নিয়ে গন্ধ শুঁকল কিশোর। 'তারপিনের গন্ধ!' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে।

কর্কটা হাতে নিয়ে একে একে শুঁকে দেখল সবাই। কোন সন্দেহ নেই, তারপিন।

ততক্ষণে গর্তের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কিশোর। হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ভেতরে।

একটা বোতল বের করে আনল। গায়ের পুরানো লেবেলটার অর্ধেক ছেঁড়া। যেটুকু লেগে আছে, তাতে ইংরেজি Turpentine-এর শেষ কয়েকটা অক্ষর লেখা। খানিকটা তারপিন এখনও আছে বোতলে।

'এটাই খুঁজছিলাম আমরা!' মহাখুশি হয়ে বলল কিশোর

গর্তের কাছে গিয়ে বসল ফারিহা। ভেতরে উঁকি দিল। কৌতূহলী হয়ে, হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগল আর কিছু আছে কিনা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

চমকে গেল সবাই। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি হলো? সাপ?'

মাথা নাড়ল ফারিহা। একটা টিন বের করে আনল।

'আরি, এ তো রঙ!' রবিন বলল।

পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে চাড় দিয়ে টিনের ঢাকনাটা খুলল কিশোর। টিনটা প্রায় পুরোটাই ভর্তি, খরচ হয়নি তেমন।

'চিনতে পেরেছ রঙটা?' কিশোর বলল, 'পাথরটাতে এই রঙের ফোঁটাই পড়েছিল!' পকেট থেকে পাথরটা বের করে নিজেও দেখল আরেকবার, সবাইকে দেখাল। 'এখন আমাদের জানতে হবে,' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ছে তার, 'এই রঙ আর তারপিন এনে গর্তে ফেলে গেছে কে।'

বিশ

উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছে গোয়েন্দারা। দুটো মূল্যবান সূত্র এখন ওদের কাছে। যদিও বেড়াল চুরির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক বুঝতে পারছে না।

'তারপিন দিয়ে কি হয়?' জানতে চাইল ফারিহা।

'রঙের ব্রাশ ধোয়া হয়, রঙ তোলা হয়,' রবিন বলল।

গর্তের মধ্যে আবার নাক ঢুকিয়ে দিল টিটু। আরও ভেতরে ঢোকার জন্যে মাটি খুঁড়ে বড় করতে লাগল মুখটা। এক মুহূর্ত থামল। তারপর পিছিয়ে বের করে আনল শরীরটা। দাঁতে কামড়ে এনেছে একটা রঙের ব্রাশ।

হারপিগের গলা শোনা গেল। চিৎকার করে পিটারকে ডাকছে। সেদিকে কান পেতে কিশোর বলল, 'অনেক পেয়েছি। জলদি চলো পালাই এখান থেকে। এসে দেখে ফেললে কেড়ে নিতে পারে আমাদের সূত্রগুলো। মুসা, রবিন, এসো তো, সাহায্য করো আমাকে। গর্তের মুখটা আবার আগের মত করে দিই, খোঁড়া যে হয়েছে যাতে বুঝতে না পারে।'

তাড়াতাড়ি গর্তের মুখের চারপাশটায় আবার মাটি দিয়ে ভরে দিল ওরা। আগের মত হলো না আর, তবে ভাল করে না তাকালে বোঝাও যাবে না যে খোঁড়া হয়েছিল। তারপর দৌড় দিল দেয়ালের দিকে।

সবশেষে লাফিয়ে নামল মুসা। নামার আগে দেখতে পেল ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কি যেন বকতে বকতে আসছে হারপিগ। আরেকটু হলেই দেখে ফেলত ওদেরকে।

সূত্রগুলো নিয়ে ছাউনিতে চলে এল ওরা।

'এক বোতল তারপিন, একটিন হালকা বাদামী রঙ, আর একটা ছোট রঙ লাগানোর ব্রাশ,' আনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। তাকাল বন্ধুদের দিকে, 'ওগুলো কি কাজে ব্যবহার হয়েছে, কে করেছে, জানতে পারলেই বেড়াল উধাও রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে।'

'কিশোর,' নিজেকে এখন বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে ফারিহার, কারণ তারপিনের ব্যাপারে তার সন্দেহই কাজে লেগেছে. 'আরেকবার যাবে নাকি খাঁচার কাছে? খাঁচায় ঢুকে, ঠিক কোন জায়গাটায় বেশি গন্ধ জানতে পারলে কোন সুবিধে

হবে?'
'কি সুবিধে হবে?' মুসা বলল, 'আমি তো তেমন কিছু দেখছি না।'
'আমিও না,' রবিন বলল। 'তা ছাড়া খাঁচায় ঢুকব কি করে? পিগটা কড়া নজর রাখে সারাক্ষণ। চাবি থাকে আইলিনের কাছে।'
'আমি কিন্তু ফারিহার সঙ্গে একমত,' কিশোর বলল। 'কোন জায়গাটায় গন্ধ বেশি, জানলে কি সুবিধে হবে এখন বলতে পারছি না। তবে হতেও পারে। বসে বসে ভাবনা-চিন্তা করার চেয়ে গিয়ে দেখা যাক না, ঢুকতে পারি কিনা? ফারিহা, তোমার বুদ্ধি আছে।'
প্রশংসা শুনে—বিশেষ করে কিশোরের, টগবগ করে ফুটতে শুরু করল যেন ফারিহা।
'চাবি পাব কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'থাকে তো আইলিনের পকেটে।'
জোরে জোরে কয়েকবার নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'আজ খুব গরম। জ্যাকেট কিংবা কোট গায়ে দেবে না আইলিন, খুলে কোথাও ঝুলিয়ে রাখবে। এখন নিশ্চয় বেড়ালের খাঁচার কাছেও কাজ করছে না, গ্রীনহাউসে সব্জীর তদারকি করছে।'
'কিন্তু যেখানেই ঝোলাক জ্যাকেট কিংবা কোট, চোখে চোখে রাখবে।'
'গিয়ে দেখলেই হয়,' উঠে দাঁড়াল মুসা। সূত্রগুলো নিয়ে গোপন খুপড়িতে লুকিয়ে রাখল। 'চলো, যাই।'
আবার টিটুকে আটকে রেখে দেয়াল টপকে লেডি অরগাননের বাগানে নামল গোয়েন্দারা। প্রথমেই গিয়ে কিশোর দেখে এল, আইলিন কোথায় আছে। যা অনুমান করেছিল, তাই, গ্রীনহাউসেই আছে সে। তার জ্যাকেটটা কোথায় আছে খুঁজতে লাগল কিশোর।
গ্রীনহাউসের ভেতরেই একটা পেরেকে ঝোলানো জ্যাকেটটা দেখতে পেল সে। সেরেছে! ওখান থেকে গিয়ে চুরি করে চাবি বের করে আনা অসম্ভব।
ফিরে এসে খবরটা বন্ধুদের জানাল কিশোর।
মুসা বলল, 'কোন ভাবে তাকে বের করে আনতে হবে।'
কি ভাবে বের করা যায় ভাবতে লাগল সবাই মিলে।
সমাধান দিল রবিন, বলল, 'গ্রীনহাউসের দু-দিকেই দরজা আছে। শেষ মাথার দরজার কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব আমি। চিৎকার করে মিস ডেনভারের নাম ধরে ডাকব। কে ডাকছে দেখার জন্যে আসবেই সে। এই সুযোগে চট করে একজন ঢুকে বের করে আনবে চাবিটা।'
'চাবি বের করতে দেখে ফেললে মরব!' মুসা বলল। 'কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। ঠিক আছে, যাও, আমিই বের করতে যাব। যা হয় হবে।'
'যাও,' কিশোর বলল। 'আমি আর ফারিহা বেড়ালের খাঁচার কাছে চলে যাচ্ছি।'
গ্রীনহাউসের শেষ প্রান্তে চলে এল রবিন। ভেতরে বাঁধাকপি নিয়ে ব্যস্ত আইলিন। একটা ঝোপে লুকিয়ে বসল সে। দেখতে পেল, আরেকটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল মুসা তারপর পুরো ঘটনাটা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল।

আইলিনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল রবিন।

দরজা খুলে বেরিয়ে কাউকে না দেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আইলিন, 'কে? কে ডাকে?'

ঠিক এই সময় রাস্তা ধরে আসতে দেখা গেল মিস টোমারকে। চশমাটা বসানো আছে নাকের ওপর।

আইলিন ভাবল, মিস টোমারই ডেকেছে। বলল, 'ও, আপনি। কি জন্যে ডেকেছেন?'

'আমি ডেকেছি!' অবাক হওয়ায় সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন মিস টোমার, তাতেই খসে পড়ে গেল চশমাটা। 'কই, না তো! তবে কে যেন তোমার নাম ধরে চিৎকার করছিল, আমিও শুনেছি। লেডি অরগানন নন তো?'

'কিন্তু তিনি এখন কি জন্যে ডাকবেন? দেখি তো, দেখা করে আসি।'

মিস টোমারের সঙ্গে চলে গেল আইলিন। মুহূর্তও দেরি করল না আর মুসা, ঢুকে পড়ল গ্রীনহাউসে। জ্যাকেটের পকেট থেকে চাবিটা বের করে নিয়েই দৌড়।

খাঁচার কাছে চলে এল সে আর রবিন চাবিটা দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল, 'নিয়ে এলাম।'

'দাও,' হাত বাড়াল কিশোর, 'আমি আর ফারিহা ঢুকছি।'

একসঙ্গে ঢুকে গেল দু-জনে। দরজাটা লাগিয়ে দিল। নাক উঁচু করে শুঁকতে শুরু করল। ডেটলের গন্ধে ভরে আছে। সেই গন্ধকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে নাকে এসে লাগছে তারপিনের গন্ধ।

'ফারিহা, দেখে যাও, এখানে গন্ধ খুব বেশি,' ফারিহার নাকের ওপর এখন পুরোপুরি ভরসা করতে আরম্ভ করেছে কিশোর। মেয়েটার নাকের ক্ষমতা সাংঘাতিক।

বেঞ্চের ওপর শুয়ে আছে একটা বড় বেড়াল। আলতো করে ধাক্কা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে নাক নামিয়ে শুঁকে দেখল ফারিহা। বলল, 'না, গন্ধ এই বেঞ্চে নয়।'

নাক নামিয়ে কিশোরও একই জায়গায় শুঁকল আবার। তাজ্জব হয়ে গেল। গন্ধ নেই। কিন্তু একটু আগেও ছিল!

বেঞ্চ থেকে সরিয়ে দেয়ায় উসখুস করছে বেড়ালটা। আরামের জায়গা ছেড়ে গিয়ে ভাল লাগছে না। সেটা লক্ষ করে আবার তাকে তুলে এনে বেঞ্চে রাখল ফারিহা। হেসে বলল, 'নে, ঘুমো। আর বিরক্ত করব না।'

'আরি, আবার গন্ধটা এসেছে!' নাক কুঁচকে বলল কিশোর।

ফারিহাও পেল এবার। চিৎকার করে উঠল, 'বেঞ্চে গন্ধ নয়! বেড়ালটার গায়ে!'

'দেখো তো গায়ের কোন জায়গায় বেশি?'

বেড়ালটার গা শুঁকে দেখল ফারিহা। লেজের ডগার দিকে গিয়ে বলল, 'এখানে!'

'হুঁ, আমারও মনে হচ্ছে ওখানেই হবে,' না শুঁকেই বলল কিশোর। তাকিয়ে আছে লেজের দিকে। এপাশ ওপাশ নাড়ছে এখন বেড়ালটা।

মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিশোর, জলদি বেরোও। পিগ আসছে!'

কিন্তু বেরোনোর সুযোগ আর হলো না। তার আগেই ওখানে এসে হাজির হলো হারপিগ। চোখ সরু সরু করে তাকিয়ে রইল নীরবে। বিশ্বাসই যেন করতে পারছে না এ রকম কিছু ঘটছে।

থরথর করে কাঁপতে লাগল ফারিহা। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখল কিশোর। ফারিহার হাত ধরে তাকে টেনে বের করে এনে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। মুসা আর রবিনকে দেখা গেল না। ওদেরকে সাবধান করে দিয়েই নিশ্চয় কোন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে।

ফেটে পরল হারপিগ, 'খাঁচায় ঢুকেছিলে কেন? তারমানে বেড়ালটাকে তোমরাই চুরি করেছ। দাঁড়াও, এখুনি যাচ্ছি ফগের কাছে। তারপর বুঝবে মজা।'

একুশ

গটমট করে চলে গেল হারপিগ।

কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরে আছে ফারিহা। কাঁপছে এখনও। ভয় কিশোরও পেয়েছে, জোর করে সোজা রেখেছিল নিজেকে, আর পারল না। ধপ করে বসে পড়ল ওখানেই। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মুসা ও রবিন।

দেয়াল টপকে মুসাদের বাগানে নামল গোয়েন্দারা। ছাউনিতে ঢুকল।

'কাণ্ডটা কি হলো বলো তো!' রবিন বলল, 'দুর্ভাগ্য একেই বলে!'

'ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে জানানো উচিত,' মুসা বলল। 'বলতে হবে, চুরি করতে ঢুকিনি আমরা...' কিন্তু তার কথায় কিশোরের কান নেই দেখে থেমে গেল সে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

'অ্যাই কিশোর, তোমার ভয় করছে না?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'বেড়ালের লেজের গন্ধ নিয়ে ভাবছি।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে ফারিহা বলল, 'তুমি বলেছ, ব্রাশ পরিষ্কার করতে কিংবা কোন কিছু থেকে রঙ তুলতে তারপিন ব্যবহার করা হয়। তাহলে কি বেড়ালের লেজ থেকে তুলতেও ব্যবহার হয়েছে? কোনভাবে লাগিয়ে ফেলেছিল হয়তো?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। একটা খালি বাক্সে কিল মারল সে, 'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম!'

'হলোটা কি তোমাদের?' অবাক হয়ে একবার কিশোর একবার ফারিহার মুখের দিকে তাকাচ্ছে মুসা। 'পাগল-টাগল হয়ে গেলে নাকি? পিগের ভয়ে!'

'মোটেও না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। 'শোনো, বেড়ালটার লেজ থেকে রঙ তুলতেই তারপিন ব্যবহার হয়েছে। জিজ্ঞেস করতে পারো, কি রঙ লাগানো হয়েছিল? আমরা জানি সেটা, যে টিনটা পেয়েছি গর্তের মধ্যে, পাথরে যে রঙ লেগেছিল, সেই রঙ। শুকালে যেটা মাখনের মত হয়ে যায়।'

হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

গোপন ফোকর থেকে রঙের টিন আর ব্রাশ বের করে আনল কিশোর। ঢাকনা খুলে রঙে ব্রাশ চুবিয়ে লাগিয়ে দিল একটা কালো বাক্সের গায়ে।

'দেখো রঙটা, মাখনের মত হয়ে গেছে না? এখন আরেকটা প্রশ্নের জবাব দাও—কোন বেড়ালের লোম মাখনের মত?'

'টিকসির লেজে!' একসঙ্গে নামতা বলার মত করে চিৎকার করে উঠল অন্য তিনজন। চকচক করছে চোখ। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'হ্যাঁ,' বিজ্ঞ অঙ্কের মাস্টারের মত করে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যে বেড়ালটার গায়ে গন্ধ লেগে আছে সেটার লেজের ডগা কালো, তাতে এই রঙ লাগালে মাখন-রঙা দেখাবে, টিকসি বলে ভুল হবে। তারপর সেটাকে তুলতে কড়া তারপিন দরকার। তারপিন দিয়ে ঘষে তোলা হয়েছিল বলেই খাঁচায় গন্ধ পাওয়া গেছে।'

'খাইছে!' মুসা বলল, 'দুর্দান্ত ঘটনা!'

'সাংঘাতিক প্ল্যান!' বলল রবিন। 'তারমানে টিকসিকে সকালেই চুরি করে সরিয়ে ফেলে অন্য বেড়ালের লেজে রঙ লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর যারাই দেখেছে, ওটাকে টিকসি বলে ভুল করেছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মুসার আম্মা, লেডি অরগানন, সবাই দেখেছেন বেড়ালটার লেজের ডগার লোম অন্যরকম। এক সময় খাঁচায় ঢুকে তারপিন দিয়ে রঙটা তুলে ফেলেছে হারপিগ, বলেছে টিকসি হারিয়ে গেছে।'

'হারপিগ!' চোখ গোল গোল হয়ে গেল ফারিহার। 'হারপিগ করেছে এই কাজ! তুলে যদি থাকে, তাহলে লাগিয়েছেও সে-ই! কি করে...'

'সব ওই পিগটারই শয়তানী নিজে করেছে, দোষ চাপিয়েছে পিটারের ঘাড়ে।'

'আর পিটারকে সারাক্ষণ কাজ দিয়ে রেখেছে খাঁচার কাছে,' উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা, 'যাতে তাকেই সন্দেহ করে সবাই! কত্তবড় বদমাশ!'

'তারপর যেই ফারিহার মুখে শুনেছে খাঁচায় তারপিনের গন্ধ আর পাথরে রঙ লেগে থাকার কথা অমনি তাড়াহুড়ো করে রঙের টিন, তারপিন, সব নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে গর্তে,' বলল কিশোর। 'হয়তো টিনের গায়ে আঙুলের ছাপ লেগে থাকার ভয়ও করেছে।'

রবিন বলল, 'আরও সহজে করে ভাবি—পিগ ঠিক করেছিল টিকসিকে চুরি করবে, আর দোষটা চাপাবে পিটারের ঘাড়ে। আইলিনের ছুটির দিনের জন্যে অপেক্ষা করেছে সে, কারণ তার ভয় ছিল, রঙ লাগিয়ে সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও আইলিনকে পারবে না।'

'হ্যাঁ,' আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আইলিনের ছুটির দিনে বেড়ালটাকে সরিয়ে ফেলেছে পিগ। অন্য বেড়ালের লেজে রঙ করে রেখেছে। প্রথমবার বিকেল চারটায় মুসার আম্মা আর লেডি অরগানন ওটাকে দেখে গেছেন। দ্বিতীয়বার চুরি হওয়ার পর তিনটের সময় দেখেছেন লেডি অরগানন...'

কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন, 'চালাক, ভয়ানক চালাক! প্রথমবার সারাটা বিকেল গিয়ে এমন একজনের সঙ্গে কাটিয়েছে, যার সঙ্গে থাকলে তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তারপর সেই লোকটা, অর্থাৎ ফগকে নিয়ে এসেছে

তার বাগান দেখানোর ছুতো করে। বাগান দেখানোর পর এনেছে বেড়াল দেখাতে। ফগের সামনেই ভেতরে ঢুকে তার অলক্ষে বেড়ালটার লেজ থেকে তারপিন দিয়ে ঘষে রঙ তুলে ফেলে, চেঁচামেচি শুরু করেছে টিকসি চুরি হয়েছে বলে। কি শয়তানের শয়তানরে বাবা!'

'শুধু কি তাই। দ্বিতীয়বার আইলিনকেও ধোঁকা দিয়েছে। খাঁচার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল তার সামনেই. এবং তখনই নিশ্চয় লেজ থেকে রঙ ঘষে তুলেছিল। তারপর বলেছে টিকসি নেই। সবাইকে বোকা বানিয়েছে। সবাই ভেবেছে, খাঁচার মধ্যেই আছে টিকসি, পিটারও, আসলে তো ছিল না, অনেক আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওটাকে। যাক, সব যখন বোঝা গেল, এখন আর পিটারকে বিপদ থেকে মুক্ত করা কঠিন হবে না।'

'দেরি করছি কেন?' তাগাদা দিল মুসা, 'ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করা দরকার।'

'খাঁচার চাবিটা কি করব?' রবিনের প্রশ্ন। 'আইলিনের পকেটে আবার রেখে দেয়া ভাল না?'

'হ্যাঁ, চলো,' কিশোর বলল, 'রেখে দিয়ে আসি।'

টিটুকে ছাউনিতে রেখে আবার দেয়াল টপকাল গোয়েন্দারা। আইলিনকে কোথাও দেখতে পেল না।

'ছাউনিতে থাকতে পারে,' বলে সেদিকে এগোল কিশোর।

একটা গ্রীনহাউসের পাশ দিয়ে চলার সময় হঠাৎ কি মনে করে ভেতরে উঁকি দিল সে। বলে উঠল, 'আরে, এখানেই পিগটা তার জিনিসপত্র রাখে! ওই দেখো, রবারের বুট, ম্যাকিনটশ।'

'বাপরে, তারপিনের কি সাংঘাতিক গন্ধ! ভরে গেছে একেবারে!' নাক টানতে টানতে বলল ফারিহা।

'হ্যাঁ!' সবাই পাচ্ছে গন্ধটা।

পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল কিশোর। ম্যাকিনটশের পকেট থেকে একটা ময়লা রুমাল টেনে বের করল। তাতে সেলাই করে হারপিগের নাম লেখা। তারপিনের কড়া গন্ধ লেগে আছে।

'এই রুমালে করেই তারপিন ভিজিয়ে রঙ তুলেছে, কিশোর বলল। 'আরেকটা জোরাল সূত্র। রাতে বৃষ্টি হয়েছে, সকালেও। সে-জন্যেই ম্যাকিনটশ আর রবারের বুট পরতে হয়েছে তাকে। এই দেখো, সূত্র আরও আছে। জুতোর ডগায় রঙ লেগে গেছে।' হালকা-বাদামী রঙ দেখতে পেল সবাই। 'বেড়ালের লেজে রঙ করার সময় এই জুতোই পায়ে ছিল তার। ব্রাশ থেকে তার জুতোতে পড়েছে রঙের ফোঁটা, পাথরেও পড়েছে। রুমালটা নেব, এই জুতোটাও নিয়ে যাব। আহ্, চমৎকার, সূত্রের আর অভাব নেই। সব যখন বের করে দেখাব পিগের চেহারাটা কেমন হবে দেখতে ইচ্ছে করছে!'

'কেমন আর হবে,' গোঁ-গোঁ করে বলল মুসা, 'শুয়োরের মত! নাম যেমন চেহারাও তেমনই হবে!'

গ্রীনহাউস থেকে বেরোতেই পিটারের সামনে পড়ে গেল ওরা।

থমকে দাঁড়াল পিটার। 'তোমরা এখানে! ভীষণ বিপদে পড়েছ! বেড়ালের খাঁচায় নাকি ঢুকেছিলে, হারপিগ গেছে ফগকে খবর দিতে।'

বাইশ

কিশোর গেল ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করতে। এইবার ভাগ্য ভাল, পাওয়া গেল তাঁকে।

'কেসটার সমাধান করে ফেলেছি আমরা, স্যার,' কিশোর বলল। 'একবার কষ্ট করে আসতে পারবেন?'

'পারব। এইমাত্র একটা অদ্ভুত খবর পেয়েছি ফগর‍্যাম্পারকটের কাছে—তোমাদেরকে নাকি দেখা গেছে বেড়ালের খাঁচার মধ্যে। তার ধারণা, বেড়াল হারানোর ব্যাপারে তোমাদের হাত আছে। আমাকে আসতে অনুরোধ করেছে।'

'কখন আসছেন তাহলে?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, লেডি অরগাননের বাড়িতে। ওখানেই দেখা কোরো।'

টেলিফোন সেরে মুসাদের বাড়ি এসে কিশোর দেখল, ফগ এসে ফারিহার বিরুদ্ধে নালিশ দিয়ে গেছে মুসার আম্মার কাছে।

'খালা আমাকে অনেক বকেছে,' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল ফারিহা। 'আমি চুপ করে ছিলাম। কি বলতে আবার কি বলে ফেলি, সেই ভয়ে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'ক্যাপ্টেন আসছেন। লেডি অরগাননের বাড়িতে আমাদের দেখা করতে বলেছেন। সঙ্গে করে সমস্ত সূত্র নিয়ে যাব আমরা।'

সুতরাং তারপিনের শিশি, রঙের টিন, পুরানো একটা ব্রাশ, রঙ লাগা পাথর, হারপিগের রুমাল আর জুতো নিয়ে দল বেঁধে রওনা হলো গোয়েন্দারা।

'একটা সূত্রই কেবল সঙ্গে নিতে পারলাম না আমরা,' ফারিহা বলল, 'বেড়ালের লেজের গন্ধ। আর এটাই সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র, কি বলো?'

'এবারের রহস্য ভেদে তোমার কৃতিত্বই বেশি। তুমিই গন্ধটা আগে পেয়েছ।'

'ওই দেখো,' হাত তুলল রবিন, 'লেডি অরগাননের বাড়িতে ঢুকছে ঝামেলা। পিগটাও আছে সঙ্গে।...আরে, পিটার যাচ্ছে কোথায়?'

কাছে এসে পিটার জানাল, 'আমাকে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বাড়িতে ঢুকতে বলেছে।' খুব ভয়ে ভয়ে আছে সে, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

'ভয় পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু তবু ভয় দূর হলো না পিটারের চোখ থেকে।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে ফিরে তাকিয়ে ওরা দেখল, ক্যাপ্টেন রবার্টের কালো

গাড়িটা আসছে। ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাসলেন তিনি। 'অপরাধীটা কে?'

'হারপিগ, স্যার,' হাসিমুখে জানাল কিশোর। 'আপনিও নিশ্চয় আন্দাজ করে ফেলেছেন। তবে সূত্র তো আর পাননি, শিওর হতে পারেননি। তাই না?'

'হ্যাঁ। ওকে সন্দেহ করেছি আমি। একটা কথা অবশ্য তোমরা জানো না, হারপিগের ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রয়েছে। চুরির কেসে আগেই জড়িয়েছে সে, কুকুর চুরি। ঠিক আছে, তোমরা যাও, আমি আসছি।'

লেডি অরগাননের বিশাল ড্রইং রুমে ঢুকল গোয়েন্দারা। ওদের দেখেই বললেন তিনি, 'এসো, বসো।'

সোফায় বসল ওরা। ফগকে দেখেই মহা-আনন্দে ছুটে গেল টিটু, পায়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে গোড়ালির কাছে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কলার ধরে তাকে সরিয়ে আনল কিশোর। ধমক দিয়ে বসিয়ে রাখল পায়ের কাছে।

ক্যাপ্টেন ঘরে ঢুকে লেডি অরগাননের সঙ্গে হাত মেলালেন। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ফগের দিকে তাকিয়ে স[illegible]মের জবাবে মাথা ঝাঁকালেন।

তেরছা চোখে কিশোর আর ফারিহার দিকে তাকাচ্ছে ফগ। এইবার পেয়েছি হাতের মুঠোয়, শয়তানি বের করব!—এমন একটা ভঙ্গি।

'ফগর‍্যাম্পারকট,' কথা শুরু করলেন ক্যাপ্টেন, 'কি জন্যে ডেকেছ, বলো।'

চেয়ারে পিঠ খাড়া করল ফগ। কোমরের বেল্ট টেনেটুনে ঠিক করল। হামবড়া ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, আমার বিশ্বাস, এই খুঁতখুঁতে স্বভাবের ছেলেমেয়েগুলো বেড়াল চুরি সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। আপনাব তরফ থেকে ভালমত একটা ধমক খাওয়া দরকার ওদের, সাবধান করে দেয়া দরকার ভবিষ্যতে যাতে আর এ রকম না করে।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলেন ক্যাপ্টেন, 'অনেক কিছুই জানে, যা তুমিও জানো না। কি কি জানে জিজ্ঞেস করা যাক ওদের। ধমকটা কার কপালে আছে, পরে দেখা যাবে,' কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি কিছু বলতে চাও?'

চায় মানে! বলার জন্যে মুখিয়ে আছে। পেট ফেটে যাচ্ছে। তবে তাড়াহুড়ো করল না, ধীরেসুস্থে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'বেড়ালটা কে চুরি করেছে আমরা এখন জানি, স্যার।'

ঘোঁৎ করে উঠল হারপিগ। ভুরু কুঁচকে ফেলল ফগ। পিটারের চোখে আতঙ্ক। মিস টোমারের চশমা খসে গেল নাক থেকে, হেসে ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল ফারিহা।

'বলো,' ক্যাপ্টেন বললেন।

'চুরিটা কি ভাবে হয়েছে সেটা আগে বলে নিই, স্যার।'

সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

'বলো,' আবার বললেন ক্যাপ্টেন, চোখে মিটিমিটি হাসি। কিশোরের নাটকীয় ভাবভঙ্গিতে মজা পাচ্ছেন তিনি।

'দুইবার চুরি হয়েছে টিকসি, আপনি জানেন, স্যার। দুইবারই বাড়িতে ছিল না

মিস ডেনভার, ছুটি ছিল তার। বেড়ালগুলোর দায়িত্বে ছিল তখন মিস্টার হারপিগ।'

ফগের নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। 'ঝামেলা! কিন্তু···' শুরু করতে যাচ্ছিল সে, তাকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, 'কথার মাঝে কথা বোলো না!'

চুপ হয়ে গেল ফগ।

এতে খুব মজা পেল কিশোর। তার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। 'কি করে চুরিটা হয়েছে, তাই এখন বলি। টিকসিকে সকাল বেলা চুরি করেছে চোর। ওটার লেজে আরেকটা বেড়ালে কামড়ে দিয়েছিল, লোম উঠে গিয়েছিল ওখানকার, পরে আবার গজিয়েছে। রঙটা আগের মত আর হয়নি, অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল। ওই চিহ্ন দেখেই চেনা যায় তাকে। আসল বেড়ালটাকে সরিয়ে ফেলে একই রকম দেখতে আরেকটা বেড়ালের লেজে রঙ লাগিয়ে দিয়েছিল চোর। যাতে সবাই মনে করে টিকসি খাঁচাতেই রয়েছে।'

জোরাল গুঞ্জন উঠল।

চশমা খসে পড়ল মিস টোমারের।

বলতে থাকল কিশোর, 'বিকেলে যারাই খাঁচার কাছে গেছে, দেখেছে টিকসি আছে; আসলে লেজে রঙ করা বেড়ালটাকে দেখেছে তারা। তারপর একটা বিশেষ সময়ে খাঁচায় ঢুকে লেজ থেকে তারপিন দিয়ে রঙ ঘষে তুলে ফেলে ঘোষণা করেছে চোর যে টিকসি চুরি হয়েছে। সবাই তখন বিশ্বাস করেছে, বিকেল বেলা চুরি হয়েছে বেড়ালটা।'

'আর সে-জন্যেই সবাই আমাকে সন্দেহ করে বসেছে!' চুপ থাকতে পারল না পিটার। 'কারণ সারাটা বিকেল আমি কাজ করেছি ওখানে। খাঁচার কাছে কাউকে আসতে দেখিনি!'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'তোমাকে ফাঁসানোর জন্যেই এ কাজ করা হয়েছে।'

'কে?' রাগে জ্বলে উঠল পিটার। মুঠো হয়ে গেল হাত। 'তার নামটা বলো!'

'তুমি এ সব কথা জানলে কি করে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ফগ। 'বানিয়ে একটা গল্প বলে দিলেই তো হলো না, প্রমাণ চাই।'

ক্যাপ্টেনকে তার দিকে তাকাতে দেখে আবার কুঁকড়ে গেল সে।

'প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না।' পকেট থেকে তারপিনের শিশিটা বের করল কিশোর। 'একটা খরগোশের গর্তে পেয়েছি এটা, লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। রঙের টিন আর ব্রাশটাও পেয়েছি ওখানে। মুসা, রবিন, অন্য সূত্রগুলো আনবে?'

কর্তৃত্বটা এ ভাবে নিজের হাত থেকে চলে যাবে, কল্পনাও করতে পারেনি মুসা। কিন্তু কিশোর তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, মনে মনে এ কথা স্বীকার না করেও পারল না। হুকুমটা ঠিক মেনে নিতে না পারলেও উঠল সে, বেরিয়ে গেল। সঙ্গে গেল রবিন।

বাইরে একটা ঝোপের মধ্যে জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখেছিল কিশোর, পরিবেশকে নাটকীয় করে তোলার জন্যে। মুসা আর রবিন ওগুলো হাতে নিয়ে ঢুকল।

নাক থেকে চশমা খসে পড়ে গেল মিস টোমারের। হারপিগের চোখ দেখে মনে

হলো ওগুলোও কোটর থেকে বেরিয়ে ছিটকে পড়বে।

'এই টিন থেকে রঙ নিয়ে এই ব্রাশ দিয়ে রঙ করা হয়েছিল বেড়ালের লেজে,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'এই জুতো তখন পরা ছিল চোরের পায়ে। এই যে, ডগায় রঙ লেগে আছে। তারপিন দিয়ে এই রুমাল ভিজিয়ে রঙ তোলা হয়েছিল আবার। দু-বার খাঁচায় ঢুকেছিল সে, একবার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল মিস্টার র‍্যাম্পারকটকে...'

'ঝামেলা! ফগর‍্যাম্পারকট!' শুধরে দিল ফগ।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে, আর দ্বিতীয়বার মিস ডেনভারকে।'

'রুমালটা দেখি?' হাত বাড়ালেন ক্যাপ্টেন।

তাঁকে দেয়া হলো ওটা। শুঁকে দেখলেন তারপিনের তীব্র গন্ধ লেগে আছে।

রঙ লেগে থাকা পাথরটাও পকেট থেকে বের করে ক্যাপ্টেনকে দিল কিশোর। 'খাঁচার বাইরে পেয়েছি এটা, স্যার।'

ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, 'তারপিনের গন্ধটা কে পেয়েছে?'

'ফারিহা।'

গর্বে ফুলে উঠল ফারিহার বুক। কিন্তু বগুলো চোখ একসঙ্গে তার দিকে ঘুরে যেতে দেখে লজ্জাও পেল।

'রুমালে নাম লেখা আছে,' শান্তকণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'নিশ্চয় চোরের নাম।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দেখার জন্যে এগিয়ে এল পিটার।

'কার নাম?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে আইলিন।

কঠিন দৃষ্টিতে হারপিগের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। ঢোক গিলল। সবাই বুঝে গেল, কার কাজ।

'হারপিগ,' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

রাগ দেখা দিল ফগের চোখে, সেই সঙ্গে তীব্র ঘৃণা। 'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ, আমাকে বোকা বানিয়েছ! বাগান দেখানোর ছুতোয় নিয়ে এসেছিলে আমাকে নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে! রঙ তোলার জন্যে আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে খাঁচায় ঢুকেছিলে! ওফ্, গাধা বানিয়ে ছেড়েছ আমাকে!'

'মুখ ফসকে ফারিহা আপনাকে বলে ফেলেছিল গন্ধ আর রঙের কথা,' হেসে বলল কিশোর, 'আপনি বিশ্বাস করেননি। তখন করলেও হয়তো চোরকে ধরে ফেলতে পারতেন।'

'বেড়ালটা কোথায় হারপিগ?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন। 'এড়িয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না, জানো তুমি। এইসব প্রমাণ কোনটাকেই এড়াতে পারবে না। তার ওপর যুক্ত হবে তোমার অতীতের ক্রিমিন্যাল রেকর্ড। বলো।'

একেবারে কুঁকড়ে গেছে হারপিগ। মার খাওয়া কুকুরের অবস্থা হয়েছে তার। কোথায় গেছে তার সেই কঠোরতা, আর কোথায় বদমেজাজ।

অস্বীকার করে আর লাভ হবে না বুঝে দোষ স্বীকার করে নিল হারপিগ। বলল,

টিকসিকে চুরি করেছে সে। একজনের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা ধার করে শোধ দিতে পারছিল না, তাই বেড়ালটাকে চুরি করেছে। কোথায় আছে ওটা এখন, তা-ও জানাল।

বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফগ। এগিয়ে গিয়ে বিশাল থাবায় চেপে ধরল হারপিগের কাঁধ। হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে ধরে পকেট থেকে হাতকড়া বের করে পরিয়ে দিল। ভয়ানক স্বরে বলল, 'এইবার এসো তুমি আমার সঙ্গে! ঝামেলা!'

'ফগর‍্যাম্পারকট, দাঁড়াও!' ডাকলেন ক্যাপ্টেন। ফগ ফিরে তাকালে বললেন, 'তুমি আসলেই একটা বোকা যাদেরকে বন্ধু ভাবা উচিত ছিল, তাদেরকে বানিয়েছ শত্রু। ধমকটা এখন কার খাওয়া উচিত, বলো?'

'অ্যাঁ...আমারই স্যার!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধ্য হলো ফগ।

'সুন্দর ভাবে ওরা রহস্যটার সমাধান করেছে, আশা করি এ ব্যাপারেও তুমি আমার সঙ্গে একমত?'

'নিশ্চয়, স্যার!' অপমানে ফগের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। 'খুব বুদ্ধিমান ওরা!'

'গুড। যাও, নিয়ে যাও চোরটাকে।'

হারপিগকে নিয়ে ফগ বেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফারিহা বলল, 'যাক, গেল। কিছু দিন আর জ্বালাতে আসবে না।'

'কোনদিনই আর আসবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন লেডি অরগানন। 'ওকে আর চাকরিতে নেব না আমি। বেচারা ছেলেটাকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু মালী তো একজন দরকার।'

মেঘ কেটে গেছে পিটারের চেহারা থেকে। লেডি অরগাননের কথায় হাসি ফুটল মুখে। বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, ম্যাডাম। আরেকজন যতদিন না পাওয়া যায় আমিই কাজ চালিয়ে নেব, যত খাটনিই লাগে লাগুক।'

খুশি হলেন লেডি অরগানন।

ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'আজ উঠি, একটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছি।' গোয়েন্দাদের বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, ইয়াং ম্যান। আশা করি ভবিষ্যতেও তোমাদের সাহায্য পাব আমরা।'

'নিশ্চয়, স্যার, নিশ্চয়!' একসঙ্গে কলরব করে উঠল কিশোর গোয়েন্দারা।

****

টাকার খেলা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

হুড়মুড় করে ঢুকল মুসা। সাংঘাতিক উত্তেজিত। চিৎকার করে বলল, 'কিশোর, সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের পিকআপটা চুরি করে নিয়ে গেছে। হামিদ খালুর রাইফেলগুলো সব ছিল ওর মধ্যে।'

মুসা জানাল, পিকআপটা নিয়ে বাস স্টেশনে গিয়েছিল সে, একটা বাক্স আনার জন্যে। তাতে কতগুলো নতুন মডেলের হাই-পাওয়ারড রাইফেল ছিল। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক রাইফেল ফ্যাক্টরি থেকে কিনে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সেগুলো রকি বীচে পাঠিয়েছিলেন মুসার খালু হামিদ আবদুল্লাহ। এক সময় বিখ্যাত শিকারি ছিলেন তিনি, এখন আফ্রিকায় কলার চাষ করছেন। খেতে প্রায়ই হানা দেয় বুনো জানোয়ারের দল, গাছ, ফল, সব নষ্ট করে তছনছ করে দেয়। সেসব ঠেকানোর জন্যে রাইফেল দরকার। আমেরিকা থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফোনে মুসাকে বলেছেন বাক্সটা কুরিয়ার সার্ভিসের অফিস থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রাখতে। তিনি পরে এসে নিয়ে যাবেন। জরুরী একটা কাজে আটকা পড়েছেন তিনি, কাজ সেরে আসতে আসতে দশ-পনেরো দিন লেগে যাবে।

'আমার ওপর ভরসা করে তুলে আনতে বলেছিলেন,' মুসা বলল। 'হায়রে কপাল, খোয়ালাম সব! ফেরত না পেলে লজ্জায় তো পড়বই, খালুরও অনেকগুলো টাকা গচ্চা যাবে।'

'কোনখান থেকে নিয়েছে ট্রাকটা?' জানতে চাইল কিশোর।

'স্টেশন থেকে বাক্সটা নিয়ে কপসনের হার্ডঅয়্যারের দোকানে গিয়েছিলাম বাবার জন্যে একটা ড্রিল মেশিন কিনতে। দোকানে ঢোকার পর ভাবলাম, এসেছি যখন, আমাদের ক্যাম্পিঙের জন্যে তাঁবুটাবুগুলোও কিনে ফেলি। কাজে লাগবে ভেবে একটা নৌকাও কিনেছিলাম।'

'টাকা দিয়ে ফেলেছ?' জানতে চাইল রবিন।

'না, দিইনি, বিল পাঠিয়ে দিতে বলেছি কপসনকে। তোমাদের যদি আবার পছন্দ না হয়। এখন তো আর পছন্দ অপছন্দের কোন ব্যাপার নেই, দোকানদার মাল বুঝিয়ে দিয়েছে, তার টাকা দিতেই হবে।'

'বসো, শান্ত হও, পানি খাও একগ্লাস,' কিশোর বলল, 'তারপর খুলে বলো সব।'

'জিনিসপত্র সব পিকআপের পেছনে রেখে বাড়ি রওনা হলাম,' টুলে বসে টিনের বেড়ায় হেলান দিয়ে বলল মুসা। 'পথে গোল্ডেন প্রন রেস্টুরেন্টটা দেখে মনে পড়ল

অনেকক্ষণ কিছু খাইনি। ঢুকে চিংড়ির কাটলেট ভরা দুটো বার্গার খেলাম। খেতে না ঢুকলেই কিন্তু আর এই সর্বনাশটা হত না। বেরিয়ে দেখি ট্রাকটা নেই।' পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করে কিশোরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'ট্রাকটা যেখানে ছিল, তার কাছে পেয়েছি এটা, মাটিতে পড়ে ছিল।'

হাত বাড়াল কিশোর, 'কি আছে?'

'নিজেই দেখো।'

ভেতরে টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। অনেক টাকা, একশো ডলারের বিশটা নোট। কাগজপত্র, মালিকের নাম-ঠিকানা বা ভিজিটিং কার্ড, জরুরী টেলিফোন নম্বর—সাধারণত যা মানিব্যাগে ভরে রাখে লোকে তার কিছুই নেই।

'কাউকে দেখিয়েছ এটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কার জিনিস?'

'জানি না,' মুসা বলল। 'দোকানে ঢুকে দোকানিকে বললাম ট্রাক থেকে মাল চুরি গেছে। এটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চেনে কিনা। চিনতে পারল না। তারও নয়, তার দোকানের কোন কর্মচারীরও নয়।'

'চোরের ব্যাগ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি, চুরি করার সময় কোনভাবে পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল,' রবিন বলল।

'পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে কি করে?'

'পড়তে পারে,' জবাব দিল কিশোর। 'বুক পকেটে রেখে মাটি থেকে কোন জিনিস তোলার জন্যে উবু হলে পড়তে পারে। প্যান্টের পেছনের পকেটে ঢোকানোর সময় তাড়াহুড়ো করলে কিংবা বেখেয়াল হলে ভেতরে না ঢুকে আটকে থাকতে পারে। হাঁটার সময় মাটিতে পড়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। যাই হোক, পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। একটা কথা শিওর, অসাবধানেই পড়েছে, ইচ্ছে করে ফেলেনি, এত টাকা কেউ ফেলে না।'

সামনে ঝুঁকে ডেস্কে কনুই রাখল রবিন। 'ট্রাকটা নিল কিভাবে? ড্যাশবোর্ডে চাবি ফেলে রেখে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'পুলিশে রিপোর্ট করেছ?' জানতে চাইল কিশোর।

'না। সোজা এখানে চলে এসেছি।'

ফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'গাড়িটার লাইসেন্স নম্বর কত?'

মনে করার চেষ্টা করে পারল না মুসা। 'জানি না। বাবা কয়েকদিন হলো কিনেছে, রিকন্ডিশন্ড, নম্বর দেখার কথা একবারও মনে পড়েনি আমার। গাড়ির কাগজপত্র সব গ্লাভস কম্পার্টমেন্টে রয়ে গেছে।'

'হুঁ,' রিসিভার কানে ঠেকিয়ে ডায়াল করল কিশোর। পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে খবরটা জানিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'চলো, গোল্ডেন প্রনে যাব।'

রবিনের ফোক্স ওয়াগেনে করে রওনা হলো ওরা। রেস্টুরেন্টের সামনে পৌছে মুসা দেখাল কোনখানে পিকআপটা রেখেছিল।

নরম মাটিতে বসে গেছে টায়ারের চিহ্ন। দেখাল রবিন। 'এগুলো পিকআপের চাকার?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'হ্যাঁ। চাকাগুলো একেবারে নতুন।'

রেস্টুরেন্টের পেছনের কাঁচা রাস্তা ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পিকআপটা। চাকার দাগ দেখে অনুসরণ করাটা পানির মত সহজ। দক্ষিণে শিপরিজের দিকে এগোল ওরা। ওদিকে বিশাল এক বন আছে।

কয়েক মাইল এগোনোর পর কাঁধে হাত রেখে রবিনকে থামতে ইঙ্গিত করল কিশোর। দরজা খুলে নামল। আরেকটা রাস্তা প্রথম রাস্তাটাকে ক্রস করে চলে গেছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনাল, 'আরেকটা গাড়ি ওদিক থেকে এসে পিকআপটার পিছু নিয়েছে। এর মানে কি?' ফিরে এসে গাড়িতে উঠে টায়ারের দাগ ধরে আবার গাড়ি চালাতে বলল রবিনকে।

দুটো গাড়ির দাগ দেখা গেল বেশ কিছুদূর পর্যন্ত, তারপর আবার একটা হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড! গেল কোথায় আরেকটা গাড়ি? রবিনকে থামতে বলল আবার কিশোর। তিনজনেই নামল এবার গাড়ি থেকে। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। রাস্তাটা থেকে কোন শাখাপথ বেরিয়ে যায়নি।

কতগুলো ঝোপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করল মুসা। ফাঁক ছিল আগে এখানটায়, ডাল আর পাতালতা দিয়ে নতুন করে ঢেকে দেয়া হয়েছে যাতে বোঝা না যায়। আলগা ডালগুলো সরিয়ে ভেতরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। পেছনে এসে দাঁড়াল রবিন আর কিশোর। হাত তুলে ওদেরকে বলল, 'ওই দেখো।'

একটা রাস্তা চলে গেছে বনের ভেতর। অনেক দিন ব্যবহার না করায় ঘাস গজিয়েছে, তাতে চাকার স্পষ্ট দাগ, ঘাস মাড়িয়ে গেছে।

'তোমরা দাঁড়াও এখানে,' বলল সে, 'আমি দেখে আসি।'

দুই মিনিট পরই ফিরে এল মুসা। 'পিকআপটা পেয়েছি। কিন্তু খালি। একটা জিনিসও নেই।'

'চলো তো দেখি,' হাঁটতে আরম্ভ করল কিশোর।

দুই

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। দেখেটেখে কিশোর বলল, 'চোরের সঙ্গে দ্বিতীয় গাড়িটার ড্রাইভারের খাতির আছে। এই বন ওদের চেনা।'

'তা ঠিক,' একমত হলো রবিন। 'পিকআপের জিনিস অন্য গাড়িটায় তুলে নিয়ে গেছে। ট্রাকটা ওদের দরকার নেই, মালগুলোই চেয়েছে শুধু।'

'একটা ট্রাক মেরে দেয়া সহজও নয়,' হাত নাড়ল মুসা 'নৌকাটা নিল কি করে?'

'ছাতে বেঁধে,' জবাব দিল কিশোর। 'গাড়ির ছাতে নিশ্চয় রুফ র‍্যাক আছে।'

'পুলিশকে জানানো দরকার,' রবিন বলল।

'দাঁড়াও, এসেছি যখন আগে দেখে নিই চোরগুলো কোনদিকে গেল। মুসা, পিকআপটা রাস্তায় তুলে আনো, এটা দিয়েই অনুসরণ করব।'

ট্রাকটা ঝোপের আড়াল থেকে বের করে আনল মুসা। তিনজনে চড়ে বসল তাতে।

কিছুদূর এগোনোর পর ব্রেক কষল মুসা। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

পেছন থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল রবিন, 'কি হলো?'

'সামনে গাড়ি থামার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।'

নামল তিনজনে। ঝোপের ভাঙা ডাল, দোমড়ানো ঘাস, জুতোর ছাপ দেখে অনুমান করা গেল এখানে গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে নিয়ে গভীর বনের দিকে চলে গেছে চোরেরা। গাড়িটা কিছুদূর ঘুরে ভিন্নপথে ফিরে গেছে মেইন রোডের দিকে।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বনের মধ্যে ঢুকল ওরা। কিছুদূর এগোতে একটা সরু নদী পাওয়া গেল। তার পাড়ে এসে শেষ হয়ে গেছে ছাপ। নদীর তীর ধরে ধরে উজান-ভাটিতে বহুদূর এগিয়েও লোকগুলোর আর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। এর একটাই অর্থ, নৌকায় করে নিয়ে গেছে মালগুলো। কষ্ট করে নৌকাটা বয়ে এনেছে সেজন্যেই।

'অহেতুক আর বনের মধ্যে এ ভাবে ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই,' কিশোর বলল। 'চলো, ফিরে যাই।'

'রাইফেলগুলো গেল তারমানে!' বিষণ্ণ হয়ে গেল মুসা।

'এখনই এতটা হতাশ হচ্ছ কেন, খোঁজা তো বন্ধ করিনি আমরা।'

'এই যে ফিরে যাচ্ছি?'

'আবার আসব। তৈরি হয়ে। দরকার হয় চষে ফেলব সমস্ত বন।'

'অত সহজ হবে বলে মনে হয় না, কিশোর,' রবিন বলল, 'বিরাট বন। নাম কি এর?'

গাড়ির কাছে ফিরে এসে গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে ম্যাপ বের করে দেখল কিশোর। জবাব দিল রবিনের প্রশ্নের, 'ডার্ক উড!'

আঁতকে উঠল মুসা, 'খাইছে! এখানে তো ভূত থাকে! কুকুরের ভূত!'

হেসে উঠল রবিন, 'আর কি, লেজ তুলে দৌড় মারো।'

'দেখো, ইয়ার্কি নয়, ডার্ক উড জায়গাটার সত্যি সত্যি বদনাম আছে।'

'তাই বলে ভূত নেই,' ঠোঁট বাঁকাল কিশোর। 'একআধটা বুনো কুকুর দেখেছে হয়তো কেউ, বাড়ি গিয়ে গুজব ছড়িয়েছে।'

'বুনো কুকুরও কম ভয়ঙ্কর নয়। দক্ষিণের দ্বীপের কথা মনে নেই?'

'আছে, তবে এখানে সে ধরনের কুকুর থাকার প্রশ্নই ওঠে না।' হাসল কিশোর, 'ডার্ক উডের নাম শুনেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলে নাকি? রাইফেলগুলো ফেরত চাও না?'

'চাই। পুলিশকে জানাব, খুঁজে বের করুক। ওরা আছেই সেজন্যে।'

বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পিকআপ থেকে নেমে গিয়ে ফোক্স ওয়াগেনে চড়ল রবিন। কিশোর রয়ে গেল মুসার পিকআপে। একটার পেছনে আরেকটা থেকে এগিয়ে চলল দুটো গাড়ি।

কাঁচা রাস্তা থেকে বেরোনোর সময় পথের মোড়ে একটা পুলিশ ফাঁড়ি চোখে পড়ল। মুসাকে বলল কিশোর, 'রাখো, এখানেই রিপোর্ট করে যাই।'

ডেস্কে বসা সার্জেন্ট একজন লম্বা, চওড়া কাঁধওয়ালা মানুষ। গোয়েন্দাদের মুখে সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল, 'রাইফেল! ক্রিমিনালদের হাতে রাইফেল পড়াটা খুব খারাপ কথা। খোঁজ লাগাতে হচ্ছে এখনই। তোমরা বাড়ি যাও। চিন্তা কোরো না। আশা করি পেয়ে যাবে শীঘ্রি।'

ইয়ার্ডে ফিরে দেখা গেল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওদের বন্ধু বিড ওয়াকার আর টম মার্টিন। স্কুল ছুটি। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে যাওয়ার কথা আছে ওদের, ক্যাম্পিঙে। কবে যাবে জানতে এসেছে।

'কি ব্যাপার?' অবাক হয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাতে লাগল টম, 'গেছিলে কোথায়? সেই কখন থেকে এসে বসে আছি।'

'বেড়াতে যাওয়ার কি করলে?' বিড জানতে চাইল। 'তাঁবুটাবুগুলো কেনা হয়েছে?'

'কিনেই তো পড়লাম বিপদে,' গজগজ করতে লাগল মুসা।

কি হয়েছে সংক্ষেপে টম আর বিডকে জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'ভাবছি, ডার্ক উডেই যাব।'

ওখানে কেন যেতে চায় বুঝল টম। 'একটিলে দুই পাখি মারতে চাও? ক্যাম্পিংও হবে, গোয়েন্দাগিরিও।'

'সব কাজ বাদ দিয়ে হলেও রাইফেলগুলো খুঁজে বের করতে হবে। হামিদ খালুর জিনিস, বের করতে না পারলে লজ্জায় পড়ব। বলবেন, তোমরা থাকতে আমার এত দামের রাইফেলগুলো গেল।'

'তা তো বটেই। আমার আপত্তি নেই, একখানে গেলেই হলো।'

আড়চোখে মুসার দিকে তাকাল বিড, 'কিন্তু ওই বনে যে শুনেছি ভূতের ছড়াছড়ি?'

'থাকলে থাক না, আরও ভাল,' হাসল কিশোর, 'এক ঢিলে তিন পাখি মারা হবে—বেড়ানো, রাইফেল উদ্ধার এবং ভূতুড়ে কুকুরের রহস্য ভেদ।'

'আমরা যাওয়ার আগেই যদি রাইফেলগুলো উদ্ধার করে ফেলে পুলিশ?'

'তাহলে ঝাড়া হাত-পা হয়ে কুকুরের পেছনে লাগব।'

'তারমানে ডার্ক উডেই যাবে তুমি, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ,' বিড বলল। 'চলো, ওখানেই যাই, মন্দ হবে না। ক্যাম্পিঙের সঙ্গে ভূতের রহস্য, জমবে চমৎকার। তা কবে যাচ্ছি? কাল?'

'দু'তিন দিন পরে ছাড়া পারব না,' মুসা বলল। 'বাগানটা সাফ করে না দিলে মা এক পাও বেরোতে দেবে না।'

গোলাপ বাগান করেছেন মিসেস আমান মরা ডালপাতা সব ছেঁটে সাফ করতে হবে মুসাকে। গোড়ায় ঘাস জন্মেছে, সেগুলোও পরিষ্কার করতে হবে। বাগানটা বেশ বড়। সময় লাগবে তাতে।

'তাঁবুটাবুর কি হবে? আবার কেনা লাগবে তো নিশ্চয়।'

'কেনার দরকারটা কি?' পরামর্শ দিল টম, 'ভাড়া নিলেই হয়। স্লীপিং ব্যাগগুলো একটু পুরানো হবে। হোক না। সবচেয়ে কম ব্যবহার হয়েছে যেগুলো সেগুলো দেখে বেছে নেব। মুসা যা কিনে ফেলেছে, চোরের কাছ থেকে পাওয়া

গেলে কিছুটা গচ্চা দিয়ে আবার দোকানদারকে ফেরত দিয়ে দেব।'

'গচ্চাটাও আমি চোরা-ব্যাটাদের কাছ থেকে আদায় করব,' মুঠো শক্ত করে ফেলল মুসা, 'সুদে-আসলে! ধরতে পারলেই হয় একবার!'

তিন

'চোর ধরার একটা সূত্রই আছে এখন আমাদের হাতে,' কিশোর বলল, 'মানিব্যাগটা। এই টাকার টোপ দিয়েই এখন ট্রাক চোরকে টেনে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।'

তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। বিড আর টম চলে যাওয়ার পর আলোচনায় বসেছে তিনজনে।

সামনে ঝুঁকল মুসা, 'কি ভাবে?'

'পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব আমরা। বলব, একটা মানিব্যাগ সহ কিছু টাকা পাওয়া গেছে। মালিককে নিজে এসে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে সেগুলো নিয়ে যেতে অনুরোধ করব। ঠিকানা দিয়ে দেব...'

'তারপর যেই টাকা নিতে আসবে,' হেসে বলল রবিন, 'ক্যাঁক করে কলার চেপে ধরব।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া করে ফেলো।'

'কিন্তু যদি না আসে?' প্রশ্ন তুলল মুসা।

'সে সম্ভাবনাই বেশি। ট্রাক চোরের ব্যাগ হলে সে বুঝে ফেলবে তাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পেতেছি আমরা। সামনে আসবে না আর।'

'তাহলে বিজ্ঞাপন দিয়ে লাভ কি?'

'লাভ আছে। বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে আমাদের ঠিকানা জানতে পারবে সে। অনেক টাকার ব্যাপার। লোভ সামলানো কঠিন। চুরি করে নিতে আসতে পারে ব্যাগটা। আমরাও থাকব তক্কে তক্কে, ধরে ফেলার চেষ্টা করব। মোট কথা, সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে, এটাকে কাজে লাগাতে হবে।'

'যদি কাজে না লাগে?'

'একটাই উপায় থাকবে তখন, ডার্ক উডে খোঁজা। আমার বিশ্বাস, ওই বনেই কোথাও আছে চোরের ঘাঁটি।...রবিন, রেডি হলো?'

'হ্যাঁ, নাও,' এক টুকরো কাগজ কিশোরের হাতে তুলে দিল রবিন।

বিজ্ঞাপনটা দুবার করে পড়ল কিশোর। 'চমৎকার হয়েছে। চলো, এখুনি দিয়ে আসি পত্রিকার অফিসে।'

পরদিন সকালে মুসা আর রবিনকে ফোন করল কিশোর। বিজ্ঞাপনটা দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

দুজনেই দেখেছে।

এরপর অপেক্ষার পালা। সারাটা দিন বাড়িতে বসে রইল কিশোর, কেউ টাকা দাবি করতে আসে কিনা সেই অপেক্ষায়।

এল না।

বিকেলের দিকে ফোন এল পত্রিকা অফিস থেকে। করেছে ওদেরই ক্লাসের একটা ছেলে, নাম কেটি। পত্রিকা অফিসে বিজ্ঞাপন বিভাগে ক্লার্কের কাজ করে, পার্ট টাইম চাকরি। জানাল, একটা লোক একটা মেসেজ দিয়ে গেছে। কিশোরকে গিয়ে আনতে বলল সেটা।

তখুনি রওনা হলো কিশোর। ওকে দেখে একটা খাম বের করে দিল কেটি। 'নাও।'

খাম খুলে কাগজটা বের করল কিশোর। তাতে লেখা:

টাকাগুলো আমার। সুতরাং
আর কাউকে দেবে না।
—ব্ল্যাক ফগ।

'দেখতে কেমন লোকটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ওর চোখের দিকে তাকাল কেটি, 'রহস্য পেয়েছ মনে হচ্ছে?'

'জানি না। তবে মেসেজটা অদ্ভুত।'

'হুঁ। লোকটাকেও রহস্যময় মনে হয়েছে আমার কাছে। বেঁটে, গায়ের রঙ বাদামী। একটা পায়ে খুঁত আছে, টেনে টেনে হাঁটছিল। চোখে কালো কাঁচের চশমা।'

'আর কিছু লক্ষ করেছ? এমন কিছু, যেটা চোখে পড়ে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কেটি। 'চশমার ফ্রেমে সামান্য একটু ভাঙা।'

'কোন পাশের?'

'দেখো, কিশোর, আমি গোয়েন্দা নই···

'ভাল করে ভাবো, মনে হয়ে যাবে।'

এক মুহূর্ত ভাবল কেটি। 'মনে হয় বাঁ চোখের ওপরটা।'

'বললাম না মনে হবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'লোকটা আবার এলে কাকে ফোন করব, তোমাকে, না পুলিশকে?'

'আর আসবে বলে মনে হয় না!'

কাউন্টারের দিকে তাকাল কিশোর। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখল তার প্রতি কেউ আগ্রহ দেখাচ্ছে কিনা। রহস্যময় কালো চশমাওয়ালা লোকটা ওর কোন সঙ্গীকে রেখে যেতে পারে নজর রাখার জন্যে।

কেউ তাকাল না ওর দিকে। তারমানে ওখানে কেউ নেই। ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল সে।

কতগুলো পুরানো পত্রিকার গাদা সামনে নিয়ে বসে আছে এক মহিলা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তেই মাথা নিচু করে পাতা ওল্টাতে লাগল।

হুঁ, আছে! মনে মনে হাসল কিশোর। মহিলাকে যেন দেখলই না, এমন ভঙ্গি করল। কেটির কাছ থেকে উঠে এসে একটা ফোন বুদ থেকে রবিনকে ফোন করল।

মুসাকে আর করল না। বলেই দিয়েছে বাগানের কাজ শেষ না করলে বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না মা।

'কি, কিশোর?' জানতে চাইল রবিন।

'পত্রিকা অফিস থেকে বলছি,' কণ্ঠস্বর খাদে নামাল কিশোর, 'জলদি চলে এসো। একটা লোক আজব এক মেসেজ রেখে গেছে। তার এক দোস্ত নজর রেখেছে আমার ওপর। আমি বেরোলে যদি সে পিছু নেয়, তুমি তার পিছু নেবে।'

'ঠিক আছে।'

বুদ থেকে বেরিয়ে এসে আবার ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল কিশোর। বিশ মিনিট পর দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখল রবিনকে।

কেটিকে গুড বাই জানিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। সে দরজার দিকে এগোতেই উঠে দাঁড়াল মহিলা। পিছু নিল তার। মাথার হ্যাটটা অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছে কপালের ওপর।

রাস্তায় নেমে কিছুদূর এগিয়ে একটা ভিডিও ক্যাসেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ডিসপ্লে উইণ্ডোতে সাঁটা পোস্টারের ছবি দেখার ভান করল। আড়চোখে দেখল, মহিলা কি করে।

তার পেছন দিয়ে চলে গেল মহিলা। রাস্তার পাশে দোকানের সারি। একটা খাবারের দোকানে ঢুকে গেল।

কিশোর আবার হাঁটতে শুরু করতেই মহিলা যে দোকানে ঢুকেছিল সেটা থেকে বেরিয়ে এল লম্বা এক লোক। হাতে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ, সেটা দিয়ে মুখ আড়াল করে রেখেছে।

তাড়াহুড়া না করে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে চলল কিশোর। রাস্তার অন্যপাশ ধরে রবিনকে এগিয়ে আসতে দেখল। লোকটার দিকে নজর। খবরের কাগজে মুখ আড়াল করে দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিতে হাঁটছে লম্বা লোকটা, ভাব দেখাচ্ছে ডিসপ্লে উইণ্ডোতে রাখা জিনিস দেখতে দেখতে চলেছে।

গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। লোকটাও বাড়াল। কোন সন্দেহ নেই, ওকেই অনুসরণ করছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, রবিনের পিছু নিয়েছে সেই মহিলা।

মোড় নিয়ে আরেকটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল কিশোর। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। লম্বা লোকটা কিংবা মহিলা, কাউকেই মোড় পেরোতে দেখল না। গেল কোথায়?

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। ফুটপাথের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গি করে হাঁটতে লাগল যেন জিনিস হারিয়ে ফেলেছে। মোড়ের কাছে ফিরে এসে সরাসরি তাকাল খানিক আগে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

কেউ নেই! রবিন, বা লম্বা লোকটা, কিংবা মহিলা। নির্জন রাস্তাটায় কোন মানুষের ছায়াও নেই।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কিশোর। দুজনে মিলে হামলা চালাল না তো রবিনের ওপর? ধরে নিয়ে গেল না তো? এগিয়ে এসে দোকানগুলোর খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে

উঁকি দিতে লাগল। দেখা গেল না তিনজনের কাউকে। খাবারের দোকানটায় ঢুকল সে। এখানেও নেই রবিন। তবে দোকানটা থেকে বেরোতেই দেখতে পেল একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ডাকছে ওকে রবিন।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিশোর। 'কোথায় ছিলে তুমি? ওরা কোথায়?'

'তুমি মোড়ের ওদিকে চলে যেতেই এই গলিটায় ঢুকে পড়ল লোকটা। আমিও ঢুকলাম। দেখি, গায়েব। কোথায় যে ঢুকল কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'বেটা আর বেটি দুজনে একই দলের লোক।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'মনে হয়।'

রবিনকে নোটটা দেখাল কিশোর।

'ব্ল্যাক ফগ! নিশ্চয় ছদ্মনাম,' রবিন বলল। 'কিন্তু পত্রিকা অফিসে মেসেজ রেখে গেল কেন?' নিজেই সমাধান বের করল, 'চোর তো, ধরা পড়ার ভয়ে বাড়িতে গিয়ে টাকা দাবি করার সাহস পায়নি হয়তো। তাই কায়দা করে তোমাকে ডেকে এনেছে। ভেবেছে, সঙ্গে টাকাটা নিয়েই আসবে। রাস্তায় একা পেলে জোর করে কেড়ে নেবে। আমি চলে আসায় ওদের সেই উদ্দেশ্য পণ্ড হলো।'

'উঁহু! আমার তা মনে হয় না। তোমার অনুমানের মধ্যে অনেকগুলো যদি এসে যায়। আমি যে টাকাটা সঙ্গে আনব তার নিশ্চয়তা কি? টাকা আনলেও যদি আমি একা না আসি? যদি ওদের কথা বিশ্বাস না করি? যদি চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করি? টাকা কেড়ে নেয়াটা ওদের উদ্দেশ্য নয়, অন্য কোন ব্যাপার।'

'কি?'

'জানি না। হয়তো পরে বোঝা যাবে। গাড়ি এনেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'থাক ওটা যেখানে আছে। হেঁটে যাব ইয়ার্ড পর্যন্ত। পরে এক ফাঁকে আবার এসে গাড়িটা নিয়ে যেয়ো তুমি।'

হেঁটে কেন যেতে চায়, ব্যাখ্যা করল কিশোর। দেখতে চায়, আবার কেউ পিছু নেয় কিনা। যদি নেয়, ওদের পিছু নেয়ার কারণ বোঝার চেষ্টা করবে।

হাঁটতে হাঁটতে ইয়ার্ডের কাছে চলে এল দুজনে। আর কেউ পিছু নিল না।

চার

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ওঅর্কশপে এসে বসল কিশোর। কয়েক মিনিট পর এল রবিন। সে সবে ঢুকেছে ওঅর্কশপে, এই সময় মেরিচাচীর উত্তেজিত ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, দেখে যা, জলদি আয়!'

ওঅর্কশপ থেকে বেরোল দুই গোয়েন্দা। তাড়াহুড়া করে এগিয়ে গেল।

ওদের দেখেই মেরিচাচী বললেন, 'দেখ! এই চশমাটা পড়েছিল লিভিং-রুমের জানালার বাইরে। এটা আমাদের নয়। নিশ্চয় কেউ উঁকি দিয়েছিল জানালা দিয়ে।'

হাত বাড়াল কিশোর, 'দেখি?'

ফ্রেমের বাঁ চোখের ওপরে সামান্য একটু ভাঙা। চট করে রবিনের দিকে তাকিয়ে মেরিচাচীর দিকে ফিরল কিশোর। 'কারও ওপর নজর রাখছিল বোধহয়।'

'রাখলে তোর ওপর রাখবে, আর কার!' গজগজ শুরু করলেন চাচী, 'গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বাড়িটাকে তো চোর-ডাকাতের আখড়া বানিয়ে ছাড়লি দুই চাচা-ভাতিজা মিলে। তুই তো কোন কাজই করিস না, আরেকজনও সব বাদ দিয়ে এখন গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছে। কোথায় যে গেছে পাত্তা নেই, কিছু বলেও যায়নি।'

'অসুবিধে কি, বিনে পয়সায় তো আর করে না,' হেসে বলল কিশোর, 'পুরানো মাল বেচার চেয়ে বেশিই কামাচ্ছে চাচা।'

'হয়েছে, থাক, চোরের সাক্ষী বাটপাড়। এখন এই চোরটার কি করবি?' চশমাটার দিকে ইঙ্গিত করলেন চাচী।

'ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে, পালাবে কোথায়! কোন জানালাটার নিচে পেয়েছ?'

হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন চাচী।

রবিনকে নিয়ে সেদিকে এগোল কিশোর। জানালার নিচে এসে ভালমত দেখল কোন সূত্র আছে কিনা। কিছু পেল না। হেডকোয়ার্টার থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে এল রবিন। জানালার কাঁচে তাজা আঙুলের ছাপ দেখতে পেল।

'জানালাটা বন্ধ,' বলল সে, 'সুতরাং এ বাড়ির কারও ছাপ নয় এটা, লোকটারই। ছবি তুলে ফেলা দরকার।'

আবার গিয়ে ক্যামেরা আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে এল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাপগুলোর ছবি তুলে ফেলল। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল দুজনে। কিশোর গিয়ে তার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল। রবিন ঢুকে গেল ল্যাবরেটরিতে। আঙুলের ছাপের একটা কপি নিয়ে বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পর।

কিশোর বলল, 'চলো, ক্যাপ্টেনকে গিয়ে দেখাই। কার ছাপ জানা যাবে।'

থানায় এসে ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে সব জানাল ওরা। ছবিটা দেখাল।

কিন্তু পুলিশের রেকর্ডে নেই ওই ছাপ। সুতরাং কার ওটা, জানা গেল না।

ইয়ার্ডে ফেরার পর হঠাৎ মনে পড়ল কিশোরের, চশমাটায় কারও ছাপ আছে কিনা সেটা দেখা হয়নি।

তবে দেখে কোন লাভ হলো না। কাঁচের গায়ে ছাপ পাওয়া গেল বটে, সেটা মেরিচাচীর, আর কারও নেই।

সেদিন গোটা চারেক চিঠি এল কিশোরের নামে। ওঅর্কশপে বসে সে আর রবিন মিলে খুলল সেগুলো। মুসা আসেনি, বাগানের কাজ শেষ হয়নি ওর।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে চিঠিগুলো লিখেছে চারজন লোক। মানিব্যাগ সহ টাকা হারিয়েছে ওদের। তবে খুব সামান্য টাকা। দু'চার-পাঁচশোর বেশি না কারোরই।

'নাহ্,' রবিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে, 'এদের কারও নয়।'

'তারমানে চোরেরই?'

'আর কোন সন্দেহ আছে?'

'না। কি করবে এখন চোরটা, বলো তো? টাকাগুলো এখান থেকে চুরি করে নিতে আসবে?'

'আসবে কি, আসা তো আরম্ভই হয়ে গেছে। দেখছ না, গোপনে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। ব্যাগটা দেখলেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'মনে হচ্ছে ছ্যাঁচড়া চোর। নইলে এত কম টাকা নিতে আসার ঝুঁকি নিত না।'

'দেখো, আবার কোন কুবুদ্ধি আছে মনে! সাবধানে থাকতে হবে। কখন কোনটা চুরি করে নিয়ে যায়, কে জানে।'

আপাতত কোন কাজ নেই। অহেতুক বসে থাকতে ভাল লাগল না রবিনের। বলল, 'চলো, মুসাদের বাড়িতে যাই।'

'গেলে মন্দ হয় না। তুমি রওনা হয়ে যাও। চাচীর ঘড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে, কদিন ধরে বলছে সেরে দিতে, সময় পাই না। যাও তুমি, আমার আধঘণ্টার বেশি লাগবে না।'

ঠিক তিরিশ মিনিটের মধ্যেই মেরামত হয়ে গেল ঘড়িটা। বেরিয়ে পড়ল কিশোর। হেঁটে রওনা হলো মুসাদের বাড়িতে রাস্তাটা নির্জন। বড় বড় গাছ প্রায় অন্ধকার করে রেখেছে। সূর্য ডুবতে দেরি নেই। গাছের পাতায় শিরশিরানি তুলে বয়ে গেল একঝলক বাতাস।

রহস্যময় চিঠিটার কথা ভাবতে ভাবতে চলল সে। ব্ল্যাক ফগ! কে এই লোক? চোরের দলের সর্দার?

কিছুদূর এসে আরেকটা সরু কাঁচা রাস্তায় নামল সে। দু'ধারে ঝোপঝাড়, বড় গাছও আছে, জংলা। এটা দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে। চেনা পথ, তাই কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই তাতে নেমে এল কিশোর।

কয়েক পা এগোনোর পর একটা খসখস শব্দ কানে এল। ঘুরে তাকাতে গেল, কিন্তু তার আগেই প্রায় উড়ে এল একটা কালো শরীর, অন্ধকারে চেনা গেল না। ওকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। চিৎকার করার আগেই ওর মুখে রুমাল গুঁজে দেয়া হলো। মাটিতে কপাল ঠুকে যাওয়ায় বোঁ বোঁ করতে লাগল মাথা। ভারি একটা শরীর চেপে আছে পিঠের ওপর। নড়তে পারছে না সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আরেকটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

দড়ি দিয়ে ওর হাত-পা বেঁধে ফেলতে শুরু করল লোকগুলো। ওদের কথা থেকে বুঝল, তুলে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে। বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারবে না, সেটা তো বুঝেই গেছে। হাত বাঁধার আগেই এক ফাঁকে লোকগুলোর অলক্ষ্যে কোনমতে পকেট থেকে রুমালটা বের করে ফেলে দিল সে।

'ব্যস, হয়েছে,' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল দড়ি নিয়ে এসেছে যে, সেই লোকটা। 'ধরো, তোলো ওকে।'

ধরাধরি করে কিশোরকে বয়ে এনে একটা গাড়ির পেছনের মেঝেতে ফেলল ওরা।

পাঁচ

দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন কিশোর পৌঁছল না মুসাদের বাড়িতে, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রবিন। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আর থাকতে পারল না, ফোন করল ইয়ার্ডে। মেরিচাচী জানালেন, দেড়ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছে কিশোর।

ভয় পেয়ে গেল রবিন। নিশ্চয় কিশোরের কিছু হয়েছে, বিপদে পড়েছে সে, নইলে কোন খোঁজ-খবর না দিয়ে এ ভাবে দেরি করত না।

'চলো, দেখে আসি,' মুসা বলল।

মুসাদের বাড়িতে হেঁটে গেলে সাধারণত কোন পথে যায় কিশোর, জানা আছে ওদের। কাঁচা রাস্তাটার মুখে এসে গাড়ি থামাল রবিন। আগে নামল মুসা। হেডলাইটের আলোয় মাটির দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, 'রবিন, দেখে যাও, আরেকটা গাড়ি!'

বালিতে চাকার দাগ পড়েছে। পথটা ধরে কয়েক গজ এগোতে চোখে পড়ল কয়েক জোড়া জুতোর ছাপ। মাটিতে ধস্তাধস্তি হয়েছে, সেই চিহ্নও আছে। পথের পাশে পড়ে থাকা কিশোরের রুমালটা দেখতে পেল রবিন। একসঙ্গে কয়েকটা চিত্র ফুটে উঠল ওর মনের পর্দায়। সেদিন পত্রিকা অফিস থেকে বেরোনোর পর কিশোরের পেছনে লোক লাগা, রাতের বেলা ইয়ার্ডে এসে উঁকি মারা; এ সবের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে এখন। কিশোরের বলা কথাটা কানে বাজতে লাগল—দেখো, আবার কোন কুবুদ্ধি আছে মনে! মিলে যাচ্ছে।

'কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে!'

'কি করি, বলো তো?' কেঁপে উঠল মুসার গলা।

'পুলিশকে জানাতে হবে।'

'আগে বরং রাশেদ আংকেলকে বলি, চলো। তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

'আমি বেরিয়ে আসার সময় তো দেখলাম নেই। ফিরেছেন কিনা কে জানে।'

'চলো, গিয়ে তো দেখি। তিনি না থাকলে মেরিআন্টিকে কিছু বলা যাবে না। অস্থির হয়ে যাবেন।'

ইয়ার্ডে এসে রাশেদ পাশার অফিসে আলো দেখতে পেল ওরা। গাড়ি রেখে নেমে দৌড় দিল।

কয়েক মিনিট আগে ফিরেছেন তিনি। মুসা আর রবিনকে ওরকম উত্তেজিত দেখে ভুরু কোঁচকালেন, 'কি হয়েছে?'

খুলে বলল দুই গোয়েন্দা।

গম্ভীর হয়ে গেলেন রাশেদ পাশা।

এই সময় বাজল টেলিফোন। রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। ওপাশ থেকে বলল একটা ভোঁতা কণ্ঠ, 'ব্ল্যাক ফগ বলছি। আপনার ভাতিজা এখন আমাদের কাছে। জ্যান্ত ফিরে পেতে চাইলে দশ হাজার ডলার পাঠাবেন, একশো ডলারের

নোট, সব পুরানো। সেই সঙ্গে আরও দুই হাজার, যেগুলো খোয়া গেছে আমার পকেট থেকে, আপনার ভাতিজা পুলিশের কাছে জমা দিয়েছে।'

শক্ত হয়ে গেল রাশেদ পাশার চোয়াল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিডন্যাপারের শাস্তি কি জানো?'

'পুলিশকে কিছু জানাবেন না,' শান্ত রইল ওপাশের কণ্ঠটা। 'তাহলে আর দেখতে পাবেন না ভাতিজাকে।'

'ওকে ছেড়ে দাও,' চাবুকের মত হিসিয়ে উঠল রাশেদ পাশার কণ্ঠ।

'টাকা লাগবে।'

একটা মুহূর্ত চিন্তা করলেন রাশেদ পাশা। তাঁর ধমকে কাজ হয়নি। 'কোথায় দিতে হবে টাকা?'

'কাল সকালে জানতে পারবেন। সব টাকা রেডি রাখবেন সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে।'

কেটে গেল লাইন।

মুসা আর রবিনকে চিন্তা করতে মানা ক.র রাশেদ পাশা বললেন, 'তোমরা বাড়ি যাও। এ কথা গোপন রাখবে। কিডন্যাপারদের কোন বিশ্বাস নেই। ফাঁস হয়ে গেলে কি করে বসবে কে জানে।'

রাতে ভাল ঘুম হলো না দুজনের। সকাল হতেই ছুটে চলে এল ইয়ার্ডে। রান্নাঘরের টেবিলে একটা চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মেরিচাচী। ভীষণ গম্ভীর। তাঁর সামনে যাওয়ার সাহস করল না মুসা বা রবিন। রাশেদ পাশার সঙ্গে দেখা করল লিভিং-রুমে।

'কোন খবর আছে, আংকেল?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা নাড়লেন রাশেদ পাশা।

আটটা নাগাদ পোস্ট অফিসের পিয়ন এল। হাতে একটা খাঁচা, তেরপলে মোড়া। ভেতরে খচমচ করে উঠল জীবন্ত কিছু।

'কে পাঠাল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

খাঁচায় লাগানো লেবেল দেখল পিয়ন। 'ক্লাইভ বাউডেন।' খাতা বাড়িয়ে দিল। জিনিস বুঝে পেয়েছে যে, সেটা লিখে সই করে দিতে হবে।

পিয়নের খাতায় সই করে দিল রবিন। খাঁচাটা তুলে নিল মুসা। লিভিং-রুমে ঢুকল দুজনে। রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন মেরিচাচী। খাঁচার দিকে তাকিয়ে কুঁচকে গেল ভুরু, 'এটা কি?'

তেরপল সরালেন রাশেদ পাশা। ভেতরে দুটো কবুতর। পায়ে ব্যাণ্ড পরানো।

'হোমিং পিজিয়ন!' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল মুসা আর রবিন।

গম্ভীর হয়ে গেছেন রাশেদ পাশা, 'ভীষণ চালাক। কবুতরের পায়ে বেঁধে দিতে হবে টাকা। সেজন্যেই একশো ডলারের নোট চেয়েছে, যাতে ওজন কম হয়। ওগুলো সোজা উড়ে চলে যাবে বাড়িতে। কোনখানে গেল কিছুই বুঝতে পারব না আমরা।'

'খাঁচা পার্সেল করার সময় নাম তো দিয়েছে,' রবিনের দিকে ফিরল মুসা। 'রবিন, কি যেন নাম?'

'ক্লাইভ বাউড়েন। তবে আমার মনে হয় না ওটা দিয়ে কোন কাজ হবে। নিশ্চয় ছদ্মনাম।'

ছয়

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল কিশোরের। দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজল। আটটা। অন্ধকার ঘরে পড়ে থেকে কান পেতে শুনল। এখন সকাল, নাকি সন্ধ্যা? কিছু বুঝতে পারল না, কারণ দেখতে পাচ্ছে না, চোখে বাঁধা রয়েছে একটা কাপড়।

নড়ার চেষ্টা করল। পারল না। বড় শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। গোড়ালি একসঙ্গে করে বেঁধেছে, দুই হাত মুচড়ে পিঠের ওপর নিয়ে গিয়ে কব্জি বেঁধেছে। মুখে রুমাল গোঁজা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে কি ঘটেছিল মনে পড়ল। ভোঁতা খসখসে একটা কণ্ঠ বলেছে, 'সাবধানে রাখো। এর দাম এখন দশ হাজার ডলার।'

তাকে গাড়িতে তোলার পর অনেক পথ চলেছে গাড়ি, তারপর থেমেছে। আবার তাকে বয়ে এনে ঢোকানো হয়েছে একটা ঘরে। বাহুতে সুচ ফুটানোর ব্যথা অনুভব করেছে সে। শেষ কথাটা কানে বাজছে এখনও, 'দিলাম বন্ধ করে ছটফটানি।'

তারপর সবকিছু অন্ধকার।

অন্ধকারে কতক্ষণ পড়েছিল বুঝতে পারল না সে। টনটন করছে বাঁধা জায়গাগুলো। কয় ঘণ্টা ধরে পড়ে আছে এখানে? কিংবা কয়দিন?

গায়ের সব জোর একত্র করে গড়াতে শুরু করল সে। গড়াতে গড়াতে চলে এল দেয়ালের কাছে। ঘষে ঘষে চোখের ওপর থেকে সরাল কপালে পেঁচানো কাপড়টা। আলো চোখে পড়ল। অনেক ওপরের একটা ময়লা জানালা দিয়ে আসছে। সেলারে রয়েছে সে, বুঝতে পারল, মাটির নিচের ঘরে।

ওর কাছেই মাটিতে পড়ে আছে ভাঙা লোহার পাইপের একটা টুকরো। ওটার কাছে হাত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল। কনুই আর হাতের চামড়া নানা জায়গায় ছড়ে গেল। পরোয়া করল না। পাইপের গোল ধারাল কিনারটায় ঠেকাল দড়ি।

ঘষতে যেতেই গড়িয়ে সরে গেল পাইপটা। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে ওটাকে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরে আবার দড়ি চেপে ধরল ধারাল কিনারটায়। মরচে পড়া লোহায় ঘষা লেগে কেটে গেল হাতের চামড়া, রক্ত বেরোতে লাগল, কিন্তু ঘষা বন্ধ করল না। বাহুতে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো, ঘামতে লাগল দরদর করে, কিন্তু থামল না সে।

অবশেষে দড়ির অনেকখানি কেটে গেল। টেনেটুনে ছিঁড়ে ফেলল বাকিটুকু।

হাত মুক্ত করে প্রথমেই খুলে ফেলল মুখে গোঁজা রুমাল। তারপর গোড়ালির বাঁধন। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে ঝিঁঝি করে উঠল পা, ধপ করে বসে পড়ল

আবার। কয়েকবার ঝাড়াঝুড়া দিয়ে আবার উঠল।

কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও। ডাকাতগুলো কি আছে ওপরতলায়?

বাইরে বেরোনোর কোন দরজা কিংবা ট্র্যাপডোর চোখে পড়ল না। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না জানালাটার। লাফিয়ে উঠে কিনার ধরে ঝুলে পড়ল। টেনেটুনে ওপরে তুলে আনল শরীরটা। মাথা গলিয়ে দিল। দুপাশে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই।

সরু জানালার ফোকর দিয়ে বেরোনোও আরেক মুশকিল। দেয়ালে পা বাধিয়ে ঠেলতে লাগল, শরীর মুচড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে বের করে আনতে লাগল জানালার বাইরে।

শরীর অর্ধেক বেরিয়ে আসার পর জানালার নিচের দিকের কিনার শক্ত করে চেপে ধরে টান দিয়ে বের করে আনল পা। জানালার হাত দুয়েক নিচে মাটি। প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পড়ল তার ওপর। এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

খানিক দূরে একটা খামারবাড়ি। পুরানো ভাঙাচোরা জানালার খড়খড়ি ঝুলে আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে। সামনের দরজার প া কাত হয়ে ঝুলছে একটিমাত্র কজার ওপর ভর করে। লোকজন কেউ আছে বলে মনে হলো না।

আশপাশে কি আছে দেখতে লাগল সে। উত্তরে একটা পর্বত, ঢালে গভীর বন, চূড়ার কাছে বরফ জমে আছে। চিনতে পারল পর্বতটা। অনুমান করল, মুসার পিকআপটা খুঁজতে এদিকেই এসেছিল সেদিন ওরা, রাস্তাটা কোনদিকে আছে তাও আন্দাজ করতে পারল।

তার অনুমান ঠিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন পেরিয়ে এসে রাস্তায় উঠল। মাইলখানেক দূরে আরেকটা খামারবাড়ি আছে, সেদিনই দেখে গেছে। ওষুধের প্রতিক্রিয়া আর খিদের কারণে মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর টলছে। কিন্তু হাঁটা থামাল না সে, কোনমতে একের পর এক পা ফেলে সামনে এগিয়ে চলল।

জানালা দিয়ে দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েছে চাষীর বউ। ওর টলোমলো পা ফেলা দেখে সন্দেহ করেছে। কাছে আসতে দরজা খুলে বেরোল। 'কি হয়েছে তোমার?'

'একটা টেলিফোন করা যাবে?'

'যাবে। এসো।'

ঘরে ঢুকে ম্যানটেলপিসে রাখা ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল কিশোরের, আটটা পঁচিশ বাজে। এতক্ষণে খেয়াল করল, ওর ঘড়িটা নেই হাতে। হয়তো দড়ি খোলার সময় ঘষা লেগে ব্যাণ্ড ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কিংবা হয়তো আগেই খুলে নিয়ে গেছে কিডন্যাপাররা।

বাড়িতে ফোন করল সে। ধরলেন রাশেদ পাশা। কিশোরের গলা চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিশোর, তুই? কোথায় আছিস?'

'শিপরিজে। ডার্ক উডের কাছে রাস্তার ধারের একটা খামার বাড়িতে। মুসা আর রবিন চেনে জায়গাটা, ওদের পাঠিয়ে দাও।'

'তারমানে পালিয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'ধরে রাখ! আসছি!'

রাশেদ পাশার চিৎকার শুনতে পেল কিশোর, 'অ্যাই, ছেড়ো না, ছেড়ো না!' ফিরে এসে আবার রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই ভাল আছিস তো, কিশোর?'

'আছি, চাচা। বাড়ি এসে সব বলব। তুমি মুসা আর রবিনকে পাঠাও। রাখি?'

ফোন রেখে পয়সা দেয়ার জন্যে পকেটে হাত দিল কিশোর। মানিব্যাগটা আছে, নেয়নি কিডন্যাপাররা। ঘড়িটাও হয়তো নেয়নি ওরা, ঘষা লেগেই পড়েছে। কলের দাম মিটিয়ে দিল মহিলাকে।

ওর অবস্থা দেখে অনেক কিছু আঁচ করে নিল মহিলা। জোর করে ধরে এনে বসাল রান্নাঘরের টেবিলে। রুটি আর দুধ এনে দিল। খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর। দেখতে দেখতে সাবাড় করে দিল সব। দুর্বলতা আর মাথা ঝিমঝিম করা কেটে গেল।

সে অনেকটা সুস্থ হওয়ার পর মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হয়েছিল কি? বনের মধ্যে পথ হারিয়েছিলে?'

কিডন্যাপ করা হয়েছিল ওকে, এ কথাটা বলতে গিয়েও বলল না কিশোর। মাথা ঝাঁকাল কেবল। 'এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে বনের মধ্যে একটা খামারবাড়ি আছে। লোকজন নেই নাকি?'

'নরিস ফার্মের কথা বলছ? দেখে এসেছ বুঝি। না, নেই। বাড়ির মালিক দুই বুড়ো-বুড়ি মরে যাওয়ার পর খালিই পড়ে আছে বাড়িটা, কেউ থাকতে যায় না।'

'কেউ না?'

'না,' হাসল মহিলা। 'কে আসবে ওই ধসে পড়া ডাইনির খোঁয়াড়ে থাকতে।'

'ভবঘুরে? কিংবা চোর-ডাকাত, যারা পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চায়?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে মহিলা বলল, 'ওরকম কেউ থাকতে চাইলেও থাকতে দিতাম না। এ গাঁয়ে কোন খারাপ লোককে সহ্য করি না আমরা।'

কেউ থাকে না বলেই ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওই বাড়িতে আটকে রেখেছিল কিডন্যাপাররা, বুঝতে পারল কিশোর। ওরা নিজেরাও থাকে না ওখানে। খাবারের দাম দিতে চাইল। নিল না মহিলা। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল সে। এখানে বসে থাকলে পারত, কিন্তু থাকতে ইচ্ছে করছে না, রওনা হলো শিপরিজের দিকে। কিছুদূর এগিয়ে রাস্তার ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

ইয়ার্ডের পিকআপে করে রাশেদ পাশা নিজেই এলেন। সঙ্গে রবিন আর মুসা। কিশোরকে তুলে নিয়ে ফিরে চললেন বাড়িতে।

কি করে বন্দি হয়েছিল সে, খুলে বলল কিশোর।

তাকে জানানো হলো, মুক্তিপণ দাবি করেছিল কিডন্যাপাররা।

'ফোন করতে তুই আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি করলেই কবুতরগুলোকে ছেড়ে দেয়া হত,' রাশেদ পাশা বললেন। 'সময় মত আটকানো গেছে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'রবিন, কি বলেছিলাম, শুধু দু'হাজার টাকা নয়, আরও কোন কুমতলব আছে ব্যাটাদের। পত্রিকা অফিস থেকে বেরোনোর পর

সেদিনই আমাকে কিডন্যাপের চেষ্টা করত, তুমি সঙ্গে ছিলে বলে সাহস করে উঠতে পারেনি। পত্রিকা অফিসে মেসেজ পাঠানোর একটাই কারণ, আমাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া। সেটা যখন ব্যর্থ হলো, রাতে বাড়িতেই চলে এল দেখার জন্যে আমাকে বাগে পাওয়া যায় কিনা। তাও যখন সফল হলো না, মুসাদের বাড়িতে যাওয়ার পথে পাকড়াও করল আমাকে।'

'যা বুঝতে পারছি, ওরা শুধু চোরই নয়, পেশাদার কিডন্যাপারও। তোমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ওদের, টাকা আদায় করা। টাকা দিতে পারবে, এমন মক্কেলকেই কেবল কিডন্যাপ করে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তোমার কাছে কাউকে পাহারা রাখল না কেন ওরা, বুঝলাম না।'

'ইঞ্জেকশন দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছে। ভেবেছে কয়েক ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে তো থাকবই, পাহারা আর লাগবে না।'

কিশোরকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে দেখে শান্ত হলেন মেরিচাচী। তবে চাচা-ভাতিজাকে বকা দিতে ছাড়লেন না। আগাম হুমকি দিয়ে রাখলেন, এরপর যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তো বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

সাত

শিপরিজ থেকে ফেরার পথেই থানা হয়ে ঘুরে এসেছে গোয়েন্দারা। কিডন্যাপের খবরটা ইয়ান ফ্লেচারকে দিয়ে এসেছে। দুপুর নাগাদ ফোন করে জানালেন তিনি, বাড়িটাতে নজর রাখা হচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখা যায়নি এ যাবৎ।

'এক কাজ করলে কেমন হয়? কবুতরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে পারি, কোথায় যায়,' ওঅর্কশপের বেড়ায় হেলান দিল রবিন। বাড়ি যায়নি সে। দুপুরে কিশোরদের বাড়িতে খেয়েছে।

মুসা চলে গেছে, বাগানের কাজ শেষ হয়নি তার। তাড়াহুড়া করছে। শেষ না করলে বেরোতে দেবেন না মা, পিকনিকে যাওয়া আটকে থাকবে।

'আমিও এই কথাটাই ভাবছি,' বলল কিশোর। 'কিন্তু ছেড়ে দিয়ে পিছু নেব কিভাবে?'

'প্লেনে করে।'

ঝট করে মুখ তুলল কিশোর। তুড়ি বাজাল, 'ঠিক বলেছ। ল্যারি কংকলিনের সাহায্য দরকার।'

রিসিভার তুলে গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের বাড়িতে ডায়াল করল সে। বাড়িতেই পাওয়া গেল তাঁকে। ফোনে সব কথা বলতে পারল না কিশোর। সংক্ষেপে যতটা পারল বলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে প্লেনটা চাইল।

তিনি ওদেরকে বিমান বন্দরে চলে যেতে বললেন। ল্যারিকে ফোন করে বলে দেবেন, অসুবিধে হবে না।

পনেরো মিনিটের মধ্যে কবুতর দুটোকে ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুজনে।

দুই গোয়েন্দাকে দেখে হেসে এগিয়ে এল ল্যারি, 'এসো। প্লেন রেডি। কোথায় যেতে হবে?'

খাঁচাটা দেখাল কিশোর, 'এরা যেখানে নিয়ে যায়।'

কাজটা কি, শুনে হেসে উঠল ল্যারি, 'বাহ্, পাখিকে অনুসরণ! চমৎকার!'

'অসুবিধে হবে?'

'মোটেও না। বরং নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা।'

হাজার ফুট ওপরে উঠে একটা কবুতরকে ছেড়ে দিল কিশোর। ডাইভ দিয়ে কয়েক ফুট নেমে গেল ওটা, বড় একটা চক্কর দিল, তারপর সোজা উড়ে চলল। পেছনে চলল ল্যারি। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ওটার ওপর নজর রাখল রবিন।

ঘণ্টাখানেক ওড়ার পর ল্যারি বলল, 'এ তো দেখি থামে না। যাবে কোথায়!'

'সেটাই তো জানতে চাই,' জবাব দিল কিশোর।

'অনেক দূর থেকে কবুতরগুলো পাঠিয়েছে ব্যাটারা। ঈশ্বরই জানেন, তেলে হবে কিনা।'

'কেন, নেননি?'

'ট্যাংকে যা ছিল তাই নিয়ে উঠে পড়েছি। এতদূর যেতে হবে কল্পনাও করিনি।'

আরও বিশ মিনিট পর ল্যারি বলল, 'নাহ্, আর পারা যাবে না। এখন না ফিরলে এয়ারপোর্টেই পৌঁছতে পারব না।'

বিমান বন্দরে নামার পর রবিন বলল, 'কিশোর, আরেকটা কবুতর তো আছে, ওটা ছেড়ে দিয়ে দেখব?'

'না, আজ আর সময় নেই। পরে দেখা যাবে।'

'আমি খুব দুঃখিত, কিশোর,' ল্যারি বলল। 'আমার বোকামির জন্যে কাজটা হলো না তোমাদের।'

'আরে না না, বোকামি কিসের। আমরাও কি আর জানতাম নাকি এতদূর থেকে কবুতর পাঠিয়েছে ওরা।'

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে বলল রবিন, 'এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কি করা যায়?'

'চলো, মিস্টার সাইমনের বাড়ি চলে যাই। কি হলো জানার জন্যে নিশ্চয় অস্থির হয়ে আছেন তিনি।'

'তাই চলো।'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ভিকটর সাইমনের বাড়ি এল দুজনে। ওদের অপেক্ষায়ই ছিলেন তিনি। মুসার ট্রাকটা চুরি যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব তাঁকে বলল কিশোর।

চিন্তিত মনে হলো তাঁকে। 'মনে হচ্ছে আমি এখন যে কেসটা নিয়ে কাজ করছি, তার সঙ্গে কোথাও একটা সম্পর্ক আছে তোমাদেরটার।'

'আপনার কেসটা কি?'

'ব্যাপারটা যদিও টপ সিক্রেট, তবে তোমাদের বলা যায়। এর মধ্যে বিদেশী

দেশ জড়িত।'

টাকা চুরির গল্প শোনালেন সাইমন। প্রচুর আমেরিকান নোট চুরি যাচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক আর ট্রেজারি থেকে। তাঁর ধারণা, সাংঘাতিক কোন প্ল্যান করেছে কোন দুষ্টচক্র। কোন বড় ধরনের কাজে ব্যবহার করা হবে এই টাকা। তবে কাজটা বড় হলেও মহৎ নয়, বরং খুব খারাপ কোন কিছু।

উত্তেজনা বোধ করছে রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা কি, জানেন না নিশ্চয়?'

'না।'

'সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে এই টাকা?' জানতে চাইল কিশোর।

'তা-ও জানি না।'

'নিলে বোট কিংবা প্লেনে করেই নেয়া হবে, তাই না?'

'সম্ভবত।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। ওরা যে দু'হাজার ডলার কুড়িয়ে পেয়েছে, তার সঙ্গে এই কেসের সম্পর্ক নেই তো? যেহেতু চোরের কাছে ছিল, ওগুলোও কোন ব্যাংক বা ট্রেজারি থেকে চু়়রি করা হতে পারে।

সাইমনের দিকে তাকাল রবিন, 'আপনার ধারণা একই কেসে কাজ করছি আমরা?'

'শিওর হওয়া দরকার। নোটগুলো কোথায়?' জানতে চাইলেন সাইমন, 'আছে সঙ্গে?'

'না, কেউ তো আর এল না নিতে। থানায় জমা দিয়ে দিয়েছি,' বলল কিশোর।

'দেখলে বলতে পারতাম। চুরি যাওয়া নোটের সিরিয়াল নম্বর আছে আমার কাছে।'

'যাবেন নাকি একবার ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে?'

ভেবে নিলেন সাইমন। 'চলো, দেখেই আসি। বলা যায় না কোনটা থেকে কি বেরিয়ে আসে।'

সাইমনকে দেখে খুশি হলেন ক্যাপ্টেন। আসার কারণ জানাল কিশোর।

আলমারি খুলে নোটগুলো বের করে দিলেন ইয়ান ফ্লেচার।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেন, মুসার চোরাই মালের কোন খবর আছে?'

চেয়ারে হেলান দিলেন ক্যাপ্টেন, 'না, এখনও নেই। ওই এলাকায় ওগুলো আছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না। শিপরিজ ফাঁড়ির ডিউটি অফিসার দুজন পুলিশম্যানকে পাঠিয়েছিল। বনের ভেতরে খোঁজাখুঁজি করে এসেছে। কোন হদিস করতে পারেনি।'

নোটগুলো উল্টেপাল্টে দেখে ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন সাইমন, 'নিন। হয়েছে।'

'কিছু বুঝলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন।

কি বুঝেছেন ডিটেকটিভ, শোনার অপেক্ষায় রইলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু আর কিছু বললেন না সাইমন। বলতে চান না বুঝে ইয়ান ফ্লেচারও চাপাচাপি করলেন না।

বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আমাদেরকেও বলবেন না?'

'বলব,' গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন সাইমন, 'ওর মধ্যে একটা একশো ডলারের নোট আছে, নম্বর মেলে। আর কোন সন্দেহ নেই, ট্রাক চোর এবং ট্রেজারির টাকা চোর একই দলের লোক।'

আট

রাতে খাবার টেবিলে চাচাকে সব কথা জানাল কিশোর।

'হুঁ,' মাথা দুলিয়ে বললেন রাশেদ পাশা, 'এখন কি করতে চাস?'

'ডার্ক উডে যাব। মুসার পিকআপটা ওই বনে নিয়ে গিয়েছিল, আমাকেও ওখানে আটকে রেখেছিল। চোরের সন্ধান ওখানেই পাওয়া যাবে।'

রান্নাঘর থেকে খাবারের ট্রে নিয়ে ঢোকার সময় ডার্ক উড নামটা কানে গেল মেরিচাচীর। 'কোথায় যাবি বললি?'

হাসল কিশোর, 'ডার্ক উড।'

'মারা পড়বি। বুনো কুকুর আছে ওখানে।'

'ও তো গুজব।'

'গুজবের পেছনেও কিছু না কিছু সত্য থাকে।'

'ওখানে বুনো কুকুর আসবে কোত্থেকে?'

'গভীর বন, যে কোন বুনো জানোয়ার বাস করতে পারে। অবাক হওয়ার কি আছে?'

'আছে। সব বনে সব জানোয়ার থাকে না। এই যেমন আমেরিকায় হাতি নেই; গণ্ডার নেই, সিংহ নেই; আবার আফ্রিকায় পুমা নেই...'

'তোর তো খালি সব কিছুতেই যুক্তি আর যুক্তি।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে, সব বনে সব জানোয়ার বাস করে না,' ভাতিজার পক্ষ নিলেন রাশেদ পাশা। 'ডার্ক উডে বুনো কুকুর থাকার কথাটা ইদানীং শোনা যাচ্ছে। আগে ছিল না। এমন হতে পারে, কোন কারণে মানুষকে বনে ঢোকা থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে ওই গুজব ছড়িয়েছে কেউ।'

'তাহলে তো বনটা আরও বিপজ্জনক,' মেরিচাচী বললেন। 'দুষ্ট মানুষ বুনো কুকুরের চেয়ে অনেক খারাপ।'

'খামাখাই ভয় পাচ্ছ তুমি, চাচী,' কিশোর বলল, 'আমাদের কিচ্ছু হবে না। যাচ্ছি তো পিকনিক করতে, কেউ আমাদের দিকে নজরই দেবে না।'

পরদিন খুব ভোরে এসে ইয়ার্ডে হাজির হলো রবিন, মুসা, টম আর বিড। কিশোর তৈরি হয়েই আছে। মুসার ভটভটিতে করে রওনা হলো ওরা। বিড, টম, রবিন—তিনজনেরই গাড়ি আছে। বিডেরটা তো প্রায় নতুন। তবু কেন যেন মুসার এই পুরানো জেলপিটাই সবার পছন্দ। বিকট আওয়াজে থমকে দাঁড়ায় পথচারী, পথ ছেড়ে দেয় সামনের গাড়ি, এ সবে মজা পায় ওরা।

শিপরিজ পেরোনোর পর মুসাকে বলল কিশোর, 'ওই খামারবাড়িটাতে রাখো।

গাড়ি রেখে হেঁটে যাব।'

সেলার থেকে বেরিয়ে আসার পর সেদিন যেখান থেকে ফোন করেছিল সে, এটা সেই খামারবাড়ি। স্বাগত জানাল ওদেরকে মহিলা। খুশি হয়েই গ্যারেজ ভাড়া দিল ওদের কাছে। গ্যারেজ মানে একটা গোলাঘর। তাতে গাড়ি ঢুকিয়ে রাখল মুসা। পাম্পের কল থেকে ঠাণ্ডা পানি খেয়ে নিল সবাই। দল বেঁধে রওনা হলো ডার্ক উডে।

যে বাড়িটাতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল কিশোরকে, সেটার পাশ দিয়ে গেছে পথ। বন্ধুদের ওটা দেখাল সে। গা ছমছম করে উঠল। যদি সেদিন বেরোতে না পারত? কিডন্যাপাররা না বললে কেউ জানতেই পারত না ওখানে আছে সে। ওকে কি মরার জন্যে ফেলে গিয়েছিল ওরা? মুক্তিপণের টাকা পাওয়ার পর কি সত্যি ছাড়ত?

আরও মাইলখানেক হাঁটার পর গভীর বনে ঢুকল ওরা। সেই সরু নদীটার কিনারে এসে থামল। কোনদিকে যাবে? সামনে উজানের দিকে ঘন বন, মাইলের পর মাইল বিছিয়ে রয়েছে বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়। লোকালয়ের চিহ্নও নেই।

'কোন দিকে গেছে ব্যাটারা কে জ .ন?' বনের দিকে তাকিয়ে আছে বিড।

নদীর উজান-ভাটি দুদিকেই তাকাচ্ছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ আঙুল সরিয়ে বলল, 'উজানে যাব।'

'উজানে কেন?' অবাক হলো বিড। 'নৌকায় করে মাল নিয়ে গেলে ভাটির দিকে যেতেই তো সুবিধে।'

'কিন্তু ওদের আস্তানা যদি উজানের দিকে হয়ে থাকে? ভাল করে দেখো, ওপরের দিকটায় পর্বতের ঢাল আছে, বনও অনেক গভীর, ভাটির দিকে পাতলা। ঘন বন আর পাহাড়ের গুহায় লুকানোর সুবিধে বেশি, লোকজনও সহজে যেতে চায় না। সুতরাং অপরাধীরা ওদিকেই ঘাঁটি করতে চাইবে। নাকি কোন সন্দেহ আছে?'

কিশোরের যুক্তি খণ্ডন করতে পারল না কেউ। অতএব প্রতিবাদ না করে সে যেদিকে বলল, সেদিকেই হেঁটে চলল।

আগে আগে চলেছে কিশোর আর মুসা। পেছনে রবিন। সবার পেছনে টম আর বিড। তার রেডিওটা অন করে রেখেছে টম, গান শুনতে শুনতে আসছে। নদীর ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। পানির কিনারে নরম কাদায় একটা গভীর দাগ হয়ে আছে। হিঁচড়ানোর দাগ। আশপাশে জুতোর ছাপও রয়েছে।

হাত তুলল সে। সবাইকে থামতে ইশারা করল।

মুসা এসে দাঁড়াল পাশে। 'কি দেখলে?'

নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

সবাই দেখল দাগগুলো।

রবিন বলল, 'এখানে থেমেছিল ওরা। নৌকা ভিড়িয়ে নেমেছিল কোন কারণে। তারমানে ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা,' বনের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'এখান থেকে নৌকাটা বয়ে নিয়ে

যায়নি তো ওরা? কাছাকাছিই হয়তো ওদের ঘাঁটি আছে।'

'মনে হয় না। পাহাড়টা এখনও বেশ দূরে। তবে দেখতে চাইলে দেখা যায়।'

বনের ভেতর অনেকখানি জায়গায় চক্কর দিয়ে এল ওরা। কোন ঘর কিংবা মানুষ থাকার কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। আবার নদীর কিনারে ফিরে এল।

ব্যাকপ্যাক নামিয়ে তাতে বসে পড়ল কিশোর, জিরানোর জন্যে। এই সময় পাথরটা চোখে পড়ল তার। নদীর পানি আর পাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ঢালের মধ্যে রয়েছে ওটা। মানুষের মাথার প্রায় দ্বিগুণ। তাতে গজানো শ্যাওলা ছড়ে গেছে অনেকখানি জায়গায়। কেউ পা দিয়েছিল ওটাতে, জুতোর তলা পিছলে গেছে।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে পাথরটা পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। চামড়ার খুব খুদে কণা লেগে আছে পাথরের গায়ে, ঘষা লেগে ছিঁড়েছে।

'এখানে নেমেছিল ওরা, কোন সন্দেহ নেই,' বলল সে, 'তবে জিরানোর জন্যে। উজানের দিকে নৌকা বাইতে বাইতে হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল হয়তো।'

'তবে কি নদীর ধার ধরেই এগোতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ।'

আরও ঘণ্টাখানেক পর লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে থামল ওরা। খেয়েদেয়ে এগোল আবার। বিকেল পর্যন্ত একটানা চলল। ইতিমধ্যে নৌকা থামানোর আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। গোয়েন্দাগিরির অভ্যাস নেই টম আর বিডের, অত ধৈর্য নেই। বিড বলল, 'আর কত এগোব?'

'যতক্ষণ নৌকাটা টেনে তোলার আর কোন চিহ্ন না পাই,' জবাব দিল কিশোর।

'কিন্তু আর তো পা চলে না। এবার থামলে হয় না? কাল সকালে নাহয় আবার এগোনো যাবে।'

সেটা অবশ্য করা যায়। ক্যাম্প করার মত যুতসই জায়গা খুঁজতে লাগল ওরা।

নয়

খেতে খেতে বলল মুসা, 'জিনিসগুলো ফেরত পাব বলে আর মনে হয় না। অন্যগুলো গেছে গেছে, খালুর রাইফেলগুলো নিয়েই যত চিন্তা। কি যে লজ্জায় পড়ব!'

'এখনই অত হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'খোঁজা তো মাত্র শুরু করলাম। দেখা যাক না কি হয়।'

রেডিও অন করে রেখেছে টম। মিউজিকের পর খবর হলো। তারপর আবার মিউজিক।

শহরের চেয়ে পর্বতের মধ্যে এখানে ঠাণ্ডা অনেক বেশি। সারাদিন হেঁটেছে। ক্লান্ত হয়েছে শরীর। খাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই কিশোর বাদে ঢুলতে আরম্ভ করল

সবাই। স্লিপিং ব্যাগে গিয়ে ঢুকল একে একে।

মাঝরাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল সকলেরই। কিসে ভাঙল? একটা শব্দ। কান পেতে শুনতে লাগল। দূরে চিৎকার করছে কোন একটা বুনো জানোয়ার। তবে ওই শব্দে ঘুম ভাঙেনি ওদের, ভেঙেছে সাইরেন বাজার মত আরেকটা শব্দে।

উঠে বসল ওরা। একবার বেজে কমে গেল শব্দটা। তারপর আবার জোরাল হলো। কিছুক্ষণ বেজে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

কান পেতে রইল ওরা। কিন্তু আর বাজল না। কয়েক মিনিট পর একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে। প্রায় মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল পর্বতের দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল ওটা, চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

এর মিনিট পাঁচেক পর সেই বুনো জানোয়ারটা চিৎকার শুরু করল আবার। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মনে হলো।

'খাইছে! ভূত!' ককিয়ে উঠল মুসা।

'কুকুর!' চিন্তিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'বুনো কুকুর হতে পারে। পুরো দলটাই আসছে নাকি!'

ব্যাগ থেকে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল ওরা। হাতে তুলে নিল একটা করে শুকনো ডাল। একমাথায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে তৈরি হয়ে রইল আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে।

কিন্তু এল না জানোয়ারটা। ডাকতে ডাকতে সরে গেল একদিকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন বুঝল আর আসবে না, আবার ব্যাগে ঢুকল ওরা।

বাকি রাতটায় আর কোন উপদ্রব হলো না। পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে টম বলল, 'আটটা বাজে। দাঁড়াও, খবরটা শুনি।'

ওর এই খবর শোনা নিয়ে হাসাহাসি করল অন্যরা। কিন্তু কান দিল না টম। প্যাক থেকে রেডিও বের করে সুইচ অন করে দিল সে। অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে একটা বিশেষ খবর পড়ল সংবাদ-পাঠক, যেটা উত্তেজিত করে তুলল সবাইকে। গতরাতে একটা প্লেন হারিয়ে গেছে রকি বীচ থেকে। পাইলট ছিল ল্যারি কংকলিন। রাতে কোন কারণে আকাশে উঠেছিল। কয়েক মিনিট পর বিমান বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাল, 'আমি বিপদে পড়েছি! হাইজ্যাকার!' এরপর চুপ হয়ে গেছে। আর কোন খবর পাওয়া যায়নি ওর। অনুমান করা হচ্ছে, সাগরে কিংবা রকি বীচের বাইরে শিপরিজের বনে ক্র্যাশ করেছে বিমানটা। কোস্ট গার্ডকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সার্চ পার্টি গঠন করে খোঁজাখুঁজি করছে পুলিশ।

বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। কি হলো ল্যারির? পুলিশের অনুমান সত্যি হলে, সাগরে না পড়ে যদি বনে পড়ে থাকে তাহলে এদিকেই কোথাও পড়েছে।

'তারমানে রাতে যে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনলাম,' রবিন বলল, 'ওটা ল্যারিকে খুঁজতেই গিয়েছিল।'

'চলো, আমরাও ওদিকটাতেই যাই,' কিশোর বলল। 'ক্র্যাশল্যান্ড করে

থাকলে, মারা না গেলেও ল্যারির অবস্থা খুব খারাপ, নইলে এতক্ষণে বাড়ি চলে যেত। নিখোঁজ থাকত না।'

মুসার চোরাই মালগুলো খোঁজার আগে ল্যারিকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল ওরা, ওটা বেশি জরুরী। রাতের বেলা পর্বতের দিকে যেদিকে গিয়েছিল হেলিকপ্টার, সবাইকে নিয়ে সেদিকে রওনা হলো কিশোর। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে চলল ওরা।

'কিডন্যাপারে ধরলে ক্র্যাশল্যান্ড করবে কেন বুঝতে পারছি না,' হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা।

'ও হয়তো মানতে চাইছিল না,' রবিন বলল। 'আঘাত করা হয়েছে ওকে। জোরেই হয়ে গিয়েছিল আঘাতটা, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল সে, প্লেনটা ক্র্যাশ করেছে।'

বনের গভীর থেকে আরও গভীরে ঢুকে গেল ওরা। পথটথ কিছু নেই। মানুষ চলাচলের তো নয়ই, জানোয়ারের চলাচলেরও নয়। পৌঁছে গেল পর্বতের গোড়ায়। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। সমতল ধরে চলার চেয়ে এটা আরও কঠিন কাজ। কারণ গাছপালা এখানেও একই রকম ঘন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাঁপানো শুরু করল ওরা। ঘামে ভিজে গেল শরীর। সবার চেয়ে বেশি হাঁপাচ্ছে কিশোর। বলল, 'বসো, জিরিয়ে নিই।'

'আমি বরং গিয়ে একটা গাছে চড়ে দেখি,' মুসা বলল। 'ওপর থেকে কিছু দেখা যেতে পারে।'

বুদ্ধিটা মন্দ না।

পুরানো একটা ফার গাছের দিকে এগোল সে। টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে গাছটা। সবচেয়ে নিচের ডালটাও অনেক ওপরে, ধরা মুশকিল। ওটা ধরতে না পারলে এ গাছে ওঠা যাবে না।

এগিয়ে এল টম আর বিড। টম বলল, 'আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে যাও।'

উঠে গেল মুসা। সাবধান রইল যাতে হাত ফসকে নিচে না পড়ে যায়, তাহলে আর আস্ত থাকবে না। মগডালের কাছাকাছি উঠে বসে পড়ল একটা ডালে। কাণ্ডটা একহাতে পেঁচিয়ে ধরে রাখল। চিৎকার করে বলল, 'দারুণ দেখা যাচ্ছে যাই বলো! সাগরও দেখতে পাচ্ছি।'

মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল হঠাৎ, 'অ্যাই, চকচকে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে! প্লেনের ভাঙা টুকরো না তো?'

'কোন দিকে?' চিৎকার করে নিচ থেকে জানতে চাইল কিশোর।

হাত তুলে দেখাল মুসা, 'ওদিকে।'

'নেমে এসো।'

নেমে এল মুসা। চকচকে জিনিসটা যেদিকে দেখেছে সেদিকে নিয়ে চলল সবাইকে। সরে যেতে লাগল আবার পর্বতের কাছ থেকে। মাটি এদিকে ভেজা ভেজা। আরও এগোতে চোখে পড়ল জলাভূমি। বড় গাছের চেয়ে লতা আর ঝোপ বেশি, শক্ত হয়ে পেঁচিয়ে গিয়ে দুর্গম করে তুলেছে। এর ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

আগে আগে চলেছে মুসা। ঘণ্টাখানেক পর থেমে গিয়ে হতাশ কণ্ঠে বলল,

'চকচকে জিনিসটা পেয়েছি। প্লেন নয়, পানি। ওই দেখো।'

ঘন বনের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা বড় পুকুর। বন থেকে ওটার পাড়ে বেরিয়ে এল ওরা। টলটলে পানিতে চকচক করছে বিকেলের রোদ। দেখে লোভ সামলাতে পারল না মুসা। কাপড় খুলতে আরম্ভ করল।

'কি করছ?' টম জিজ্ঞেস করল।

'সাঁতার কাটব। কে কে আসবে?'

টম আর বিড নামার জন্যে তৈরি হলো। রবিন বসে পড়ল একটা পাথরে, এ সব পানিটানি বিশেষ পছন্দ না তার। আর অচেনা পুকুরে নামতে ভয় লাগে কিশোরের।

মুসা, টম আর বিড নেমে গেল পানিতে। দাপাদাপি করতে লাগল। রবিন তাকিয়ে রইল গাছের ডালে বসা একটা রবিনের দিকে, মিষ্টি শিস দিচ্ছে পাখিটা। মিনিটখানেক বসে থেকে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল রবিন।

'পুকুরটার চারপাশ ঘুরে দেখে আসি।'

একপাশ ঘুরে খানিক দূর এগিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর। আগুন জ্বালানোর চিহ্ন দেখতে পেল। কয়েকটা মাছের কাঁটা পড়ে আছে। কাছাকাছি তাজা পায়ের ছাপও দেখা গেল।

ফিরে এসে মুসাদেরকে পানি থেকে উঠে আসার জন্যে ডাক দিল সে। কি দেখে এসেছে জানাল।

'চোরেরা নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'কি করে বলব। চলো, অনুসরণ করে দেখা যাক।'

'এখনই? খিদে পেয়েছে তো।'

'এক কাজ করো তাহলে। তোমরা রান্নার ব্যবস্থা করো, আমি আর রবিন যাই, দেখে আসি কতদূর গেল পায়ের ছাপ।'

মুসা আর টম রান্না করতে গেল, বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে বসল বিড। রবিনকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

পুকুর পাড়ের নরম মাটিতে গভীর হয়ে পড়েছে জুতোর ছাপ। মাটি যতক্ষণ নরম থাকল, ছাপ দেখা গেল। কিন্তু যতই দূরে সরল, আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে এল মাটি, মিলিয়ে গেল ছাপ।

'এগোতে থাকি,' কিশোর বলল। 'দেখা যাক, সামনে কোন কেবিন-টেবিন আছে কিনা।'

প্রায় সিকি মাইল পথ এগোনোর পরও সামনে কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে চলল ওরা। লোকটা কোনদিকে গেছে বোঝার উপায় নেই। সোজা না এগিয়ে ডানে-বাঁয়ে মোড় নিয়ে যে কোন দিকে যেতে পারে। পুকুর পাড়ে রাত কাটানোর জন্যে ফিরেও আসতে পারে, এরকম একটা ক্ষীণ সম্ভাবনাও উঁকি দিল কিশোরের মনে।

পুকুর পাড়ে ফিরে এল দুজনে।

প্রচুর মাছ পুকুরে। বড়শি ফেললেই গেলে। বড় বড় তিনটে মাছ ধরে ফেলেছে

বিড। কিশোররা এসে দেখল কাঠিতে গেঁথে আগুনের ওপর ধরে ঝলসানো হচ্ছে ওগুলোকে। রেডিও অন করা।

গলা পর্যন্ত গিলে বড় বড় হাই তুলতে শুরু করল মুসা। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। পুকুরের পাড়টা খোলা বলে বনের ভেতরের চেয়ে দিনের আলো কিছুটা বেশি সময় থাকল এখানে। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকল সবাই। কিশোর বলল, 'ঘুমের মধ্যেও কান খোলা রাখার চেষ্টা কোরো। লোকটা ফিরে আসতে পারে।'

দশ

মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল মুসা, বিড আর টম। নীরব বনের মধ্যে ওদের নাক ডাকানোর শব্দকে গর্জন মনে হলো। রবিন জেগে রইল, কিশোরও। পাশাপাশি শুয়েছে দুজনে। বেশিক্ষণ চোখ খোলা রাখতে পারল না। তবে মনের মধ্যে চিন্তা পুষে রাখায় গভীর হলো না ঘুম।

ঘণ্টাখানেক পর রবিনের দিকে কাত হয়ে ওর গায়ে ঠেলা দিল কিশোর, ফিসফিস করে বলল, 'রবিন, অ্যাই রবিন, পায়ের শব্দ!'

বনের মধ্যে হালকা শব্দ হচ্ছে, রবিনও শুনতে পেল। হঠাৎ জ্বলে উঠল টর্চ। আলো এসে পড়ল রবিন আর কিশোরের ওপর।

'কে? কে আপনি?' চিৎকার করে উঠল কিশোর। তার চিৎকারে জেগে গেল সবাই।

জবাব দিল না লোকটা। আলো নিভে গেল। বনের মধ্যে শোনা গেল তার ছুটন্ত পদশব্দ।

দুই টানে পায়ে জুতো গলিয়ে, থাবা দিয়ে টর্চটা তুলে নিয়ে লোকটার পেছনে দৌড় দেয়ার আগে কিশোর বলল, 'রবিন, তুমি, বিড আর টম থাকো। আরও কেউ আসতে পারে। মুসা, তুমি এসো আমার সঙ্গে।'

অন্ধকারে যে ভাবে ছুটছে লোকটা তাতেই বোঝা গেল এই বন ওর পরিচিত। কিশোর বা মুসার চেয়ে অনেক দ্রুত ছুটছে সে। টর্চ জ্বেলে দেখে দেখে দৌড়াচ্ছে ওরা, তাও পারছে না লোকটার সঙ্গে।

মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। বিরক্তি আর হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'দূর, গেল চলে!'

ক্যাম্পে ফেরার পথে ভাবতে লাগল সে, কে লোকটা? চোরদের কেউ? নাকি কোন সন্ন্যাসী, তার নির্জন-আবাস গোপন রাখতে চায় বাইরের লোকের কাছে, সেজন্যেই ধরা দিল না?

ফিরে এসে দেখল উত্তেজিত হয়ে আছে অন্য তিনজন। রেডিওটার নিচে একটা কাগজের টুকরো পেয়েছে টম। সন্দেহ করছে, লোকটা রেখে গেছে। ওটা দেয়ার জন্যেই এসেছিল। ময়লা কাগজটায় পেন্সিল দিয়ে লেখা রয়েছে:

বন থেকে বেরিয়ে যাও।
বিপদের মধ্যে রয়েছ তোমরা।

বোঝা গেল, ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। বন্ধুও আছে, শত্রুও আছে। কিন্তু বন্ধুটি কে? সামনে এসেও পালিয়ে গেল কেন? কেন ধরা দিল না?

অস্বস্তি বোধ করছে বিড, 'কি করব? চলে যাব?'

'এত জলদি!' জবাব দিল কিশোর, 'রহস্য তো আরও ঘনীভূত হচ্ছে। এই অবস্থায় যাব কি, থাকার ইচ্ছে তো আরও বেড়ে যাচ্ছে।' ঘড়ি দেখল সে। একটা বাজে। 'বাকি রাতটা পালা করে পাহারা দিতে হবে আমাদের। সাউন্ড ডিটেক্টরটাও অন করে রাখব। লোকটা এলে দূর থেকেই তার শব্দ শোনা যাবে।'

ব্যাগ খুলে ডিটেক্টরটা বের করল কিশোর। পুরানো মালের সঙ্গে বাতিল এই যন্ত্রটাও কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা। কিছু পার্টস বদলে, আর কিছু মেরামত করে যন্ত্রটা আবার সচল করে নিয়েছে কিশোর। আকারে সিগারেটের বাক্সের সমান। মানুষের কানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী একটা কান রয়েছে এটার। দূরের শব্দ, আর মানুষ যা শুনতে পায় না সে রকম অস্পষ্ট শব্দও এটার কানে ধরা পড়ে।

কিন্তু সারারাতে কিছুই ঘটল না আর। কেউ এল না। যন্ত্রটাও সন্দেহজনক কোন সঙ্কেত দিল না।

সবার শেষে ডিউটি পড়ল মুসার। পাঁচটা সময় তাকে ডেকে দিয়ে ব্যাগে ঢুকে গেল টম। খানিক পর পেটে চাপ পড়ল মুসার। প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্যে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে চলল ঝোপের দিকে। আলো ফুটতে আরম্ভ করেছে। কাজটা শেষ করে পানির জন্যে ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল একটা নালা। উঠে এগিয়ে গেল সেদিকে।

ব্যাগের ভেতর ঢুকলেও ঘুম এল না আর টমের। তাই মুসার চিৎকার সবার আগে শুনতে পেল সে। মাথা তুলে দেখল, ঝোঁপের ভেতর থেকে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসছে মুসা।

জেগে গেল সবাই। কি হলো?

কাছে এসে হাঁপাতে লাগল মুসা, 'পেয়ে গেছি!...ওই যে ওখানে পড়ে আছে!'

'আরে অত চেঁচাচ্ছ কেন?' রবিন বলল, 'কি পেয়ে গেছ বলোই না!'

'নৌকা! আমার নৌকাটা!'

তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে জুতো পরে নিল সবাই। দৌড় দিল মুসার সঙ্গে।

একটা নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে নালাটা। দুই তীরে লম্বা লম্বা ঘাস। এটা দিয়েই পানি এসে পড়ে পুকুরে। নালার মুখের কাছে পানিতে আধডোবা একটা গাছের কাণ্ডে তলা বেধে গিয়ে আটকে গেছে নৌকাটা। একেবারে কাছে না গেলে ঘাসের জন্যে ভালমত দেখা যায় না।

নৌকাটা দেখে রবিন বলল, 'বাকি মালগুলোও আশপাশে কোথাও লুকানো আছে।'

'চলো, আগে নাস্তা সেরে নিই,' কিশোর বলল, 'তারপর খুঁজব।'

নাস্তা সেরে এসে চারপাশের অনেকখানি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওরা। রাইফেল বা চুরি যাওয়া আর একটা জিনিসও পাওয়া গেল না।

'বোকামি করেছি খুঁজে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে পর্বতের দিকে তাকাল কিশোর, 'এখানে পাওয়া যাবে না আগেই বোঝা উচিত ছিল। নৌকাটা চুরি করেছিল ওরা মালগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কাজ শেষ, ফেলে দিয়েছে। ওটা রাখা এখন ওদের জন্যে রিস্কি। উজান থেকে ভাসিয়ে দিয়েছে যাতে সাগরের দিকে চলে যায়। কেউ দেখলেও বুঝতে না পারে ওদের আস্তানা কোথায়।'

'তুমি পারছ?'

'পারছি,' হাত তুলে উজানের দিকে দেখাল কিশোর, 'ওদিকে কোনখানে। নদীর ধার ধরে এগিয়ে গেলেই হবে। পেয়ে যাব।'

দাঁড় বা বৈঠা নেই নৌকাটায়। নৌকা বাওয়ার জন্যে গাছের দুটো সোজা ডাল কেটে লগি বানিয়ে নিল মুসা। সবার যাওয়ার দরকার নেই। বিড আর টমকে ক্যাম্পে জিনিসপত্রের পাহারায় রেখে এসে নৌকায় চাপল তিন গোয়েন্দা।

গলুইয়ে বসে নৌকা বাইতে শুরু করল মুসা। কিশোর আর রবিন নজর রাখল দু'তীরের দিকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল নৌকা। তীরের প্রতিটি জিনিসের ওপর কড়া নজর তিনজনের। হঠাৎ শিস দিয়ে উঠল রবিন, 'একটা কুঁড়ে!'

হাত তুলল কিশোর, 'রাখো তো এখানে।'

নৌকা ভেড়াল মুসা। 'আমি আসব?'

'না, বসে থাকো। আমরা দেখে আসি।'

কুঁড়ের ভেতর উঁকি দিল কিশোর। কেউ নেই। ভেতরে ঢুকল। এককোণে রাখা একজোড়া হাইকিং বুট দেখতে পেল। তুলে নিয়ে দেখল। নতুন। একটা জুতোর চকচকে চামড়ায় একটা গভীর আঁচড়, তলা থেকে ওপরের দিকে উঠে এসেছে।

'এই জুতোটাই পাথরে পিছলে গিয়েছিল,' বলল সে। 'যে পরে ছিল, সে কোথায়?'

'লুকিয়ে থেকে দেখব নাকি?' রবিন বলল, 'এক কাজ করি বরং, নৌকা নিয়ে চলে যাই। আমাদের ওপর নজর রেখে থাকলে লোকটা দেখবে আমরা চলে গেছি। কিছুদূর গিয়ে একজন নেমে লুকিয়ে চলে আসব এখানে। দেখব, লোকটা কে?'

বুদ্ধিটা মন্দ না। রাজি হলো কিশোর। নৌকা নিয়ে ফিরে চলল ওরা। তারপর নেমে পড়ল রবিন। নিঃশব্দে হেঁটে চলে এল কুঁড়েটার কাছে। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

পাঁচ মিনিট গেল…দশ…পনেরো…

সময় কাটতে থাকল। লোকটার দেখা নেই। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে ঢুকল। ওদের ক্যাম্প তো বহুদূরে, এতদূর থেকে এখানে গন্ধ আসার কথা নয়। এপাশ ওপাশ নাক ঘুরিয়ে বাতাস শুঁকতে লাগল। ডানপাশ থেকে আসছে গন্ধটা। কুঁড়ের লোকটা বনের ভেতর বসে রান্না করছে না তো? কৌতূহল দমাতে না পেরে দেখতে চলল সে।

যতই এগোল, বাড়তে থাকল গন্ধটা। খানিক পরেই ছোট্ট একটুকরো খোলা

জায়গায় বেরিয়ে এল। কোথায় আগুন জ্বলছিল দেখল। নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখেই বোঝা গেল কয়েক মিনিট আগে জ্বলছিল আগুনটা। লোকটা কোথায়? নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে কুঁড়ের দিকে?

আগের জায়গায় ফিরে চলল রবিন। এগোতে গিয়ে চকচকে একটা জিনিস চোখে পড়ল বনের ভেতর। কাছে এসে দেখল জিনিসটা। কয়েকটা ফার্নের আড়ালে পেতে রাখা হয়েছে বড় একটা ইস্পাতের ফাঁদ। তাতে খরগোশের মাংসের টোপ দেয়া। কি ধরার জন্যে পেতেছে? শেয়াল? তারমানে শিকারি আছে এখানে, শেয়ালের চামড়ার ব্যবসা করে। কুঁড়েটা তারই।

নিচু হয়ে ফাঁদটা দেখতে দেখতে আজব এক অনুভূতি হলো ওর, মনে হলো আড়ালে লুকিয়ে কেউ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মাথা তুলে তাকাতে চোখে পড়ল একটা মুখ। হালকা লাল চুল। পলকে গাছের আড়ালে সরে গেল মুখটা। চেনা চেনা লাগল ওকে, দেখেছে কোথাও। একটু ভাবতে মনে পড়ে গেল, সেই লোকটা—পত্রিকা অফিস থেকে বেরোনোর পর কিশোরের পিছে লেগেছিল যে।

পিছু নিতে গিয়েও নিল না রবিন। একা যাওয়া ঠিক হবে না। কোন সন্দেহ নেই লোকটা কিডন্যাপারদের দলের। জোরে শিস দিল পাখির মত করে। অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। মুসা আর কিশোর শুনলে চিনতে পারবে, বুঝতেও পারবে ওদেরকেই ডাকা হচ্ছে। বনের মধ্যে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে ইঙ্গিতে একজন আরেকজনকে ডাকার জন্যে এই শিস প্র্যাকটিস করেছে তিন গোয়েন্দা।

শিস শুনে তাড়াতাড়ি কুঁড়ের কাছে নৌকা নিয়ে যেতে বলল কিশোর। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা ডুবো চরায় নৌকা লাগিয়ে দিল মুসা। আটকে গেল তলা।

'তুমি নামাও,' বলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। হুড়মুড় করে পানি ভেঙে তীরে উঠে নালার পাড় ধরে ছুটল। যেখান থেকে শিস শোনা গেছে, অনুমানে সেখানে এসে দাঁড়াল। রবিনকে চোখে পড়ল না। শিস দিল তার উদ্দেশে।

জবাব এল না।

'গেল কোথায়!' বিড়বিড় করল কিশোর। বিপদে পড়ল না তো? সাড়া না দিলে কোনখানে খুঁজবে? ভাবল, সাহায্যের দরকার হলে সে কি করত। নৌকার কাছে ছুটে যেত।

পেছন ফিরে দৌড় দিল কিশোর। গিয়ে দেখল মুসা নৌকাটা তীরে নিয়ে এসেছে। ওকে একা দেখে চোখ বড় বড় করে ফেলল। 'রবিনকে পেলে না?'

নীরবে মাথা নাড়ল কিশোর। কি করবে বুঝতে পারছে না।

একটা ফড়ফড় শব্দ শুনে গাছের দিকে তাকাল মুসা। 'খাইছে! কবুতর!'

কিশোরও দেখল দুটো কবুতর উড়ে গেল ডাল থেকে। বুনো না পোষা বোঝা গেল না। মাথার ওপরে চক্কর দিল কয়েক সেকেন্ড, তারপর উড়ে গেল দক্ষিণে। ঝট করে ভাবনাটা মাথায় এল ওর। এখান থেকেই ইয়ার্ডে কবুতর পাঠানো হয়নি তো? তাহলে কিডন্যাপারদের আস্তানা এখানে কাছাকাছিই কোথাও আছে।

আরেকটা চিন্তা মাথায় ঢুকতেই ধড়াস করে উঠল বুক, কিডন্যাপারদের খপ্পরে পড়েনি তো রবিন!

আরও দুটো কবুতর দেখা গেল মাথার ওপর। আগের দুটোর মতই চক্কর দিচ্ছে, হঠাৎ বিকট শব্দ হলো, বনের নীরবতা খান খান করে দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সে শব্দ।

'গুলি!' আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

ঝাঁকি দিয়ে কাত হয়ে গেল একটা কবুতর, কয়েকবার ডানা ঝাপটে ভেসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে পড়তে শুরু করল। হারিয়ে গেল ডালপালার ভেতর।

'গুলি খেয়েছে!' কোথায় পড়েছে দেখার জন্যে লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল মুসা।

কিশোরও ছুটল তার পেছনে। চিৎকার করে বলল, 'সাবধান! দুশো গজের মধ্যে রয়েছে লোকটা!'

গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটে চলল দুজনে। কিছুদূর যাওয়ার পর লাল একটা কার্তুজের খোসা নজরে পড়ল মুসার। নিচু হয়ে তুলে নিল। এখনও গরম। গুলি করেই শটগান থেকে খোসাটা খুলে ফেলে দিয়ে সরে গেছে লোকটা। তারমানে খুব কাছাকাছি আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে দেখতে লাগল সে। ভয় পাচ্ছে, যেন দেখবে কোন মুহূর্তে একটা বন্দুকের নল তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কয়েক গজ দূরে কবুতরটাকে পড়ে থাকতে দেখল কিশোর। মৃত। পায়ে ব্যান্ড বা লেবেল জাতীয় কিছু নেই, অর্থাৎ বুনোই এটা, পোষা বা হোমিং পিজিয়ন নয়, সে যেটা আশা করেছিল। সাধারণ শিকারির কাজ হতে পারে। কিন্তু কোথায় লোকটা? সামনে আসছে না কেন?

হঠাৎ দুজনের মেরুদণ্ডে ভয়ের শীতল স্রোত বইয়ে দিয়ে গর্জে উঠল একটা বুনো জানোয়ার। ডাক অনেকটা বড় আকারের কুকুরের ডাকের মত। পরক্ষণে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার শোনা গেল।

'খাইছে! রবিন!' আঁতকে উঠল মুসা।

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর, তারপর বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন শরীরে, চিৎকার লক্ষ্য করে দৌড় দিল। মুহূর্তে তার পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল মুসা। কাঁটা ঝোপ ক্ষত-বিক্ষত করে দিল হাত-পা, ছিঁড়তে লাগল কাপড়, ভ্রূক্ষেপও করল না দুজনের কেউ।

পর পর কয়েকটা ঝোপ পার হয়ে আসার পর আচমকা মুসার চিৎকার কানে এল কিশোরের, ওকে দেখল না কোথাও। পা ফেলতে মাটি লাগল না পায়ের নিচে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত যেন শূন্যে ভেসে রইল সে। নিচে পড়ল, একটা নরম কিছুর ওপর। মাথা ঠুকে গেল পাথরে। তারপর অন্ধকার। জ্ঞান হারিয়েছে।

এগারো

ধীরে ধীরে চোখ মেলল কিশোর। মাটিতে পড়ে আছে। লতানো উদ্ভিদ আর শ্যাওলা জন্মে আছে।

'আমি কোথায়?' বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল নিজেকে। পিঠের নিচে নরম কি যেন লাগল। চমকে গিয়ে দেখল মুসার ওপর পড়ে আছে। সে এখনও বেহুঁশ। তার পাশে পড়ে আছে আরেকটা দেহ। রবিন! সেও বেহুঁশ।

তাড়াতাড়ি মুসার ওপর থেকে সরে গিয়ে ওকে ঠেলতে লাগল কিশোর, 'মুসা, অ্যাই মুসা, ওঠো!'

আস্তে করে চোখ মেলল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'কোথায় আমরা? দোজখে?'

'না, এখনও যাইনি ওখানে। একটা গর্তে পড়েছি। রবিনও আছে।'

'কি বললে!' লাফ দিয়ে উঠে বসল মুসা।

হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'রবিন বেহুঁশ হয়ে আছে। ওকে বের করে নিয়ে যেতে হবে।'

চওড়া একটা ফাটলের মধ্যে পড়েছে ওরা। খাড়া উঠে গেছে দেয়াল। বেরোতে হলে যেদিক দিয়ে পড়েছে সেদিক দিয়েই উঠতে হবে।

গর্তে পড়ার ধাক্কাটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল দুজনে। রবিনকে তুলতে যাবে এই সময় চোখ মেলল সে। দুর্বল কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল, 'নেকড়েটা চলে গেছে!'

'নেকড়ে দেখলে কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ওটাই তো তাড়া করল আমাকে!' কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাথার ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল তার। গর্তটা দেখল। 'ও, এখানে পড়াতে বেঁচেছি। বেরোতে পারবে না বুঝে গর্তে নামেনি জানোয়ারটা। তোমরা এলে কি করে?'

'উড়ে,' হেসে জবাব দিল মুসা।

'মানে?'

'তুমি যেভাবে পড়েছ, না দেখে, আমরাও সেভাবেই। তোমার চিৎকার শুনে দৌড় দিয়েছিলাম, কোনদিকে খেয়াল ছিল না আর···।'

কোথাও হাড় ভেঙেছে কিনা টিপেটুপে দেখল রবিন। 'বসে থেকে কি হবে। চলো বেরোই।'

'বেরোনো অত সহজ না। আট ফুট উঁচু দেয়াল। কিশোর, তুমি আমার কাঁধে চড়ে উঠে যাও। রবিনকে টেনে তোলো। দুজনে মিলে আমাকে তুলবে।'

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে চড়ল কিশোর। সাবধান করল রবিন, 'দেখেশুনে বেরিও। এখনও থাকতে পারে বন্দুকওয়ালা লোকটা।'

গর্তের কিনারে ছোট ছোট ঝোপঝাড় জন্মে জংলা হয়ে আছে। আস্তে করে সেগুলোর কাছে মাথা বাড়াল কিশোর। ভাল করে তাকিয়ে দেখল কেউ আছে

কিনা। 'আমি উঠছি।'

মুসা বলল, 'ঠিক আছে।'

গাছের গোড়া চেপে ধরে গর্তের বাইরে নিজেকে টেনে তুলল কিশোর। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে নিচে হাত বাড়িয়ে দিল। মুসার কাঁধে দাঁড়ানো রবিনকে উঠতে সাহায্য করল।

ওপর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে লাফ দিয়ে একটা গাছের গোড়া চেপে ধরে ঝুলে পড়ল মুসা। দেয়ালে পা বাধিয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করল। ওপর থেকে তাকে সাহায্য করল কিশোর আর রবিন।

তিনজনেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। বিশ্রাম নিতে নিতে দেখল কার কতটা জখম হয়েছে। সাধারণ কয়েকটা আঁচড় বাদে আর কারও কিছু হয়নি। ভাগ্য ভাল, হাড় ভাঙেনি কারোরই।

'এদিকে এলে কি করে তুমি?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ফাঁদটার কথা বলল রবিন। বলল ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটার কথা। 'এই লোকটাই সেদিন তুমি পত্রিকা অফিস থেকে বেরোনোর পর তোমাকে অনুসরণ করেছিল।'

'তাই নাকি!' চারপাশে তাকাল কিশোর, 'গেল কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। খানিকক্ষণ আমাকে ছুটিয়ে মারল। তারপর গায়েব।'

'কুকুরের ডাক শুনলাম। তোমাকে কামড়াতে এসেছিল নাকি?'

'কুকুর নয়, নেকড়ে।'

চমকে গেল মুসা, 'বলো কি! বুনো কুকুরের গুজব না শুনলাম? নেকড়ে এল কোত্থেকে?'

'তা জানি না। তবে নেকড়েই দেখেছি, ভুল হয়নি আমার। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছুটে এল আমার দিকে। দিলাম দৌড়। গর্তটায় পড়ে যাওয়াতে বেঁচেছি। উঠতে পারবে না বুঝেই বোধহয় ওটা আর নামেনি।'

'তারপর? মিলিয়ে যায়নি তো?'

হাসল রবিন। 'ভূত কিনা জানতে চাইছ তো? না, ভূত নয়। জ্যান্ত নেকড়ে। ডার্ক উডে বুনো কুকুর আছে বলে যে গুজব রয়েছে, সেটা মিথ্যে নয়। নেকড়েকেই কুকুর ভেবেছে লোকে।'

গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, গর্তের ওপরটা ঘাস আর ডালপাতা দিয়ে ঢাকা ছিল!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন আর মুসা। কিশোর কি বলতে চায় বুঝে ফেলেছে।

'ফাঁদ!' বিড়বিড় করল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ভালুক ধরা ফাঁদ। গভীর গর্ত খুঁড়ে ওপরটা ডালপাতা দিয়ে এমন করে ঢেকে দেয়া হয়, যাতে বুনো জানোয়ারের নজরে না পড়ে। সাধারণ ঝোপ ভেবে যেই তাতে পা দেয়, অমনি ঝপাৎ!'

'তবে এই গর্তটা প্রাকৃতিক,' রবিন বলল, 'সেটাকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখানে ভালুক আসবে কোথা থেকে? একআধটা

থাকলেও সেই পর্বতের ওপরে থাকতে পারে, এদিকে নামার কথা নয়।'

'এখানে তো এমন জানোয়ারও দেখছি, যেটা একটাও থাকার কথা নয়,' মুসা বলল, 'নেকড়ে। ভালুক থাকলেই বা ক্ষতি কি?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'আমার মনে হয় ভালুকের জন্যে পাতেনি ফাঁদটা।'

'মানে?'

'এখানে একজন শিকারি আছে, যে শেয়ালের জন্যে ফাঁদ পাতে, গুলি করে কবুতর মারে…'

বাধা দিল রবিন, 'কবুতর মারে?'

'হ্যাঁ, গুলির শব্দ শোনোনি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'শুনেছি। কাকে গুলি করছে ভেবে অবাক হয়েছিলাম, রওনাও হয়েছিলাম দেখার জন্যে, এই সময় তাড়া করল নেকড়েটা।'

'হুঁ। যাই হোক, যা বলছিলাম। ইস্পাতের কাঁটাওয়ালা ফাঁদ পাতে লোকটা, গুলি করে, ভালুকের জন্যে গর্ত করে রাখে। আশপাশেই থাকে, সামনে আসে না। ভাবছি, মানুষ শিকার করতেও ভাল লাগে না তো ওর?'

'কি বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি, ভালুক নয়, আমাদেরকেই গর্তে ফেলতে চেয়েছে সে।'

'খাইছে! আটকানোর জন্যে?'

'হতে পারে। কিংবা ভয় দেখানোর জন্যে, যাতে আর না আসি এদিকে। ইস্পাতের ফাঁদ পেতে রেখে বোঝাতে চেয়েছে, যখন-তখন তাতে পা দিয়ে পা ভাঙতে পারি, গুলি করে কবুতর মেরে বুঝিয়েছে ওর কাছে বন্দুক আছে, গর্তে ফেলে দিয়ে বুঝিয়েছে, ইচ্ছে করলেই আমাদের বন্দি করতে পারে।'

'কিন্তু তার ইচ্ছে অনুযায়ী যে আমরা ফাঁদের দিকেই যাব, অত শিওর হয় কি করে?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না! এখানে থেকে আর লাভ নেই এখন। ইচ্ছে করে সামনে না এলে ওকে দেখতে পাব না আমরা। চলো, ক্যাম্পে ফিরে যাই। পরে আসব।'

ফেরার পথে নৌকা বাওয়া সহজ হলো, কারণ ভাটির দিকে চলেছে ওরা। স্রোত বাধা না দিয়ে বরং সাহায্য করছে এখন।

তীরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে কিশোর। আচমকা ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিনকে, 'জন্তুটা নেকড়েই, তুমি ঠিক দেখেছ?'

'গাছের আড়াল থেকে বেরোতে দেখলাম একঝলক,' রবিন বলল, 'দেখেই জান উড়ে গেল। ঘুরে দিলাম দৌড়। পেছনে তাকানোর সাহস হয়নি আর।'

'গর্তের কিনারে উঁকি দেয়নি?' ঝপ করে পানিতে লগি ফেলে জোরে একট ঠেলা মারল মুসা।

'কি করে বলব? আমি তো পড়েই বেহুঁশ।'

'আমার কি মনে হয় জানো, নেকড়ে নয় ওটা, লোকটার পোষা কুকুর। অনেক বড়, বনের মধ্যে দেখেছ তো, নেকড়ের মত লেগেছে। তুমি খাদে পড়ে যেতেই

ডেকে নিয়ে চলে গেছে।'

'এটা অবশ্য হতে পারে,' মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর, 'জানোয়ারটা পোষা।' রবিনের দিকে ফিরল সে, 'ফাঁদের দিকে কি করে ঠেলে নিয়ে গেছে তোমাকে, তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতে। এমন জায়গায় কুকুরটাকে বের করে এনেছে লোকটা, যাতে তুমি দেখলেই উল্টো দিকে দৌড় দাও, আর সেদিকটাতেই রয়েছে ফাঁদ।

'আই, গন্ধ পাচ্ছ?' নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

মুখ ফেরাল রবিন, 'কিসের?'

'মাছের কাবাব বানাচ্ছে টম আর বিড।'

'ক্যাম্প এসে গেছে তাহলে।'

বারো

তিন গোয়েন্দার অবস্থা দেখে কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না টম আর বিড, হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ করে ফেটে পড়ল যেন, প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল। জবাব দিতে দিতে হিমশিম খেয়ে গেল কিশোর আর রবিন।

'ডার্ক উডে কাউকেই ঢুকতে দিতে চায় না ব্যাটারা,' রেগে উঠল টম, 'বাপের সম্পত্তি পেয়েছে!'

'খুনে লোক!' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল বিড। 'কোন সন্দেহ নেই!'

খেতে খেতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। কিশোর নিশ্চিত, বনের একটা বিশেষ অংশ থেকে কোন কারণে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় লোকগুলো। ওরা কিডন্যাপার, কারণ কিডন্যাপারদের দলের লাল চুলওয়ালা লোকটাকে দেখতে পেয়েছে রবিন। 'কাল আবার বেরোব,' বলল সে, 'লোকটাকে খুঁজে বের করব।'

খাওয়ার পর মাছ ধরতে চলল মুসা। পুকুরের উত্তর পাড়টায় রোদ পড়ে ভাল, ছায়াও আছে, ওখানে মাছে খাবে ভাল। অবশ্য পুকুর ভর্তি মাছ, বড়শি ফেললেই ধরে। তাও ওদিকটায় বসার সুবিধে হবে ভেবে ছিপ হাতে রওনা হলো সে।

কোণের কাছে পৌছেই চেঁচাতে শুরু করল।

কি ব্যাপার? দৌড়ে গেল সবাই। মুসার হাতে তার নিজেরটা ছাড়াও আরেকটা ছিপ, নতুন। ওদের দেখে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই যে, এই ছিপটা সেদিন কিনেছিলাম। চুরি গিয়েছিল।'

'কোথায় পেলে?' জানতে চাইল কিশোর।

'এই তো এখানে,' দেখিয়ে দিল মুসা। 'অবাক কাণ্ড! সকালেও ঘুরে গেছি এদিকটায়, তখন তো দেখিনি!'

'তুমি ঘুরে যাওয়ার পর এসেছিল কেউ, ফেলে গেছে।'

'কেন?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। হয়তো মাছ ধরতে এসেছিল, টম আর বিডকে দেখে পালিয়েছে।'

'ছিপটা ফেলে যাবে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

জবাব দিতে পারল না কিশোর। রহস্যময় মনে হলো ব্যাপারটা। ছিপটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। কপসন হার্ডঅয়্যার স্টোরের মনোগ্রাম লাগানো।

চোরাই মালগুলো এদিকটায় কোথাও লুকানো আছে ভেবে আবার একবার খুঁজে দেখল ওরা। ঝোপঝাড়, খানাখন্দ, কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু আর পাওয়া গেল না কোন জিনিস।

ক্যাম্পে ফিরে চলল আবার সবাই, মুসা বাদে। সে রয়ে গেল পুকুরের কোণটাতে, মাছ ধরার জন্যে।

খেয়েদেয়ে রাত নটায় শুয়ে পড়ার আগে আগে খবর শুনতে চাইল ওরা, ল্যারি কংকলিনের কথা আর কিছু বলে কিনা। জানা গেল, সাগরের দিকে খোঁজা হচ্ছে এখন ওকে।

'তারমানে এদিকটায় খোঁজা বাদ দিয়েছে,' স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন।

সবাই একসঙ্গে জাগার কোন দরকার নেই, পালা করে পাহারা দেবে। টমের পালা প্রথম। সবার শেষে কিশোরের।

পাহারা ঠিকমতই দেয়া হলো, কিন্তু কিছু ঘটল না।

সকালে নাস্তার পরে আবার অভিযানে বেরোতে তৈরি হলো কিশোর। আজ ক্যাম্পে থাকবে মুসা আর বিড। তাঁবু পাহারা দেবে, মাছ ধরবে, রান্না করবে।

রবিন আর টমকে নিয়ে রওনা হলো কিশোর। আগের দিনের মতই নৌকায় করে চলল। গাছপালার মধ্যে হালকা ধোঁয়ার মত ঝুলে রয়েছে এখনও কুয়াশার চাদর, নদীর ওপর পাক খাচ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। আগের দিন যেখানে কবুতরটা মারা পড়েছিল, সেখানে পৌছতে পৌছতে কড়া হয়ে গেল রোদ, কুয়াশা তাড়িয়ে দিল পুরোপুরি।

নদী থেকে একশো ফুট দূরে নিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে নৌকাটা লুকিয়ে রাখল ওরা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কাল যেখানে দেখেছি লাল চুলওয়ালা লোকটাকে, সেখান থেকেই খোঁজা শুরু করি, কি বলো?'

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। সাউন্ড ডিটেক্টরের সুইচ অন করে রেখেছে কিশোর। কমিয়ে রেখেছে ভলিউম। পোকা-মাকড়, পাখি আর ছোট ছোট প্রাণীর ডাক শোনা যাচ্ছে স্পীকারে, খুব অল্প আওয়াজ। আরও কমিয়ে দিল কিশোর, কানের কাছে রিসিভার চেপে ধরলেই কেবল এখন শোনা যায়।

আগে আগে চলেছে রবিন। যে গর্তটাতে পড়ে গিয়েছিল, সেটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল, ফিসফিস করে বলল, 'দেখো, ওপরটা আবার ঢেকে দেয়া হয়েছে!'

যন্ত্রটা কানে চেপে ধরল কিশোর। বুনো প্রাণীর শব্দ শুনতে পাচ্ছে, এমনকি নদীর পানি বয়ে যাওয়ার শব্দও, কিন্তু কোন মানুষের গলা শোনা গেল না। এত কাছাকাছি না থেকে রবিন আর টমকে সরে যেতে বলল, ছড়িয়ে পড়ে খোঁজার

জন্যে, তাতে অনেক বেশি জায়গায় চোখ রাখা যাবে।

তার কাছ থেকে বিশ ফুট করে সরে গেল রবিন আর টম, দুজন দুদিকে। এগিয়ে চলল নিঃশব্দে কয়েক সেকেন্ড পর পরই যন্ত্র কানে ঠেকায় কিশোর। কিছুদূর এগোনোর পর হাত তুলল সে। দাঁড়িয়ে গেল অন্য দুজন। ওদের আসতে ইশারা করল সে। এগিয়ে এল রবিন আর টম। ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'একটা নতুন ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তবে খুব সামান্য; বোঝা যায় না কিছু।'

আবার ছড়িয়ে গিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল তিনজনে। আরও সতর্ক হয়ে গেছে। শখানেক ফুট গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল কিশোর।

এগিয়ে এল রবিন-আর টম।

যন্ত্রটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'শুনে দেখো তো, কি বোঝো?'

কয়েক সেকেন্ড শুনে রবিন বলল, 'মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারছে কেউ।'

'কোন মেশিন-টেশিন না তো?'

যন্ত্রটা টমের দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন, 'তুমি শোনো তো, কি মনে হয়?'

কানে চেপে ধরে রেখে টম বলল, 'কই; আমি তো কিছু শুনছি না।'

থাবা দিয়ে ওর হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে কানে ঠেকাল রবিন, 'বন্ধ হয়ে গেছে!'

ভ্রূকুটি করল কিশোর, 'জলদি সরো, ঢুকে পড়ো গাছপালার আড়ালে! আমাদের দেখেই হয়তো বন্ধ করেছে!'

'দেখল কিভাবে?'

'জানি না। কাছাকাছিই আছে হয়তো ওদের আস্তানা।'

গাছের আড়ালে চলে এল ওরা। একটা ছোট পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

'চূড়ায় উঠলে ওপাশটা দেখতে পারি,' টম বলল। কিশোরের দিকে তাকাল, 'যাব নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চলো। তবে ঝোপ আর গাছের আড়ালে থাকতে হবে, খোলা জায়গায় বেরোনো চলবে না।'

আড়ালে থাকতে গিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরতে হলো ওদেরকে। উঠে এল চূড়ায়।

'আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ?' উত্তেজিত হয়ে বলল টম, 'আমি দেখছি একটা চিমনি!'

'চলো,' বলল কিশোর।

মাথা নিচু করে গাছপালার আড়ালে থেকে ঢালের নিচে নেমে এল তিনজনে।

চিমনিটা পুরানো একটা ছাউনির। চালার অর্ধেকটাই দেবে গেছে। জানালাগুলোয় পেরেক মেরে চট আটকে দেয়া হয়েছে

টম বলল, 'কেউ নেই নাকি?'

'থাকলেও লুকিয়ে আছে হয়তো,' কিশোর বলল। 'রবিন, তুমি পেছন দিয়ে যাও। ঢিল মারবে। ভেতরে কেউ থেকে থাকলে সে সেদিকে তাকাবে। এই সুযোগে আমি আর টম সামনে দিয়ে ঢুকে পড়ব।'

ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বাড়িটার পেছনে চলে গেল রবিন। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ছাউনির বেড়ায়। নীরবতার মধ্যে শব্দটা বেশি করে কানে বাজল, মনে হলো যেন গ্রেনেড ফেটেছে। একটা মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর আর টম।

কেউ নেই। মানুষ যে বাস করত সেটা বোঝা গেল একটা খাটিয়া দেখে। তবে বহুদিন অব্যবহৃত। কোনমতে খাড়া করা একটা ফায়ার প্লেসে ছাই জমে আছে ছুঁয়ে দেখল কিশোর। ঠাণ্ডা হয়ে আছে। বহুদিন গরম করা হয়নি।

রবিনও ঢুকল। তার দিকে ফিরে বলল টম, 'কেউ নেই।'

আবছা অন্ধকার একটা কোণের দিকে চোখ পড়তে বলে উঠল রবিন, 'ওটা কি?' তেরপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে কিছু। এগিয়ে গিয়ে টান মেরে তেরপলটা সরিয়েই স্থির হয়ে গেল। একটা ইঞ্জিন।

'অ্যারোপ্লেনের ইঞ্জিন! এটা এখানে এল কিভাবে?'

টম আর কিশোরও এসে দাঁড়াল ার পাশে। দেখতে দেখতে টম বলল, 'বনের মধ্যে ধসে পড়েছিল হয়তো ল্যারি কংকলিনের প্লেন। ইঞ্জিনটা এনে রাখা হয়েছে এখানে।'

রবিন বলল, 'সাংঘাতিক ভারী, এ জিনিস বেশিদূর বয়ে নেয়া কঠিন। আমার ধারণা ল্যারি কাছাকাছিই কোথাও আছে। ইঞ্জিনটা যারা এখানে এনেছে তারাই ওকে আটকে রেখেছে।'

'কিডন্যাপার!' বলে উঠল টম, 'কিশোর, তোমাকে যারা কিডন্যাপ করেছে, তারাই ল্যারিকেও করেছে।'

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন দুবার চিমটি কাটল কিশোর। গিয়ে বসল ইঞ্জিনটার কাছে। ভালমত দেখে বলল, 'এটা ল্যারির প্লেনের নয়। একেবারে নতুন ইঞ্জিন।'

'প্লেনের ইঞ্জিন এখানে আনল কিভাবে ওরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিভাবে আনল?'

'গাড়িতে করে আনতে পারে।'

'না, তা পারে না। গাড়ি আসবে না এখানে। নদীর ধারেই শেষ হয়ে গেছে রাস্তা। কিশোর, তোমার কি মনে হয়? কিভাবে আনল?'

'বুঝতে পারছি না। ভাবতে হবে।'

তেরো

ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে আরও সূত্রের আশায় ছড়িয়ে পড়ল ওরা। কথা রইল, কিছুক্ষণ পর আবার এসে মিলিত হবে এখানে

ছাউনির কাছাকাছি একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। গাছের গা থেকে একটুকরো বাকল ছিঁড়ে পড়ে গেছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগল তার কাছে। পাখির কিচির মিচির শুনে ওপরে তাকিয়ে একটা বাসা দেখতে পেল খুঁজতে খুঁজতে আরও তিনটে গাছের ওরকম বাকল খসানো দেখতে পেল

আর কিছু না পেয়ে ছাউনিতে ফিরে এল সে।

টম আর কিশোরও ফিরে এল কয়েক মিনিট পর, বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়নি। রবিনের কাছে গাছের বাকল ছেঁড়ার কথা শুনল। এর কোন বিশেষত্ব আছে কিনা দেখতে চলল আবার তিনজনে।

'আমার মনে হয় এটা কোন ধরনের ট্রেইল মার্ক,' কিশোর বলল, 'চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে দেখে দেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। চলো দেখি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাকল খসানো আরও দুটো গাছ পাওয়া গেল।

'ভাঙা প্লেনটার কাছে নিয়ে যাবে নাকি এগুলো?' টমের প্রশ্ন।

'দেখা যাক,' বলল কিশোর।

কিন্তু ট্রেইল ধরে এগিয়ে সারাটা সকাল খুঁজেও ভূপাতিত বিমান কিংবা কিডন্যাপারের ঘাঁটির সন্ধান মিলল না। খানিক পর পরই সাউন্ড ডিটেক্টর কানে লাগিয়ে দেখল কিশোর। তাতেও মানুষের করা কোন শব্দ ধরা পড়ল না।

ট্রেইল ধরে এগোতে এগোতে ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ল রবিনের চোখে, থমকে দাঁড়াল সে, 'কিশোর, এক গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরে মরেছি আমরা এতক্ষণ! একই জায়গায় ঘুরেছি!'

রবিনের কথায় ভাল করে তাকিয়ে কিশোরও বুঝতে পারল ব্যাপারটা। প্রথম যে গাছটার কাছ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ওরা আবার সেটার কাছে ফিরে এসেছে। রবিন চিনেছে পাখির বাসাটা দেখে।

'এ কাজ করে রেখেছে কেন?' বুঝতে পারল না টম।

'বুঝলাম না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আশেপাশে সরে গিয়ে দেখতে হবে আর কোন চিহ্ন আছে কিনা।'

কয়েকবার করে একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করাতে চিহ্ন দেয়া গাছগুলো মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে ওদের, সরে গেল ওগুলোর কাছ থেকে, তিনজন তিনদিকে।

কিশোরের অনুমান ঠিক। অন্য ট্রেইলটা টমের চোখে পড়ল প্রথমে। 'আমার মাথা ঘুরছে! এটা আবার কোন ফাঁকি দেবে?'

'বুঝতে হলে ফাঁকিতে পড়ার ঝুঁকি নিতেই হবে। চলো, এগোই,' পা বাড়াল কিশোর।

আরও চিহ্ন পাওয়া গেল। কিছুদূর পর পরই গাছের বাকল খসিয়ে রাখা হয়েছে। বন এখানে অচেনা। তাতে বোঝা গেল আগের জায়গায় আর ঘুরে মরছে না কানের কাছে ডিটেক্টর লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'সামনে মাটি খুঁড়ছে কেউ। বেশি দূরে নয়।'

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তিনজনে। হামা দিয়ে এগোতে শুরু করল। এই কাজে কিশোর বা রবিনের চেয়ে ক্ষমতা বেশি দেখাল টম, অনেক আগে চলে গেল সে। সামনে একটা উঁচু পাথরের চাঙড় চোখে পড়ল তার। মনে হলো ওটার ওপর চড়লেই ওপাশে দেখতে পাবে লোকটাকে।

কিন্তু এত খাড়া আর শ্যাওলায় পিচ্ছিল হয়ে আছে ওটা, ওপরে উঠতে পারল

না সে। শেষে ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে পাশ ঘুরে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল।

কাঁটা লেগে আঁচড়ে যেতে লাগল হাত-পা। শব্দ না করে চলা খুব কঠিন। তবু কোনমতে সেসবের ভেতর দিয়ে অন্যপাশে চলে এল সে। পাতার ফাঁক দিয়ে এদিকে পেছন করে মাটি খুঁড়তে দেখল একজনকে। সামনে আরেকটা পাথর থাকায় শরীরের পুরোটা চোখে পড়ল না।

যা থাকে কপালে—ভেবে ছুটে গিয়ে পাথরের ওপর লাফ দিয়ে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। পড়েই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল, 'মুসা, তুমি!'

রেগে উঠল মুসা, 'তুমি আমার ওপর লাফিয়ে পড়লে কেন?'

'আমি ভেবেছি তুমি…তুমি…'

'আমি কে?' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'পাগল হয়ে গেলে নাকি? বনের মধ্যে জিনে আসর করল!'

রবিন আর কিশোরও এসে দাঁড়াল সেখানে। টম কাকে আক্রমণ করেছিল শুনে হাসতে আরম্ভ করল।

'তুমি এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ক্যাম্প থেকে এত দূরে?' জানতে চাইল রবিন।

ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে মুখের ঘাম মুছতে শুরু করল টম। বিরক্তিতে কুঁচকে রেখেছে মুখচোখ।

'বড় কেঁচো খুঁজতে এসেছি,' মুসা বলল। 'বিড বলল, ছোট মাছ ধরতে আর ভাল্লাগছে না, ট্রাউট ধরবে। পুরানো বড় পাথরের নিচে ভেজা মাটিতে বড় কেঁচো থাকে, নিতে এসেছি।'

ছোট শাবলের পাশে রাখা টিনের কৌটায় বড় বড় দুটো কেঁচো কিলবিল করতে দেখল কিশোর। 'বিড কোথায়?'

'তাঁবু পাহারা দিচ্ছে।'

একটা গাছের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'কিশোর, দেখো, আরও চিহ্ন আছে, আমাদের ক্যাম্পের দিকে গেছে ট্রেইলটা! কি মানে এর, বলো তো? এই চিহ্ন ধরে ধরে আমাদের তাঁবুর কাছে যায় কেউ, আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে?'

পুরো পনেরো সেকেন্ড গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'ডার্ক উডে আমাদের অচেনা বন্ধু আছে কেউ!'

বোকার মত চোখ মিটমিট করছে মুসা। 'মানে!'

ট্রেইলের কথা মুসাকে জানাল রবিন।

শোনার পর মুসা বলল, 'হুঁ। রাইফেলগুলোর কোন খোঁজ পেলে?'

'না,' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'না, তবে মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে। চলো, আগে খেয়ে নিই, তারপর কথা। ক্ষুধায় পেট জ্বলছে।'

চোদ্দ

খাওয়ার সময় মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তখন যে বললে এখানে আমাদের অচেনা একজন বন্ধু আছে, বন্ধুটি কে?'

'এখনও জানি না। দেখা হয়নি। তবে আছে।'

খাওয়া থামিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা, 'দেখো, কিশোর, সব সময় হেঁয়ালি ভাল্লাগে না। দোহাই তোমার, যা বলার সহজ করে বলো।'

হাসল কিশোর। 'মেসেজ দিয়ে যে আমাদেরকে সাবধান করে গেল সে-ই আমাদের বন্ধু। পুকুর পাড়ে ছিপ ফেলে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছে, আমাদের চুরি যাওয়া মালগুলোর সন্ধান সে জানে। গাছের গায়ে চিহ্ন দিয়ে দিয়ে দেখিয়েছে, কোথায় যেতে হবে, গেলে পাওয়া যাবে সেসব জিনিস।'

সবাই খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে এখন। কিশোরের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

'ঠিক বলেছ!' সবার আগে চিৎকার করে উঠল রবিন। তর সইল না আর তার। 'চলো, এখনই বেরোই আবার!'

'যাব, তবে আমি আর মুসা। সবাই যাওয়াটা ঠিক হবে না। একসঙ্গে সব ধরা পড়লে উদ্ধার করার লোক থাকবে না আর কেউ।'

খাওয়ার পর রওনা হয়ে গেল দুজনে। পথ এখন চেনা। ট্রেইল ধরে ধরে এগোল সহজেই। ছাউনিটা দেখা গেল।

হাত তুলল মুসা, 'ওটায় আছে রাইফেলগুলো?'

'না। তবে ইঞ্জিনটা দেখতে চাইলে চলো।'

ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল কিশোর। ইঞ্জিনটা নেই! একপাশে মেঝেতে পড়ে আছে তেরপলটা, যেটা দিয়ে ঢাকা ছিল।

বিড়বিড় করল কিশোর, 'ইঞ্জিনের নম্বরটা অবশ্য মুখস্থ করে রেখেছি, কিন্তু…নিল কি করে এত ভারী একটা ইঞ্জিন! একা কেউ পারবে না। অন্তত তিন-চারজন লোক দরকার।'

'তারমানে আছে ওদের অত লোক।'

বেরিয়ে এল দুজনে। কিশোর বলল, 'নিশ্চয় আরও কোন ট্রেইল আছে। খোঁজো।'

ওদের ক্যাম্প কোনদিকে, জানা আছে। সেদিকে এগোল না। দুই পাশে খুঁজতে লাগল। বাঁ দিকে চলে গেছে আরও একটা ট্রেইল। ক্যাম্প থেকে আসা ট্রেইলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

'হ্যাঁ, এইটাই আসল ট্রেইল,' কিশোর বলল, 'দেখো, চিহ্নগুলো পুরানো। ছাউনির দিকে যেটা গেছে, সেটা এরচেয়ে নতুন।'

'এত ঘোরপ্যাঁচ করে রেখেছে কেন?'

'ঘোরপ্যাঁচটা ও করেনি। করেছে ওর শত্রুপক্ষ। ক্যাম্প থেকে আসা ট্রেইলটা

নিশ্চয় ওদের চোখে পড়েছে। সেজন্যে ওরা নিজেরা আবার কিছু চিহ্ন দিয়ে রেখেছে, অনেক বেশি স্পষ্ট করে, গোলমাল করে দিয়েছে সব। যাতে কেউ পিছু নিলে খালি ঘুরপাক খায়। কিংবা চলে যায় ছাউনির কাছে। চলো, এগোই।'

সাউন্ড ডিটেক্টরটা কানে ঠেকিয়ে রেখেছে কিশোর। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল।

মুসাও দাঁড়িয়ে গেল। 'কি হলো? মানুষ?'

'না, কুকুরের মত ডাক!'

'সেই নেকড়েটা, রবিনকে যেটা আক্রমণ করেছিল?'

'হতে পারে,' কোমরের খাপ থেকে টান মেরে হান্টিং নাইফটা খুলে নিল কিশোর।

মুসাও তার ছুরিটা বের করে নিল। নেকড়ে ঠেকানোর জন্যে এটা যথেষ্ট নয়, জানে, তবু কোন একটা অস্ত্র হাতে থাকা দরকার।

ট্রেইল দেখে দেখে এগিয়ে চলল দুজনে। কিছুদূর এগোনোর পর কিশোর বলল, 'একটা নেকড়ে নয়, অনেক।'

আরও সাবধান হলো ওরা। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। বেরিয়ে এল একটা খোলা জায়গায়। ছয় ফুট উঁচু করে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া। তার ভেতরে পাঁচটা জানোয়ার। ওদের দেখে ভয়ানক স্বরে চাপা গর্জন শুরু করে দিল।

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'নেকড়েই তো!'

'হ্যাঁ।'

'এখানে রেখেছে কেন?'

'জানতে হবে।'

বেড়ার পাশ ঘুরে এগোল ওরা। তারের ওপাশে ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগোল জানোয়ারগুলো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গড়গড় করছে।

বাঁ দিকে গাছপালায় ঘেরা কেবিন দেখা গেল, সামনের দরজা খোলা। ওটার দিকে এগোল দুজনে। কেউ নেই।

'জানালায় লুকিয়ে থেকে দেখছে না তো আমাদের?' কিশোরের কানের কাছে বলল মুসা।

'বোঝা যাচ্ছে না কিছু।'

দরজার কাছাকাছি এসে থেমে গেল ওরা। মুসা বলল, 'ভেতরে ঢুকব।'

'চলো।'

সামনে সরু একচিলতে খোলা জায়গার পর দরজা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে একছুটে জায়গাটুকু পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসা। পেছনে কিশোর। কেউ নেই।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, আমার গা ছমছম করছে···কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল···'

কথা শেষ হলো না ওর, দরজায় দেখা গেল একটা নেকড়ের মুখ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়াল কণ্ঠে গড়গড় করে ঝাঁপ দিল ভেতরে।

ছুরি বাগিয়ে ধরল দুজনে।

হ্যাঁচকা টান লাগল নেকড়ের গলায়, ঝাঁকি লেগে পিছিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ একটা

চিৎকার করে উঠল। এতক্ষণে লক্ষ করল ওরা, গলায় শেকল বাঁধা। জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে শেকল খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করল ওটা।

চাবুকের মত বাতাস কেটে যেন আছড়ে পড়ল আরেকটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'চুপ! চুপ থাক!'

লম্বা, বিশালদেহী একজন লোক এসে দাঁড়াল দরজার বাইরে। হ্যাটটা কপালের ওপর টেনে নামানো। মুখ ভর্তি দাড়ি। রীতিমত একটা দৈত্য। একহাতে পিস্তল আরেক হাতে চাবুক। 'তোমরা এখানে কি করছ?'

নিরীহ ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর, 'দেখতে এসেছি কেউ আছে কিনা। পথ হারিয়েছি আমরা।'

চোখের পাতা কাছাকাছি হলো লোকটার। 'অন্যের জায়গায় বেআইনী ভাবে ঢুকেছ তোমরা।'

'অন্যের জায়গা?'

'হ্যাঁ, এটা সরকারী জায়গা নয়। আমার কেনা। এখানে নেকড়ের খামার করেছি আমি।'

শেকল খোলার চেষ্টা করেই চলেছে নেকড়েটা।

'অ্যাই, কুনার, চুপ থাকতে বললাম না!' কণ্ঠস্বরের মতই শপাং করে উঠল তার হাতের চাবুক। হাঁ করা ভয়ঙ্কর চোয়াল দুটোর দুই ইঞ্চি দূরে সাপের লেজের মত কিলবিল করে উঠল চাবুকের মাথা। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল নেকড়েটা, বসে পড়ল দরজা জুড়ে।

'নেকড়ে কারা কেনে?' জানতে চাইল কিশোর।

'চিড়িয়াখানা। শোনো, একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, এখান থেকে চলে যাও। ভাল চাইলে এ জঙ্গলে আর কখনও আসবে না। বুঝেছ?'

জবাব দিল না কিশোর। লোকটার কাছ থেকে সব কথা জানা হয়নি এখনও। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি একাই এ সব জানোয়ারের দেখাশোনা করেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল কথা, বনের মধ্যে একটা পুকুরের পাড়ে একটা ছিপ পেয়েছি। ওটা কি আপনার?'

'না।'

'কার জানেন?'

'না।'

'আচ্ছা, দু'চারদিনের মধ্যে কি এদিকে কোন প্লেন ক্র্যাশ করেছে?'

'না।'

'নদীর ধারে একটা কুঁড়ে দেখেছি। এখান থেকে খানিক দূরে একটা ছাউনিও দেখলাম। ওগুলোতে কে থাকে জানেন?'

'শোনো,' কঠিন হয়ে উঠল লোকটার গলা, 'আর কোন প্রশ্নের জবাব দেব না আমি। চলে যাও। আর কখনও যেন এদিকে না দেখি।' শপাং করে উঠল তার চাবুক। 'যাও!'

রেগে গেল মুসা, 'যাচ্ছি! কিন্তু এ ভাবে আমাদের চাবুক দেখানোর কোন

প্রয়োজন নেই, আমরা আপনার পোষা নেকড়ে নই।'
জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।
'নেকড়েটাকে দরজা থেকে সরতে বলুন,' আবার বলল মুসা, 'বেরোব।'
যতক্ষণ ওদের দেখা গেল, দরজার সামনের চিলতে জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল লোকটা। চিন্তিত।
বনে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'লোকটার কথা বিশ্বাস করেছ?'
'একবর্ণও না। চিড়িয়াখানায় বিক্রির জন্যে বনের মধ্যে নেকড়ের খামার করেছে ও, এটা একটা ভুয়া গল্প।'
'আমার তো মনে হয় মানুষকে বনে ঢুকতে না দেয়ার জন্যে নেকড়ে পোষে সে।'
'হতে পারে। ভেবেছে, নেকড়ে দেখলে ভয়ে আর ঢুকবে না কেউ। রবিনকে তাড়া করল না সেদিন! মানুষ দেখলেই যদি ওরকম তাড়া করে, কে আর ঢুকতে চাইবে।'
ডিটেক্টর কানে লাগিয়ে স্থির হয়ে গেল কিশোর। 'ঝোপঝাড় ভেঙে আসছে কে যেন!'
'কুনারকে ছেড়ে দিল নাকি?'
'জলদি গাছে ওঠো!'
খানিক দূর দৌড়ে এসে পাশাপাশি একজোড়া ফার গাছ দেখে তার একটাতে চড়ে বসল দুজনে। ওরাও উঠল, নেকড়েটাও পৌঁছে গেল। ঠিকই অনুমান করেছে মুসা, কুনারকেই ছেড়ে দিয়েছে। ওরা যেন কোনমতেই কেবিনের আশেপাশে আর ঘুরঘুর করতে না পারে সেজন্যে ছেড়ে দিয়েছে ওটাকে লোকটা।
গাছের গোড়ায় এসে সামনের দু'পা তুলে দিয়ে আঁচড় কাটতে শুরু করল নেকড়েটা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গড়গড় করে চলেছে।
একটা ডাল ভেঙে নিয়ে ওটার নাক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল মুসা।
গাঁক করে উঠল নেকড়েটা। গেল তো না-ই, আরও রেগে গিয়ে গাছের গোড়ায় চক্কর দিয়ে বেড়াতে লাগল।
'এটা যাবে বলে মনে হয় না,' মুসা বলল। 'আল্লাহই জানে কদিন আটকে রাখবে!'
'ওকে আটকাতে হবে,' কিশোর বলল। 'শোনো, লম্বা দেখে একটা ডাল কাটো।'
'তাতে কি হবে?'
'তোমাকে যা বলছি করো। বাকিটা আমি করছি।'
ডাল কাটতে শুরু করল মুসা।
পকেট থেকে নাইলনের দড়ির একটা বান্ডিল বের করল কিশোর। একমাথায় একটা ফাঁস তৈরি করল। মুসার ডালটা কাটা হয়ে গেলে সেটা নিয়ে দড়ির আরেক প্রান্ত শক্ত করে বাঁধল ডালের মাথায়। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে। 'নাও, গলায় ফাঁস পরিয়ে দাও।'
এ সব কাজে ওস্তাদ দুজনেই। আমাজন আর আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গলে গিয়ে

নেকড়ের চেয়েও অনেক বেশি হিংস্র আর শক্তিশালী বুনো জানোয়ার ধরে এনেছে। কুনারকে ধরাটা কোন ব্যাপারই হলো না মুসার জন্যে। ডালের একমাথা ধরে আরেক মাথা নিচু করে ফাঁসটা নামিয়ে দিল নিচে। রাগে অস্থির হয়ে দড়িটাকেই কামড়াতে এল জানোয়ারটা। চোখের পলকে ওর নাক গলিয়ে ফাঁসটা গলার কাছে এসে হ্যাঁচকা টান মারল সে। আটকে গেল কুনার।

ডালের মাথা চেপে ধরে টানতে লাগল দুজনে। বেজায় ভারী জানোয়ার, টেনে তোলা কঠিন। থাবা মেরে দড়িটা ধরার চেষ্টা করতে লাগল নেকড়ে, মারাত্মক ধারাল দাঁত বের করে গর্জন করছে সমানে।

'বাপরে বাপ!' মুসা বলল, 'একটন হবে ওজন!'

জায়গামত বসেনি ফাঁস, পিছলে সরে গেল। মাটিতে পড়ে গেল নেকড়েটা।

গাছের গোড়ায় আগের মতই চক্কর দিতে লাগল ওটা। তবে সাবধান হয়ে গেছে। ফাঁসের কাছে এল না আর।

ওটাকে তাড়ানোর কিংবা ওটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় বের করা গেল না। কি করবে ভাবছে কিশোর, এই সময় শোনা গেল সাইরেনের শব্দ।

'কিশোর, দেখো দেখো, নেকড়েটা চলে যাচ্ছে!'

রহস্যময় শব্দটা যেন কষ্ট দিচ্ছে নেকড়ের কানকে। দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে চলে যাচ্ছে।

'ভয় পাচ্ছে কেমন দেখো,' কিশোর বলল, 'ওর কানের পর্দা সহ্য করতে পারছে না এই শব্দ।'

মাটিতে নামল দুজনে। হেসে বলল মুসা, 'আমি তো ভেবেছিলাম যতদিন বাঁচব গাছের ওপরই বাস করতে হবে।'

আবার কখন ফিরে আসে নেকড়েটা এই ভয়ে ওখানে আর দেরি করার সাহস হলো না ওদের। নৌকাটা বের করে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলল।

পনেরো

ক্যাম্পে যখন ফিরে এল ওরা, পশ্চিম দিগন্তে তখন ঢলে পড়েছে সূর্য, গাছপালার মাথার ওপাশে হারিয়ে গেছে।

খবর শোনার জন্যে ছুটে এল টম, বিড আর রবিন।

সব শুনে রবিন বলল, 'এখন দেখলে তো, বুনো কুকুর নয়, নেকড়েতেই তাড়া করেছিল আমাকে, ভুল বলিনি।'

টম বলল, 'তোমাদের গন্ধ শুঁকে শুঁকে যদি এখানে চলে আসে ওটা? রাতের বেলা এসে হামলা করে? চলো, কেটে পড়ি সময় থাকতে।'

কিশোর বলল, 'তা পারবে বলে মনে হয় না। বড়জোর নদীর কিনারে যেখানে নৌকা নামিয়েছি আমরা, সেখান পর্যন্ত আসতে পারবে। তারপর পানিতে আর গন্ধ পাবে না। তবু, ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি না। নেকড়ে যাতে আমাদের নাগাল না পায়, সে

ব্যবস্থা করব।'

'ব্যবস্থা যাই করো, সেটা খাওয়ার পর,' হাত নেড়ে মুসা বলল, 'টম, রান্নাবান্না কি করেছ, বলো। খিদেয় পেট জ্বলছে। বনের মধ্যে ঘোরা কি যা-তা পরিশ্রম।'

'ছয়টা ট্রাউট ধরা হয়েছে,' দুই হাত দুদিকে ছড়াল রবিন, 'ইয়া বড় একেকটা।'

'কেঁচোগুলো সব শেষ?'

'কেন, আফসোস হচ্ছে?' হেসে ফেলল রবিন। 'খাওয়ার ইচ্ছে ছিল নাকি?'

'না, তা ছিল না। এত কষ্ট করে জোগাড় করে আনলাম, জানতে চাইছি তোমরা সব শেষ করে ফেলেছ নাকি। আমারও ট্রাউট ধরার শখ আছে। আর কেঁচো খাওয়া নিয়ে অত ঘেন্না করার কিছু নেই। কেঁচোও খায় মানুষ, তা জানো? আফ্রিকার মাউন্টেইনস অভ দা মুনের জংলীরা তিন-চার ফুট লম্বা কেঁচো পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে...'

'ওয়াক, থুহ্! আর বোলো না, বোলো না,' জোরে জোরে দুহাত নাড়তে লাগল বিড, 'বমি করে ফেলব!'

খেতে খেতে কিশোর বলল তার পরিকল্পনার কথা। কি করে আটকাবে নেকড়েটাকে।

খাওয়ার পর ডাল কাটতে গেল সবাই। নদীর পাড়ে বেশ কিছু বড় গাছ জন্মে আছে। দেখতে দেখতে ডাল কেটে স্তূপ করে ফেলল ওরা। মাটিতে সেগুলো পুঁতে, লতা দিয়ে বেঁধে একটা ঘর তৈরি করল। তাতে ছোট একটা গেট রাখল। পাল্লা বানাল এমন ভাবে, যাতে দড়ির সাহায্যে নামিয়ে দেয়া যায়। দড়ি ছুটে গেলেই ঝপ করে পাল্লা পড়ে বন্ধ হয়ে যাবে গেট। এটা একধরনের ফাঁদ। বনের মধ্যে এ ভাবে কয়োট, নেকড়ে, শেয়াল এ সব প্রাণী ধরে পেশাদার শিকারিরা।

চারপাশ থেকে ঘুরে দেখে কিশোর বলল, 'ব্যস, হয়ে গেল ফাঁদ। এখন একটা টোপ রেখে দিলেই হয়।'

আস্ত দুটো ট্রাউট মাছ রয়ে গেছে। ওগুলোর একটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল সে। সেটাকে খেতে হলে এখন ঘেরের ভেতর ঢুকতে হবে নেকড়েকে। কামড়ে ধরে মাছটাকে যেই টান দেবে অমনি ফাঁদের পাল্লা যাবে পড়ে, আটকা পড়বে ওটা।

'ফাঁদ তো হলো,' বিড বলল, 'কিন্তু মাছের চেয়ে যদি আমাদের দিকেই নজর বেশি দেয় নেকড়েটা?'

'তা দেবে বলে মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'লোভনীয় খাবারের গন্ধ পেলে আগে ওদিকেই যাবে।'

ক্যাম্পের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। তবে তাঁবু থেকে দেখা যায়। নেকড়ে এলে চোখে পড়বে।

কাজ শেষ করে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমাতে গেল না ওরা। অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে গল্প করতে লাগল।

হাই তুলতে শুরু করল রবিন, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'চলো, শুয়ে পড়ি,' বিডও হাই তুলতে লাগল।

কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল মুসা, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে

বলল, 'এসে গেছে!'

ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। ফাঁদের দরজার সামনে দেখা গেল দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। আগুনের দিকে তাকালেই ঝিক করে উঠছে।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল চোখজোড়া। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে ছেলেরা। কয়েক সেকেন্ড পর ঝপ করে পাল্লা পড়ার শব্দ হতেই চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল মুসা, 'পড়েছে! পড়েছে!'

টর্চ হাতে দৌড় দিল সে। তার পেছনে বাকি সবাই।

রাগে গর্জন শুরু করল নেকড়েটা। বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ফাঁদের গায়ে। থাবা মেরে, কামড়ে, ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। কেঁপে উঠতে লাগল ফাঁদের দেয়াল। তবে মোটা পাকানো লতায় বাঁধা কাঁচা ডালের বেড়া ভাঙা অত সহজ নয়।

নেকড়েটা যেদিকে বেড়া কামড়াচ্ছে তার উল্টোদিকের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে আলো ফেলল মুসা। বিশাল একটা নেকড়ে ধরা পড়েছে। পোষা কুকুরের মত গলায় কলার পরানো রয়েছে ওটার। তীব্র আলো সহ্য করতে না পেরে কুঁকড়ে গেল। দাঁত-মুখ খিঁচাতে লাগল ওখানে থেকে।

'কুনার!' বলে উঠল মুসা। 'ঠিকই চলে এল!'

বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে জানোয়ারটাকে দেখতে লাগল সবাই।

বিড জিজ্ঞেস করল, 'এটাই তাড়া করেছিল তোমাদেরকে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন।

'কিশোর, কি করা যায় এটাকে?'

ভাবছে কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'আস্তে কথা বলো। গন্ধ শুঁকে আসেনি এটা। আমি শিওর, ওর মালিক কাছাকাছিই কোথাও আছে, আমাদের দেখছে এখন। নেকড়েটাকে নিয়ে এসেছে সে। আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে। যাতে এখানে না থাকি আমরা।'

'একা আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে পারবে না,' টম বলল। 'কিন্তু সঙ্গে যদি বন্দুক থাকে?'

'থাকতেই পারে। শোনো, আমি যা করতে বলব, করবে, কোন প্রশ্ন করবে না,' বলে গলা চড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল কিশোর, 'ধুর, এখানে কে থাকে! এটা কোন জায়গা হলো! নেকড়ের ভয়ে সারাক্ষণ কাতর হয়ে থাকা। চলে যাওয়াই ভাল এখান থেকে।'

কিশোরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল রবিন—লোকটাকে শোনাতে চাইছে, বলল, 'কিন্তু আর কিসের ভয়? নেকড়েটা তো আটকা পড়েছে।'

'একটা পড়েছে, তাতে কি? আরও আছে। দল বেঁধে এলে ঠেকাতে পারব না, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে আমাদের।'

'তাহলে কি করতে চাও?'

'কি আর। ভোরে উঠেই চলে যাব। এই পচা জায়গায় কে থাকে।'

'সত্যি চলে যাবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যাব। তবে ফিরে আসব আবার, লুকিয়ে, যাতে লোকটা জানতে না পারে।'

ঘুমাতে চলল ওরা। নেকড়েটাকে আটকে ফেলেছে বটে, কিন্তু আর কি ঘটে বলা যায় না। তাই পালা করে পাহারার ব্যবস্থা করল।

নিরাপদেই কাটল রাত। আর কিছু ঘটল না।

সকালে উঠে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করার পর কিশোর বলল, 'রবিন, তুমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে টম আর বিডের সঙ্গে নৌকায় করে চলে যাও। ভাঁটির দিকে এগোলে এক না এক সময় সাগরে পড়বেই। জেটির দিকে চলে যেয়ো। আমি আর মুসা হেঁটে যাব শিপরিজে, গাড়িটা নিয়ে যাব।'

'নেকড়েটাকে কি করব?' বিড বলল, 'এখানে আটকা থাকলে বেরোতেও পারবে না ওটা, না খেয়ে মরবে। সেটা করা ঠিক হবে না।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'চিন্তার কোন কারণ নেই, মরবে না। আমরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে এসে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে।'

ষোলো

নৌকায় করে রওনা হয়ে গেল রবিনরা। যতক্ষণ দেখা গেল ওদের, তাকিয়ে রইল মুসা আর কিশোর। তারপর পিঠে প্যাক ঝুলিয়ে রওনা হয়ে গেল।

কয়েক মিনিট হেঁটেই দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'চলো, ফিরে যাই।'

'কোথায়?'

'নেকড়েটাকে খুলে নিয়ে যায় কিনা লোকটা, দেখব।'

পিঠের বোঝা খুলে একটা ঝোপে লুকিয়ে রেখে ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল দুজনে। কাছাকাছি এসে বড় একটা পাথরের চাঙড়ের আড়ালে লুকিয়ে বসল। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফাঁদটা। লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে নেকড়েটা। মাঝে মাঝে নাক তুলে ছোট ছোট হাঁক ছাড়ছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ওটা। অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল ফাঁদের মধ্যে। গড়গড় করতে লাগল। বার বার তাকাচ্ছে বনের দিকে।

'গন্ধ পেয়ে গেল নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

'হয়তো।'

'দাঁড়াও, দেখি।' একমুঠো ধুলো নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দেখল কিশোর, কোনদিকে পড়ে। মাথা নাড়ল, 'না, আমাদের গন্ধ পাবে না, বাতাসের উজানে রয়েছি আমরা। নিশ্চয় ওর মনিবের।'

দুই মিনিট পর ঝোপের ভেতর কারও এগোনোর শব্দ শোনা গেল। বাড়ল শব্দটা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিরিডি। নিজেকে গোপন করার কোন চেষ্টা নেই। সে নিশ্চিত, ছেলেগুলো চলে গেছে।

সোজা ফাঁদটার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজা খুলে দিল। নেকড়েটা দরজার কাছে আসতে হিসিয়ে উঠল তার হাতের চাবুক। কুঁকড়ে গেল নেকড়েটা। সঙ্গে

সঙ্গে একটা শেকল লাগানো কলার পরিয়ে দিল ওটার গলায়।

'গাধা কোথাকার!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করতে লাগল বিরিডি। 'লজ্জা করে না, কয়েকটা ছেলের কাছে ধরা খেলি!' চাবুকের ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মারল নেকড়ের পিঠে। ভীত কুকুরের মত কুঁই কুঁই করে লোকটার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল ওটা।

রাগ গেল না বিরিডির। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে দেখতে লাগল ফাঁদটা। তারপর হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর। হ্যাঁচকা টানে লতা ছিঁড়ে এক এক করে মাটি থেকে টেনে তুলতে লাগল ডালগুলো। আছাড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। পুরো ফাঁদটাকে না ধসিয়ে থামল না। তারপরেও তার রাগ কমল কিনা বোঝা গেল না। শেকল ধরে নেকড়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে ঢুকে গেল বনের ভেতর।

'খাইছে! রাগ কি ব্যাটার! ওর হাতে ধরা পড়লে কপালে দুঃখ আছে আমাদের,' মুসা বলল। 'দেখলাম তো, খুলে নিয়ে গেল, এবার কি করব? ওর পিছু নেব?'

'না, বাড়ি ফিরে যাব।'

দুপুরের পর রকি বীচে পৌঁছল দুজনে। ইয়ার্ডে ঢুকতেই মেরিচাচী জানালেন, কিডন্যাপারদের কবুতরটা খাঁচাসহ চুরি হয়ে গেছে গ্যারেজ থেকে। রাতের বেলা এসেছিল চোর।

মুসাকে নিয়ে দেখতে গেল কিশোর। পেছনের জানালার একটা কাঁচ খোলা, ওদিক দিয়েই ঢুকেছে চোর।

কে নিয়েছে, অনুমান করতে পারছে কিশোর। ওকে যারা কিডন্যাপ করেছিল, ওদের কেউ। কিন্তু কেন নিল? একটাই জবাব, বিমান নিয়ে অনুসরণ করে যাতে ওদের আস্তানায় পৌঁছতে না পারে গোয়েন্দারা।

হাতমুখ ধুয়ে চা খাওয়ার পর ভিকটর সাইমনকে ফোন করল কিশোর। ওরা ফিরেছে শুনে খুশি হলেন তিনি। তখুনি যেতে বললেন ওদের। খবর শুনবেন।

তিন গোয়েন্দার ডার্ক উড অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী মন দিয়ে শুনলেন সাইমন। রেডিওতে খবর শুনে ল্যারি কংকলিনকে যে বনের ভেতর খুঁজেছে ওরা, এ কথাও জানাল কিশোর।

সব শোনার পর সাইমন বললেন, 'বেশ কিছু তথ্য আমিও পেয়েছি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, ট্রেজারি থেকে যারা টাকা চুরি করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিডন্যাপার আর রাইফেল চোরদের। আমেরিকা থেকে প্রচুর রাইফেল আর গোলাবারুদ স্মাগল করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। গতকাল একটা বোট ধরা পড়েছে কোস্ট গার্ডদের হাতে। তাতে বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে পড়ল, একটা দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওগুলো। এর বেশি কিছু বলতে পারল না বোটের তিন নাবিক। কোস্ট গার্ডদের সন্দেহ, বোটে করে নিয়ে গিয়ে দ্বীপে ওগুলো নামিয়ে দেয়ার পর বড় কোন জাহাজ এসে তুলে নেবে। নিয়ে যাবে অন্য কোথাও, আমেরিকার বাইরের কোন দেশে। বড় ধরনের কিছু একটা করতে যাচ্ছে কেউ। কি, সেটা এখনও জানা যায়নি।'

'আমার খালুর রাইফেলগুলোও তাহলে পাচার হয়ে গেছে,' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা।

'যেতে পারে,' সাইমন বললেন। 'কিংবা হয়তো এখনও ডার্ক উডেই লুকানো আছে ওগুলো। তোমাদের কথা শুনে একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছি, চোরাচালানীদের আস্তানা ডার্ক উডেই কোথাও রয়েছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' একমত হলো কিশোর।

'ওখানেই খুঁজতে হবে ভালমত। দেখি, পারলে এবার আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।'

'কবে?'

'আজ হবে না, একটা জরুরী কাজ সারতে হবে। কাল যাব।'

'আমরাও আজ পারব না। রবিনরা ফেরেনি এখনও। ওকে নিতে হলে কালকেই যেতে হবে।'

'আজ বরং এক কাজ করো। শিপরিজে চলে যাও দুজনে। বনের একেবারে ধার ঘেঁষে যে সব বাড়ি আছে, তার বাসিন্দাদের কাছে গিয়ে খোঁজ-খবর নাও। নতুন তথ্য পেতে পারো। বলা যায় না, ভাগ্য ভাল হলে ওদের কথা থেকে স্মাগলারদের ঘাঁটির খোঁজও পেয়ে যেতে পারো।'

মিস্টার সাইমনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শিপরিজে চলল দুজনে। বনের কিনারে এসে রাস্তার ওপর গাড়ি রাখল। হেঁটে চলল সবচেয়ে প্রথম বাড়িটার দিকে।

বনের কিনারের প্রতিটি বাড়িতে থেমে খোঁজ-খবর নিতে লাগল। বেশির ভাগ চাষীরই বন বা এর জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই। দু'চারজন কেবল শেয়ালের কথা বলল। বন থেকে বেরিয়ে এসে রাতের বেলা খোঁয়াড় থেকে মুরগী ধরে নিয়ে যায়।

একটা খামারবাড়ি থেকে বেরোতে রাস্তা দিয়ে একজন বুড়ো লোককে হেঁটে যেতে দেখল ওরা। সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা। ওরা ডাক দিতেই দাঁড়িয়ে গেল।

'সারাদিন কাজ করেছেন মনে হয়?' হেসে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

'হ্যাঁ, সারাটা দিনই খেতে কাজ করতে হয়েছে,' রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল বুড়ো। কিশোর আর মুসার ওপর চোখ বোলাল।

'বাড়ি কোথায় আপনার? আমাদের গাড়ি আছে। বেশি দূরে হলে পৌঁছে দিই।'

'না, লাগবে না, ধন্যবাদ। আমার বাড়ি কাছেই। হেঁটে চলে যেতে পারব।'

লোকটার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল কিশোর। বনের কথা তুলল।

হাসল বুড়ো। 'ডার্ক উড থেকে দূরে থাকলেই ভাল করবে। আমি তো কাউকে ঢুকতে দেখলেই মানা করি। অনেক দিন আগে ঢুকেছিলাম একবার। দুপুর বেলা বসলাম জিরানোর জন্যে। পাশে একটা গর্ত। তাকিয়ে দেখি কি, ওর মধ্যে কিলবিল করছে শুধু সাপ আর সাপ। এক জায়গায় এত সাপ আর কখনও দেখিনি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। উঠে সোজা বাড়ি রওনা হলাম। বুঝলাম, ডার্ক উড নামটা খামাখা রাখা হয়নি, জায়গা ভাল না মোটেও। তারপর রয়েছে সেই বুনো কুকুরের দল। আমার কাছে কিন্তু নেকড়েই মনে হয়, বুঝলে, বেশ কয়েকবার রাতের বেলা ডাক শুনেছি। দেখিনি অবশ্য একটাকেও। দেখবই বা কিভাবে। বনে তো আর ঢুকি না। আমার কথা যদি মানো, ওর মধ্যে ঢুকতে যেয়ো না। পিকনিক করার জন্যেও নয়।'

নেকড়ের কথা শুনে চট করে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'আপনার কি মনে হয় বনের ভেতর চোর-ডাকাতের আড্ডা আছে?'

'নাহ্, মনে হয় না। চোর-ডাকাতেরও জানের ভয় আছে।'

বুড়োর বাড়ি এসে গেল। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আরেকটা বাড়ির দিকে এগোল দুজনে।

এই বাড়ির মালিকও বুড়ো। বনের কথা জিজ্ঞেস করতে নানা রকম উদ্ভট গল্প জুড়ে দিল। বলল, বনের মধ্যে কেউ ঢুকলে আর রক্ষা নেই, নির্ঘাত মারা পড়বে। তার মতে পোষা জানোয়ার কিংবা মানুষ যাই ঢুকুক না কেন ওই বনে, প্রাণ নিয়ে আর বেরোতে পারবে না। ওদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদও নাকি শুনেছে অনেকে রাতের বেলা।

'আপনি শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, আমি শুনিনি। তবে আমি সাইরেনের শব্দ শুনেছি। ওটা যে কেন বাজে বনের মধ্যে, সেটাও এক রহস্য।'

এই বুড়োও জানাল, ডার্ক উডে পারতপক্ষে যেতে চায় না লোকে। বনের গভীরে, পর্বতের কিনারে তো নয়ই। রাতে মাঝেমধ্যে বুনো কুকুরের ডাক শোনা যায়। কখনও হেলিকপ্টার উড়ে যায় বনের ওপর দিয়ে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। যেতেই পারে।

নতুন কোন তথ্য জানা গেল না। রকি বীচে ফিরে চলল ওরা।

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। পাশে বসা কিশোর বলল, 'গল্পগুলো রঙ চড়ানো হলেও আজগুবি নয়। সাইরেন আমরাও শুনেছি। হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়ার শব্দ পেয়েছি। নেকড়ে তো নিজের চোখেই দেখলাম।'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর কিশোর বলল, 'যাই বলো, সব রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে বিরিডির কেবিনে। সেখানেই তল্লাশি চালাতে হবে আগামীকাল।'

'রবিনরা নিশ্চয় এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে, কি বলো?'

ঘড়ি দেখল কিশোর, 'মনে হয়।'

সতেরো

পরদিন সকালে নাস্তার পর মিস্টার সাইমনের টেলিফোন পেল কিশোর। লস অ্যাঞ্জেলেসের এক বিমান তৈরির কারখানা থেকে করেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

ওদেরকে ওখানে চলে আসতে অনুরোধ করলেন।

মুসা আর রবিনকে খবর দিয়ে আনিয়ে, রওনা হতে হতে বেশ দেরি হয়ে গেল কিশোরের। সাড়ে এগারোটা নাগাদ হলিউডে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা।

হলিউডের একধারে একটা প্রায় নির্জন অঞ্চলে অনেক বড় এলাকা ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া, তার ভেতরে বিমান তৈরির কারখানা। গেটে কড়া পাহারা। আগেই বলে রাখা হয়েছে প্রহরীকে, সুতরাং তিন গোয়েন্দা পরিচয় দিতেই ওদের ছেড়ে দিল সে।

কোম্পানির চেয়ারম্যানের নাম কোরাজন ভ্যালডেজ। তাঁর অফিসে অপেক্ষা করছেন মিস্টার সাইমন।

ছেলেরা ঢুকতেই ওদের সঙ্গে চেয়ারম্যানের পরিচয় করিয়ে দিলেন সাইমন, 'মিস্টার ভ্যালডেজ, এরাই তিন গোয়েন্দা।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন চেয়ারম্যান। হাত মেলানোর পর চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, 'বসো।'

মিস্টার সাইমন গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কাল রাতে এখানে একটা ডাকাতি হয়েছে। প্লেন চালাতে কাজে লাগে এমন কিছু যন্ত্রপাতি। ওগুলো স্পেশাল অর্ডারে তৈরি করা হয়েছিল আমেরিকান বিমান বাহিনীর জন্যে।'

চুপ করে রইল তিন গোয়েন্দা। সাইমন আর কি বলেন, শোনার অপেক্ষা করছে কিশোর।

'তোমাদের কেন ডেকেছি, বলি,' সাইমন বললেন, 'আমার আর মিস্টার ভ্যালডেজের সন্দেহ, চোরের কোন সহকারী কাজ করে এখানে। পত্রিকা অফিস থেকে বেরোনোর পর যারা তোমাদের পিছু নিয়েছিল তাদের কেউ, কিংবা সেই লাল চুলওয়ালা লোকটা। আছে কিনা খুঁজে দেখো। ওদের দেখলেও তাকাবে না, কিছু জিজ্ঞেস করবে না; ভান করবে যেন কারখানা দেখতে এসেছ।'

বেল বাজিয়ে একজন জুনিয়র অফিসারকে ডেকে আনালেন ভ্যালডেজ। কারখানা ঘুরে দেখানোর জন্যে ছেলেদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট দেখে বেরোতে যাবে ওরা, থমকে দাঁড়াল রবিন। কিশোরের দিকে কাত হয়ে বলল, 'কিশোর, ওই ইঞ্জিনটা দেখো!'

'দেখেছি,' নিচু গলায় বলল কিশোর, 'বনের মধ্যে ছাউনিতে যেটা দেখেছিলাম, অবিকল সেরকম।'

পুরো কারখানা ঘুরেও পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না তিন গোয়েন্দা। ফিরে এল চেয়ারম্যানের অফিসে। মিস্টার সাইমনকে ইঞ্জিনটার কথা বলল কিশোর।

চেয়ারম্যানের দিকে ফিরলেন সাইমন, 'আপনাদের এখান থেকে কোন ইঞ্জিন চুরি গেছে?'

'অনেকগুলো,' ভ্যালডেজ বললেন। 'আমরা ভেবেছি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি হারিয়েছে ওগুলো। খোঁজ লাগিয়েছি, কিন্তু একটাও পাওয়া যায়নি এখনও।'

'আমরা একটা দেখেছি,' কিশোর বলল, 'কিন্তু পরে আবার গিয়ে দেখি, নেই।' কোথায় দেখেছে ইঞ্জিনটা, বলল সে।

আপাতত আর কোন কাজ নেই এখানে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে সাইমনও উঠে

দাঁড়ালেন। সাহায্যের জন্যে ওদেরকে ধন্যবাদ দিলেন ভ্যালডেজ।

চেয়ারম্যানের অফিস থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাইমন, 'কোথায় যাবে?'

'আর কোন কাজ না থাকলে বাড়ি যাব,' জবাব দিল কিশোর।

'চলো, আগে আমার বাড়িতে, কথা আছে।'

কারখানা থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে আগে আগে চললেন সাইমন। পেছনে সেটাকে অনুসরণ করল মুসার জেলপি।

বাড়িতে ঢুকতেই একটা খাম এনে দিল সাইমনের রাঁধুনি নিসান জাং কিম। বলল, 'খানিক আগে একজন পুলিশম্যান দিয়ে গেছে।'

ছেলেদের নিয়ে বিশাল ড্রইং রুমে এসে বসলেন সাইমন। খামটা খুলে পড়লেন। 'বাহ্, চমৎকার! এটাই আশা করেছিলাম।' মুখ তুলে বললেন, 'পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, গত কিছুদিনে আর কোন কারখানায় চুরি হয়েছে কিনা। একটা লিস্ট দিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস আর এর আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে পাঁচটা অ্যারোপ্লেন ফ্যাক্টরি আর তিনটা বন্দুকের কারখানায় চুরি হয়েছে। প্লেনের যন্ত্রাংশ এবং রাইফেল।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। আবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িতে কোন জরুরী কাজ আছে তোমাদের?'

'আমার নেই,' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের?'

মাথা নাড়ল দুজনেই।

'গুড,' সাইমন বললেন, 'আমার সঙ্গে ডার্ক উডে যেতে হবে তোমাদের। পারবে?'

'পারব,' জবাব দিল কিশোর।

'তাহলে বাড়িতে ফোন করে দাও, এখান থেকেই রওনা হব আমরা।'

যার যার বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল তিন গোয়েন্দা মিস্টার সাইমনের সঙ্গে ডার্ক উডে যাচ্ছে। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

কিমকে ডেকে টেবিলে খাবার দিতে বললেন সাইমন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়, প্লেনের ইঞ্জিন চুরির সঙ্গে রাইফেল চুরির কোন সম্পর্ক আছে?'

'তদন্ত করে তথ্য আর প্রমাণ যা পেয়েছি, তাতে ধারণা করছি ইয়টে করে পাচার করা হচ্ছে ওগুলো। ডাঙা থেকে সাগরে জাহাজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে চোরেরা।'

'ডার্ক উডে আস্তানা গেড়েছে ওরা?'

'সেরকমই সন্দেহ করছি।'

খাওয়া সেরে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে স্টাডিতে ঢুকলেন সাইমন। দুটো পিস্তল বের করে একটা রাখলেন পকেটে, অন্যটা শোল্ডার হোলস্টারে। অদ্ভুত দেখতে দ্বিতীয় পিস্তলটা। বললেন, 'এটা একটা স্পেশাল গান। গুলি বেরোয় না। ট্রিগার টিপলে গ্যাস বেরোয়, অ্যানাসথেটিকের কাজ করে।'

কিমকে সাবধানে থাকতে বলে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

আঠারো

পথ এখন চেনা। ড্রাইভ করল মুসা। ডার্ক উডের যতটা সম্ভব ভেতরে গাড়ি নিয়ে গেল।

গভীর বনের মধ্যে গাড়ি যখন আর চলে না, তখন নেমে হেঁটে এগোল নেকড়ের খামারের দিকে। তিন গোয়েন্দার কেউই টের পেল না, ছায়ার মত নিঃশব্দে ওদের পিছু নিয়েছে আরেকজন মানুষ।

একটানা আধঘণ্টা এগোনোর পর সামনে শোনা গেল নেকড়ের ডাক।

'ওই যে, ডাকাডাকি শুরু করেছে,' মুসা বলল।

'নিশ্চয় আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে,' বলল রবিন।

বিশাল হান্টিং নাইফটা খুলে হাতে নিল মুসা। আগে আগে চলেছে। কতগুলো কাঁটাঝোপের অন্যপাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। 'ওই যে, খোঁয়াড়।'

কাঁটাতারের ঘেরের ভেতরে নেকড়েগুলোকে দেখলেন মিস্টার সাইমন। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে ওগুলো। হোলস্টার থেকে গ্যাস-গানটা বের করলেন। 'ওগুলোর ব্যবস্থা করছি। তোমরা গিয়ে দেখো লোকটা কোথায়। ওকে ব্যস্ত রাখো।'

ঘন ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়লেন সাইমন। আড়ালে আড়ালে চলে যাবেন ঘেরের কাছে।

তিন গোয়েন্দাও ঝোপের আড়ালে থেকে কেবিনের দিকে এগোল।

চিলতে খোলা জায়গাটুকু পার হয়ে সবে দরজার সামনে পৌঁছেছে ওরা, হঠাৎ বেরিয়ে এল দাড়িওয়ালা নেকড়ে-মানব, হাতে একটা বন্দুক। সঙ্গে আরেকজন ছোটখাট লোক। সামান্য কুঁজো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

গোয়েন্দাদের দেখে জ্বলে উঠল নেকড়ে-মানবের চোখ, হাতের বন্দুক নেড়ে ধমকে উঠল, 'এখানে আসতে মানা করেছিলাম না?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

অন্য লোকটা নেকড়ে-মানবের দিকে তাকিয়ে হাসল, দুটো ভাঙা দাঁত দেখা গেল তার। 'কে ওরা, বিরিডি? তোমার দোস্ত?'

জবাব দিল না নেকড়ে-মানব। ফিরে তাকিয়ে ডাক দিল, 'কুনার, আয় তো এখানে!'

দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল নেকড়েটা। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চোখ লাল করে গড়গড় করতে লাগল। মনিবের আদেশ পেলেই টুঁটি ছিঁড়তে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বেল্টে ঝোলানো ছুরির খাপে হাত দিল কিশোর আর রবিন। মুসারটা হাতেই আছে।

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ এক হাঁক ছাড়ল কুনার।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বিরিডিও তাকাল সেদিকে। আচমকা চিৎকার করে উঠল, 'ঘেরের কাছে গেছে কেউ! কুনার, জলদি যা, ধর গিয়ে ব্যাটাকে!'

চোখের পলকে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল নেকড়েটা।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর, তারপর দৌড় দিল নেকড়ের পেছনে। মুসা আর রবিনও ছুটল।

ওরা খাঁচার কাছে যাওয়ার আগেই গুলির শব্দ হলো একটা। পরমুহূর্তে যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, এবং তারপর নীরবতা।

ঘেরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। মরে পড়ে আছে কুনার। ভেতরের নেকড়েগুলো বেহুঁশ। মিস্টার সাইমন নেই।

দুপদাপ করে দৌড়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়াল বিরিডি আর তার সঙ্গী। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সামনের দৃশ্যের দিকে। তারপর অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠে ঘুরে বনের দিকে দৌড় মারল ছোটখাট লোকটা।

'এই ওয়াল্ট, কোথায় যাচ্ছ, দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠল বিরিডি।

দাঁড়াল না খাটো লোকটা, পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নেকড়েগুলো খতম, আর আমাকে ঠেকাতে পারবে না, আমি যাচ্ছি।'

গুলি করল বিরিডি। ততক্ষণে গাছের আড়ালে চলে গেছে ওয়াল্ট। গুলি লাগল না তার গায়ে।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'পালাও! ও এখনও বোঝেনি ওর নেকড়ে মারার পেছনে আমাদের হাত আছে। বুঝলেই গুলি শুরু করবে।'

'ওয়াল্টকে ধরা দরকার আমাদের,' মুসা বলল, 'ও নিশ্চয় অনেক কিছু জানে।'

'ঠিক বলেছ।'

প্রায় দৌড়ে এসে বনে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। বাধা দিল না বিরিডি। সে তো চায়ই ওরা চলে যাক এখান থেকে। বনে ঢুকে ওয়াল্টের পেছনে ছুটল ওরা। চলে এল তার কাছে।

ডাইভ দিল মুসা। ওয়াল্টকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

লোকটাকে তুলে বসানো হলো। দুদিক থেকে চেপে ধরে রাখল মুসা আর রবিন।

'ছাড়ো!' গুঙিয়ে উঠল লোকটা, 'ছেড়ে দাও! বিরিডি এসে ধরে ফেললে আর ছাড়বে না আমাকে!'

মুখোমুখি বসল কিশোর, 'সব কথা না বললে আমরাও ছাড়ব না আপনাকে। এখন বলুন দেখি, আপনি কে? এখানে এ সব কি ঘটছে?'

চুপ করে রইল ওয়াল্ট।

'বলবেন না? বেশ, আমি বরং বলি, দেখুন মেলে কিনা,' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর, 'আপনি একটা চোর। একটা ট্রাক থেকে কিছু রাইফেল আর ক্যাম্পিঙের জিনিসপত্র চুরি করে এনেছেন। তাই না?'

জবাব দিল না ওয়াল্ট।

'স্বীকার না করলে ধরে নিয়ে গিয়ে বিরিডির হাতে তুলে দেব আপনাকে। এখন হাতে পেলে সোজা নেকড়ের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেবে ও।'

'নেকড়েগুলো মরে গেছে।'

'মরেনি, শুধু বেহুঁশ হয়েছে। গ্যাস দিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছে ওগুলোকে।'

ছটফট শুরু করল ওয়াল্ট। চোখে আতঙ্ক। 'ছাড়ো আমাকে! জলদি ছাড়ো! নেকড়েগুলো জেগে উঠলে...'

'উঠতে দেরি আছে। বলুন এখন, আপনি চোর, না কিডন্যাপার?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ওয়াল্ট, 'আমি চোরও নই, কিডন্যাপারও নই! নকার চুরি করেছে তোমাদের জিনিসগুলো। নকার ফেলসন। আমি একটিবারের জন্যেও এ বন ছেড়ে বেরোইনি। বেরোতে দেয়া হয়নি আমাকে। পালানোর চেষ্টা করেছি, নেকড়ে লেলিয়ে দিয়েছে বিরিডি, ঠিক ধরে এনেছে আবার আমাকে।'

'নকার কে? লাল চুলওয়ালা লোকটা?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। আপনারা দুজনেই পেশাদার চোর। কিডন্যাপার।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল ওয়াল্ট। 'আমি চোর নই। ওরাই চোর। আমি একজন শিকারি, ফাঁদ পেতে জানোয়ার ধরে চামড়া বিক্রি করি। এটা আমার পেশা।'

'বনের মধ্যে ছাউনিটা তাহলে আপনার?'

'হ্যাঁ। একদিন নকার আর বিরিডি এসে হাজির হলো আমার কাছে, নানা ভাবে পটানোর চেষ্টা করল। আমাকে ওদের দরকার। কিছুতেই যখন রাজি হলাম না, ভয় দেখিয়ে আমাকে ওদের হয়ে কাজ করতে বাধ্য করল।'

'কি ভয় দেখাল?'

চুপ হয়ে গেল ওয়াল্ট।

'কথা বলছেন না কেন? বিরিডির কাছে ফিরে যেতে চান?'

'দোহাই তোমাদের, আমাকে ছেড়ে দাও,' ককিয়ে উঠল ওয়াল্ট। 'আমি কিছু বললে আমাকে খুন করে ফেলবে বিরিডি।'

'আপনি যে আমাদের বলেছেন, কি করে জানবে? আমরা বলব না ওকে।'

সরাসরি কিশোরের চোখের দিকে তাকাল লোকটা। বিশ্বাস করা যায় কিনা বোঝার চেষ্টা করল বোধহয়। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমার একটা মেয়ে আছে, স্কুলে পড়ে। আমাকে ভয় দেখাল, আমি যদি ওদের হয়ে কাজ না করি, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে এমন জায়গায় পাচার করে দেবে, জীবনে আর ওর মুখ দেখতে পাব না আমি।'

রবিন আর মুসাকে ওয়াল্টের হাত ছেড়ে দিতে ইশারা করল কিশোর। 'আপনাকে দিয়ে কি কাজ করায়?'

ছেড়ে দিল মুসা। ওয়াল্টকে ভয় দেখানোর জন্যে পকেট থেকে ছুরিটা বের করল।

আড়চোখে ওটার দিকে তাকাল ওয়াল্ট। 'শুরুতে যখন এল ওরা, মূলত গাইডের কাজ করাত। ওরা বিদেশী। এ বন চিনত না, চেনাটা ওদের দরকার ছিল, সে জন্যে আমাকে কাজে লাগিয়েছে। আমার কুঁড়ে আর ছাউনিটাও ব্যবহার করেছে। এখনও আমার কুঁড়েতেই বাস করে নকার।'

'আপনি কি ছাউনিটাতে থাকেন?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াল্ট।

'তাহলে বিছানা ব্যবহার করেন না কেন? ওগুলো দেখে তো মনে হয়েছে, কেউ থাকে না ওখানে।'

'ওরকম করেই রাখতে বলেছে বিরিড়ি, যাতে তোমরা বোঝো ওখানে অনেক দিন কেউ বাস করে না।'

'ও, আমরা যে এসেছি, প্রথম থেকেই জানেন তাহলে।'

'হ্যাঁ।'

পরিষ্কার হয়ে গেল কিশোরের কাছে, এই লোকই ওদের অদৃশ্য বন্ধু। 'এখন বুঝেছি। প্রথমে আমাদের সাধারণ লোক ভেবেছিলেন, মনে করেছেন পিকনিক করতে এসেছি। রাতের বেলা মেসেজ রেখে এসে আমাদের ভাগাতে চেয়েছিলেন, বিরিডির নির্দেশে। তারপর নকারের কাছে যখন জানলেন আমরা গোয়েন্দা, সাহায্য পাওয়ার সুযোগটা লুফে নিলেন। মুসার ছিপ ফেলে এসে বোঝালেন, চোরাই মালগুলো কাছাকাছিই আছে। কোথায় আছে, সেটা বোঝালেন গাছের গায়ে চিহ্ন দিয়ে রেখে। বিরিডির কেবিনেই আছে জিনিসগুলো, তাই না?'

'না। চিহ্ন দিয়ে দেখাতে চেয়েছি চোরের সর্দারটা কোথায় থাকে। মালগুলো আছে অন্য জায়গায়।'

'কোথায়?'

চুপ করে রইল ওয়াল্ট।

'কোথায়? বলুন?'

জবাব দিল না ওয়াল্ট।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, পিকআপে যে ছিল ওসব জিনিস, নকার জানল কিভাবে?'

গাল চুলকাল ওয়াল্ট, খসখস শব্দ হলো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে, 'নকার আর ডুয়েন সেদিন কপসন হার্ডঅয়্যারে গিয়েছিল একটা ছিপ কেনার জন্যে, তোমাদেরই কোন একজন,' মুসার দিকে তাকাল সে, 'সম্ভবত তুমি, সেলসম্যানের সঙ্গে গপ মারছিলে, রাইফেলগুলোর কথা বলছিলে। সবই শুনতে পায় ডুয়েন, তখনই ঠিক করে ফেলে চুরি করবে ওগুলো। বনে বাস করে তো, ক্যাম্পিঙের জিনিসগুলো নেয়ার লোভ সামলাতে পারেনি ওরা। ওগুলো বয়ে আনার জন্যে নৌকাটাও নিয়ে এসেছিল। কাজ শেষ হলে ভাসিয়ে দিয়েছে ওটা।'

এ সব তো কিশোর আগেই সন্দেহ করেছে। তাকাল মুসার দিকে।

চোখ নামিয়ে ফেলল মুসা। সত্যিই সেদিন হার্ডঅয়্যারের দোকানে অনেক কথা বলেছে সেলসম্যানের সঙ্গে। লোকটার সঙ্গে পরিচয় আছে ওর। রকি বীচের লোক। মাঝে মাঝে কেন যে এত বেশি কথা বলে ফেলে! ভেবে এখন নিজের ওপরই খিচড়ে গেল মেজাজ।

বেশি কথা বলতে গিয়ে জিনিসগুলো খুইয়েছে মুসা, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। 'ডুয়েন কে?'

'বিরিডির দলের লোক।'

'দেখতে কেমন?'

'আমার চেয়ে সামান্য লম্বা, গোলগাল চেহারা।'
'মেয়েমানুষ সাজলে কেমন লাগবে?'
কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে ফেলল ওয়াল্ট, 'তুমি কি করে জানলে?'
'জবাব দিন।'
'একেবারেই কিছু বোঝা যায় না. মনে হয় মেয়েমানুষই।'
'হুঁ।'
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। দুজনেই বুঝে গেছে পত্রিকা অফিস থেকে বেরোনোর পর সেদিন যে মহিলা ওদের পিছু নিয়েছিল, সে আসলে মেয়েমানুষ নয়, ছদ্মবেশী ডুয়েন।
ওয়াল্টের দিকে ফিরল কিশোর, 'এবার বলুন তো, গর্তের ওপর ডালপাতা দিয়ে ঢেকে আমাদের জন্যে ফাঁদটা তৈরি করেছিল কে? আপনি?'
'না, বিরিডি।'
'কেন?'
'সে চায় না, এদিকের বনে কেউ আসুক,' রবিনকে দেখাল ওয়াল্ট। 'ওকে দেখতে পেয়ে নেকড়েটাকে ছেড়ে দিল তাড়া করার জন্যে। ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে ও পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। তোমাদেরকে আসতে দেখল সে। বুঝল, একে খুঁজতে এসেছ তোমরা। কায়দা করে তখন গর্তে ফেলে দিল তোমাদেরও, যাতে তোমরা ভাবো, এদিকের বনে নানা রকম বিপদ ওত পেতে আছে, ভয় পাও। তাহলে আর কখনও আসতে চাইবে না।'
'ইস্পাতের ফাঁদটা পাতারও তাহলে একই কারণ?' জানতে চাইল রবিন।
'হ্যাঁ। আমার কাছ থেকে নিয়েছিল ওটা।'
মুখ বাঁকাল মুসা। 'শয়তানি বুদ্ধিতে মগজ ঠাসা ব্যাটার! গুলি করে কবুতর মেরেছে কে? আপনি?'
'না, সে-ই। একই কারণ, তোমাদের ভয় দেখানো। বোঝাতে চেয়েছে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে বন্দুকও আছে…'
এই সময় বেজে উঠল সাইরেন। কেবিনের দিক থেকে এল শব্দটা। একবার বেজে থেমে গেল।
'সাইরেন তাহলে বিরিডিই বাজায়,' বিড়বিড় করল কিশোর, ওয়াল্টের দিকে তাকাল, 'কেন, বলুন তো?'
'দলের লোককে আসতে ডাকল। বনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ওরা। সাইরেন শুনলে এসে জড়ো হয় কেবিনে।'
ওরা চলে আসার আগেই চোরাই মালগুলো উদ্ধারের আশায় বলল কিশোর, 'একটা কথা কিন্তু এখনও বলেননি, আমাদের জিনিসগুলো কোথায়?'
'বলতে পারি, এক শর্তে, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। কোথায় মাল রাখে, কোনখান থেকে পাচার করে, সব দেখাব।'
'এখনই ছেড়ে দেব, সে কথা দিতে পারি না, আগে বুঝতে হবে আপনি কতটা সত্যি বলছেন। তবে ব্যথা দেব না এটা বলতে পারি। মুসার একটা বদভ্যাস আছে,

হাতে ছুরি থাকলে হাত সুড়সুড় করে ওর, মানুষের আঙুল কাটতে ইচ্ছে করে…'

দেঁতো হাসি হেসে বিশাল হান্টিং নাইফটা নাড়ল মুসা। সিনেমায় দেখা বিকৃত মস্তিষ্ক এক খুনীর অনুকরণে ছুরির ফলাটায় আদর করে হাত বোলাতে লাগল, ভঙ্গি করল, যেন ওটা ওয়াল্টের ওপর ব্যবহার করতে পারলে কতই না খুশি হবে।

কেঁপে উঠল ওয়াল্ট, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো, দেখাচ্ছি।'

মুসার অভিনয় দেখে পেট ফেটে হাসি আসছে কিশোরের। কোনমতে চেপে রেখে বলল, 'পালানোর চেষ্টা করবেন না। কখন যে পিঠে ছুরি বিঁধবে আপনার, টেরই পাবেন না। পাবেন, যখন মাটিতে পড়ে গিয়ে কাতরাতে শুরু করবেন। বিশ ফুট দূর থেকে ছুরি দিয়ে পাখির চোখ গেঁথে দিতে পারে ও।'

'না না,' দু'হাত নেড়ে বলল ওয়াল্ট, 'আমি পালাব না! সত্যি বলছি!'

উনিশ

বনের ভেতর দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এগোল ওয়াল্ট। শ'খানেক গজ যাওয়ার পর থামল। সামনে কতগুলো বড় বড় ঝোপ। সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'ওর ভেতরে আছে।'

'তোমরা দাঁড়াও, ওকে পাহারা দাও,' দুই সহকারীকে বলল কিশোর, 'আমি দেখে আসি।'

সাবধানে ঝোপের ভেতর ঢুকল সে। বলা যায় না, যে কোন ধরনের ফাঁদ পাতা থাকতে পারে। তেরপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কিছু। উঁচু স্তূপ হয়ে আছে। তেরপল সরাতেই দেখতে পেল, রাইফেলের বাক্স, দুটো প্লেনের ইঞ্জিন আর গুলির বাক্স। ক্যাম্প করার সরঞ্জামও আছে কিছু, সব নতুন।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে অন্যপাশে উঁকি দিল। বেশ খানিকটা জায়গার ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কিছু একটা আছে সেখানে। সবুজ তেরপল দিয়ে ঢেকে তার ওপর ডালপাতা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এমন ভাবে, যাতে চট করে চোখে না পড়ে।

কয়েকটা ডাল সরিয়ে তেরপলের এককোণ ধরে টান দিল সে। বেরিয়ে পড়ল মাটিতে পোঁতা একসারি আলো। কুঁচকে গেল ভুরু। হেলিকপ্টারের ল্যান্ডিং ফিল্ড তৈরি করা হয়েছে।

রাতের বেলা সাইরেন বাজার রহস্য পরিষ্কার হয়ে এল। একবার বাজালে দলের লোকেরা বোঝে, কেবিনে আসতে হবে। জরুরী আলোচনা আছে। দু'বার বাজালে হেলিকপ্টারের পাইলট বোঝে, কপ্টারটা নিয়ে আসতে হবে। প্লেনের যন্ত্রাংশ, ইঞ্জিন, অস্ত্র, আর গোলাবারুদ চুরি করে এনে বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। রাতের বেলা সেগুলো পাচার করে দেয়া হয় হেলিকপ্টারের সাহায্যে, সাগরে অপেক্ষমাণ কোন জাহাজে।

হেলিকপ্টারটা খুঁজে বের করতে হবে এখন, ভাবল সে। আরও কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু পেল না ওটা। মুসার ট্রাক থেকে চুরি যাওয়া মালগুলোও

দেখতে পেল না। ফিরে চলল মুসারা যেখানে অপেক্ষা করছে, সেখানে।

ঝোপ থেকে বেরোতেই চোখের কোণ দিয়ে মুসাদের পেছনে একপাশের একটা ঝোপে নড়াচড়া দেখতে পেল কিশোর। কিন্তু সাবধান করার আগেই ভীষণ ভাবে নড়ে উঠল ঝোপটা, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল তিনজন লোক, সবার হাতে পিস্তল। দুজনকে চিনতে পারল, সেই লাল চুল লম্বা লোকটা, নকার; আর অন্যজন গোলগাল চেহারার ডুয়েন। তৃতীয় লোকটা অচেনা। বেঁটে, বাদামী চামড়া, এক পা টেনে টেনে হাঁটে। এই লোকই ব্ল্যাক ফগ, পত্রিকা অফিসে নোট রেখে এসেছিল, আন্দাজ করল কিশোর।

'বেঁধে ফেলো ওদের,' আদেশ দিল ফগ। ওয়াল্টকে দেখাল, 'এই বেঈমানটাকেও বাঁধো। ইচ্ছে করলে দু'চার ঘা লাগাতেও পারো, কিছু বলব না।'

অনুনয় শুরু করল ওয়াল্ট, 'দোহাই তোমার, ফগ, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি কিচ্ছু বলিনি ওদের! একটা বর্ণও না!'

'চুপ!' দাঁত খিঁচিয়ে ধমক দিল ফগ। 'বেঈমানীর মজা টের পাবে শীঘ্রি।' সঙ্গীদের বলল, 'কষে বাঁধো এগুলোকে, য ..ত ছুটতে না পারে।'

তিন গোয়েন্দা আর ওয়াল্টকে গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। এগিয়ে এসে টেনেটুনে দেখল ফগ, ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা। দেঁতো হাসি হাসল তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে। 'অন্যের কাজে নাক গলানোর মজা এবার টের পাবে।'

এই সময় এল বিরিডি।

তাকে দেখেই মিনতি করে বলতে লাগল ওয়াল্ট, 'আমাকে ছেড়ে দিতে বলো, বিরিডি, দোহাই তোমার। সত্যি বলছি, একটা কথাও আমি বলিনি ওদের…'

'চুপ!' খেঁকিয়ে উঠল বিরিডি। 'ছুঁচো কোথাকার! ভেবেছিলে, পালিয়ে বেঁচে যাবে। নেকড়ে দিয়ে খাওয়াব আমি তোমাকে।' গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে ধমকাল, 'তোমরাও বুঝবে মজা। বলেছিলাম না, এদিকে ছোঁক ছোঁক করতে এসো না। শোনোনি। এখন বোঝো মজা।…ফগ, বোরডক মেসেজ পাঠিয়েছে…'

বাধা দিল ডুয়েন, 'এখানে এই ছেলেগুলোর সামনে বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'এদেরকে মরা ধরে নিতে পারো। মরা মানুষের সামনে যা খুশি বলা যায়। বোরডক জানিয়েছে, আজই মাল তোলা শেষ করতে হবে।'

'কোন গোলমাল?'

'হ্যাঁ। কোস্ট গার্ড। সন্দেহ হয়েছে ওদের। নজর রাখছে ইয়টের ওপর।'

'মাল তো তোলা হবে সন্ধ্যার পর। এতক্ষণ কি করব?'

'অপেক্ষা। আর কি।'

'এখানে?'

'না, কেবিনে। এ বনে আজই আমাদের শেষ রাত। এখানে আর থাকা যাবে না, সর্বনাশ করে দিয়েছে এই ছেলেগুলো।' কঠোর দৃষ্টিতে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল বিরিডি। 'বাঁচতে তো পারবে না শেষ পর্যন্ত, আমাদের একটা বড় রকমের ক্ষতি করল আরকি।'

'আপনি আমাদের মারতে পারবেন না,' মুখ খুলল কিশোর। 'ভাববেন না,

আমরা একা এসেছি...'

খিক-খিক করে হাসল বিরিডি, 'তা ভাবছি না। জানি, আরেকজন আছে। তবে সে কোন সাহায্য করতে পারবে না, তোমাদের আগেই ধরা পড়ে বসে আছে। বেঁধে রেখে এসেছি কেবিনে।'

মিস্টার সাইমন ধরা পড়েছেন! ভেতরে ভেতরে চমকে গেল কিশোর। তবে মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখল। 'ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। তাঁকে আপনারা ধরতে পারেননি, ভাল করেই জানি।'

হেসে উঠল বিরিডি, 'না, জানো না। ধরা পড়েছে সে।'

'মিথ্যে কথা।'

পকেট থেকে গ্যাস-গানটা টেনে বের করল বিরিডি, 'এটা চিনতে পারো?'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কিশোরের। রবিনের মুখ কালো। দমে গেছে মুসা। ছাড়া পাওয়ার শেষ ভরসাটুকুও শেষ। সত্যি তাহলে এই বনের মধ্যে অপঘাতে মরতে চলেছে ওরা। কি ভাবে মারবে? নেকড়েগুলোর হুঁশ ফিরলে ওগুলোকে লেলিয়ে দেবে ওদের ওপর?

মরিয়া হয়ে বলল কিশোর, 'কিছুই করতে পারবেন না আপনারা। পুলিশ আসছে।'

'ভাল কথা মনে করেছ তো,' খিকখিক করে হাসল বিরিডি। 'তোমরা বাঁধা রয়েছ, দু'তিনটে নেকড়েকে তোমাদের এখানে পাঠালেই হবে, কাজ সেরে ফেলতে পারবে। পুলিশ এত তাড়াতাড়ি আসবে বলে মনে হয় না। যদি আসেও বাকি নেকড়েগুলোকে ছেড়ে দেব ওদের ওপর। ওদেরকে ব্যস্ত রাখবে, এই সময়টায় সরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাব আমরা।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর, তারপর বলল, 'হুঁ, আর কোন আশা নেই, বুঝতে পারছি। দয়া করে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

'কি প্রশ্ন?' ঘড়ি দেখল বিরিডি। 'খানিকটা সময় এখনও আছে আমাদের হাতে। মরার আগে কৌতূহলী করে রাখব না আর তোমাদের।'

বিস্ময়কর এক কাহিনী শুনল গোয়েন্দারা। ব্ল্যাক ফগ, বিরিডি, নকার, ডুয়েন, সবাই বিদেশী। ব্ল্যাক ফগের আসল নাম সেজউইক স্টোকস। সেন্ট্রাল আমেরিকার লোক। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করছে ওখানকার এক সন্ত্রাসী নেতা। সে জন্যে প্রচুর টাকা, আর অস্ত্র দরকার তার। বিমানও দরকার। আস্ত বিমান চুরি করা খুব ঝামেলা, তাই যন্ত্রাংশ আর ইঞ্জিন জোগাড় করে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে তার দলের লোকেরা। বডি জোগাড় করে নিয়ে পরে জুড়ে নিলেই আস্ত বিমান পেয়ে যাবে। সরাসরি কিনতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন, তাই বিভিন্ন কোম্পানির অসৎ লোককে ঘুষ দিয়ে চুরি করানোর ব্যবস্থা করছে। অস্ত্র আর গোলাবারুদও চুরি করছে একই কায়দায়। এর জন্যে অনেক টাকার প্রয়োজন। সেটা জোগাড় করছে বিভিন্ন ব্যাংক আর ট্রেজারি থেকে চুরি করে। মানুষ কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ আদায় করা গেলে মোটা টাকা পাওয়া যায়, তাই সে ধান্দাও বাদ দেয়নি।

ডার্ক উডে আস্তানা গেড়েছে দলটা, কারণ এখান থেকে সাগর বেশি দূরে নয়।

বনের ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার চলে যেতে পারে সাগরে, কারও সন্দেহ না জাগিয়ে। বনের মধ্যে চোরাই মাল লুকিয়ে রাখারও সুবিধে। এখানে এনে জমায়। নির্দিষ্ট সময়ে দেশ থেকে জাহাজ আসে। কপ্টারে করে সেই মাল নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলে পাচার করে দেয় স্বদেশে।

জাহাজে করেই নেকড়ে এনে খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হয়েছে। নেকড়ে দেখলে ভয়ে আর এদিক মাড়াবে না লোকে, নিরাপদে কুকাজ চালিয়ে যেতে পারবে, তাই। চমৎকার এই ফন্দিটা বিরিডির মাথা থেকে বেরিয়েছে।

'বনের মধ্যে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ কেন হয়েছিল বুঝতে পারছি এখন,' কিশোর বলল। 'বাক্সে মাল বোঝাই করার সময় পেরেক ঠোকা হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন বুঝলাম না।'

'তোমাদের মত আমাদের কাছেও সাউন্ড ডিটেক্টর আছে,' জবাব দিল বিরিডি। 'তোমাদের আসার শব্দ পেয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, এখন কবুতরগুলোর কথা বলুন ' প্রশ্ন করে জবাব পেতে পেতে দ্বিধা চলে গেছে কিশোরের, একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে, 'প্রথম কবুতর যেটা আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায় গিয়েছিল?'

'মেকসিকো সীমান্তে। ওখানে আমার এক ভাই থাকে।'

'দ্বিতীয় কবুতরটাকে চুরি করিয়েছিলেন নকারকে দিয়ে, তাই না, যাতে আর ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা পিছু নিতে না পারি?'

মাথা ঝাঁকাল বিরিডি, মুখে সন্তুষ্টির হাসি। আবার ঘড়ি দেখল। 'কৌতূহল মিটেছে আশা করি। মরার জন্যে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের, তার আগে বোধহয় নেকড়েগুলোর ঘুম ভাঙবে না। চলি তাহলে, গুড বাই।'

দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল বিরিডি।

চিৎকার করে ইনিয়ে বিনিয়ে তার করুণা ভিক্ষার চেষ্টা করতে লাগল ওয়াল্ট।

ফিরেও তাকাল না বিরিডি বা অন্য কেউ। গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিশ

পশ্চিম দিগন্তে গাছের আড়ালে নেমে গেল সূর্য। ডুবে যেতে আর বেশি দেরি নেই। অন্ধকার হয়ে যাবে খানিক পর। তারপর কি ঘটবে আর ভাবতে চাইল না তিন গোয়েন্দা।

বাঁধন খোলার অনেক চেষ্টা করেছে ওরা। সামান্যতম ঢিল করতে পারেনি দড়ি, টানাটানিতে মাংসে চেপে বসেছে আরও। হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষে। টনটন করছে জায়গাগুলো।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে ওয়াল্ট। এখন প্রলাপ বকছে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে যেন ওর। গোঙাচ্ছে, আবোল-তাবোল যা খুশি বলছে। বোঝানোর চেষ্টা করেছে ওকে কিশোর আর রবিন। মুসাও নানা ভাবে ওকে শান্ত করার চেষ্টা

করেছে। পারেনি।

গাছে গাছে পাখির কলরব। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলো লালচে-সোনালি রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে গাছের মাথায়। কিন্তু অপরূপ এই সৌন্দর্য দেখার মত অবস্থা নেই এখন গোয়েন্দাদের।

যতই কমে আসছে দিনের আলো, ভয় পেতে আরম্ভ করেছে ওরাও। যে কোন মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে নেকড়ের দল। নেকড়েদের মানুষ আক্রমণের যত রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী জানা আছে, সব একে একে ভেসে উঠতে লাগল মনের পর্দায়। কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারল না সেগুলো।

অন্ধকার হয়ে এল।

হঠাৎ ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। তারপর আরেকটা। ভয়ঙ্কর ওই ডাক। যে কোন মুহূর্তে এখন ছেড়ে দেয়া হতে পারে ওগুলোকে।

বুক কেঁপে উঠল গোয়েন্দাদের। ওয়াল্ট তো মাথা এলিয়ে দিয়ে এমন ভঙ্গি করল, যেন মরেই গেছে।

ঠিক এই সময় বনের নীরবতা খানখান করে দিয়ে বেজে উঠল সাইরেন।

ঝট করে মাথা তুলল কিশোর। সাইরেন বেজেছে। হেলিকপ্টারটা আসবে এখনই। কোথায় নামবে ওটা? নিশ্চয় ঝোপের মাঝের ওই খোলা জায়গাটায়। ওখান থেকেই তুলে নেবে বিরিডি আর তার দলকে।

সাইরেন থামার মিনিট বিশেক পর হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল। কয়েক মিনিট পর গাছের মাথা ভেদ করে বনতলে এসে পড়ল সার্চলাইটের তীব্র আলোকরশ্মি। নামার জায়গা খুঁজছে হেলিকপ্টারটা।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিরিডি আর তার সঙ্গীরা। দৌড়ে গিয়ে সরিয়ে ফেলল সবুজ তেরপলটা। সুইচ টিপতে জ্বলে উঠল বাতিগুলো। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

এগিয়ে এল হেলিকপ্টার। খোলা জায়গাটার ওপরে এসে স্থির হলো। ঝুলে রইল যেন কয়েকটা সেকেন্ড, তারপর ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল। রোটরের বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় ডালপালা আন্দোলিত করতে করতে নেমে এল মাটিতে।

রোটর বন্ধ হলো না। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল কেবিনের দরজা।

বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নিচু করে দৌড় দিল বিরিডি আর আর তিন সঙ্গী। কাছে গিয়েই থমকে গেল।

অবাক হয়ে দেখল তিন গোয়েন্দা, হেলিকপ্টারের পেট থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে নামলেন গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন আর কয়েকজন অস্ত্রধারী, হেলমেট পরা পুলিশম্যান।

উদ্যত পিস্তল তুলে হুমকি দিলেন ডিটেকটিভ, 'এক পা নড়বে না কেউ!'

বোবা হয়ে তাকিয়ে আছে বিরিডি আর ভুয়েন। মাথার ওপর হাত তুলতে শুরু করল নকার। আচমকা পকেটে হাত ঢুকিয়ে টান মেরে পিস্তল বের করে আনল ফগ। সার্চ লাইটের দিকে তুলল।

কিন্তু গুলি করার আগেই লাফ দিয়ে এগিয়ে এল একজন পুলিশম্যান। হাতের পিস্তল দিয়ে ধাঁ করে বাড়ি মারল ফগের চাঁদিতে। হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে গেল

লোকটার। টলে উঠল শরীর। মাটিতে পড়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল পুলিশম্যান।

কিছু করার সাহস করল না আর বাকি তিনজন। নীরবে ধরা দিল। হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো ওদের।

কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সাইমন, 'ছেলেগুলো কোথায়?'

তিন গোয়েন্দা আর ওয়াল্টকে মুক্ত করতে মিনিটখানেকের বেশি লাগল না। হাত-পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে ওদের। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বসে পড়ে ডলতে শুরু করল দড়ি কেটে বসা জায়গাগুলোতে।

বন্দিদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার। ওয়াল্টকেও সঙ্গে নিল। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে বেচারা। থানায় নেয়ার আগে ওর চিকিৎসা করতে হবে। তিন গোয়েন্দা আর দুজন পুলিশম্যানকে নিয়ে রয়ে গেলেন সাইমন। হেলিকপ্টারটা গিয়ে তাঁদেরকে নেয়ার জন্যে পুলিশের কপ্টার পাঠিয়ে দেবে।

সাইমন বললেন, 'চলো, ল্যারিকে মুক্ত করে আনি। আমার ধারণা বিরিডির কেবিনে আটকে রাখা হয়েছে ওকে।'

কেবিনের দিকে রওনা হলো ওরা। আগে আগে চলল মুসা, হাতে একটা চার্জার ল্যাম্প। ভয়ে ভয়ে রয়েছে, কখন কোনদিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেকড়েগুলো। খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দিয়ে এসেছে কিনা কে জানে।

'একেবারে সময়মত এসেছেন, স্যার,' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল মুসা। 'আমরা তো ভাবছিলাম, নেকড়ের পেটেই যেতে হবে।'

'আপনি ছাড়া পেলেন কি করে?' জানতে চাইল রবিন।

'ধরাই পড়িনি আমি।'

'মানে?'

'নেকড়েটাকে গুলি করে মেরেই দৌড় দিলাম বিরিডির কেবিনের দিকে। বেড়ার বাইরে লুকিয়ে বসে রইলাম। ওর সঙ্গের লোকটা দৌড়ে চলে গেল, তোমরা গেলে পেছনে, আমি বসে রইলাম চুপচাপ। কেবিনে ফিরে এসে রেডিওতে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করল বিরিডি ওর কথা থেকে জানলাম, হেলিকপ্টারটা লুকানো আছে নরিস ফার্মের গোলাঘরে। ল্যারি কংকলিনের সঙ্গে দেখা করলাম...'

বাধা দিল মুসা, 'ল্যারি কংকলিন! ওকে কোথায় পেলেন?'

হাসতে লাগল কিশোর, 'বনের মধ্যে প্লেনটা খুঁজে না পেয়ে মনটা খুঁত-খুঁত করছিল। কোস্ট গার্ডও যখন সাগরে খুঁজে পেল না ওটা, সন্দেহটা বাড়ল। তারপর বাড়িতে আপনার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, ল্যারির কথা একটিবারও উচ্চারণ করলেন না। শিওর হয়ে গেলাম, ও কোথায় আছে জানেন আপনি।'

'কোথায় আছে?' মিটিমিটি হাসছেন ডিটেকটিভ, 'মানে, কোথায় ছিল?'

'আপনার আশেপাশেই কোথাও, ছদ্মবেশে। আপনাকে চিনে ফেলেছিল স্মাগলাররা; গোপনে কাজ করতে পারছিলেন না আর, শেষে তাই একটা চালাকি করলেন, কায়দা করে গায়েব করে দিলেন ল্যারিকে। আকাশে উঠে একটা মিথ্যে মেসেজ দিয়ে প্লেন নিয়ে উধাও হয়ে গেল সে, আপনার পরামর্শে। অখ্যাত কোন

বিমান বন্দরের ছাউনিতে ওটা লুকানো আছে এখন। প্লেন রেখে ছদ্মবেশে ফিরে এল ল্যারি, আপনাকে সাহায্য করার জন্যে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন ডিটেকটিভ, 'আমি জানতাম, সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও তোমাকে পারব না, ঠিক ধরে ফেলবে। যাই হোক, দুপুরে আমরা যখন বাড়ি থেকে বেরোলাম, সেও আমাদের পিছু নিয়েছিল বনের মধ্যে সারাক্ষণ আমাদের অনুসরণ করে এসেছিল সে। বিরিডির কথা শোনার পর তাকে গিয়ে সব কথা জানালাম। স্মাগলারদের হাতে ধরা দিতে বললাম। পিস্তল আর গ্যাস-গানটা দিয়ে দিলাম সঙ্গে রাখার জন্যে, যাতে ধোঁকা খায় বিরিডি, ভাবে ল্যারিই গুলি করে মেরেছে নেকড়েটাকে, বাকিগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। যে এ কাজ করেছে তাকে ধরে ফেলতে পারলে আর সাবধান হবে না ওরা, তখনই পালানোর চেষ্টা করবে না। এই সুযোগে আমি গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসতে পারব।

'যত তাড়াতাড়ি পারলাম চলে গেলাম শিপরিজে। ওখান থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করলাম। পুলিশ আসতে তাদের নিয়ে চলে গেলাম নরিস ফার্মে। সাইরেন বাজার অপেক্ষায় রইলাম। সাইরেন বাজতেই গোলাঘরে ঢুকল ওদের পাইলট। পিস্তল দেখিয়ে তাকে এখানে হেলিকপ্টার আনতে বাধ্য করল পুলিশ।'

'ইয়টটার কি খবর?' জানতে চাইল রবিন।

'কোস্ট গার্ডকে খবর দেয়া হয়েছে। সন্দেহজনক গতিবিধির জন্যে আগে থেকেই ওটার ওপর চোখ রাখছিল ওরা। এতক্ষণে আটকে ফেলা হয়েছে নিশ্চয়।'

কেবিনের কাছে পৌঁছল ওরা। ঘুম ভাঙতে আরম্ভ করেছে নেকড়েগুলোর। জ্বলজ্বলে চোখে তাকাচ্ছে আলোর দিকে। খোঁয়াড়ের দরজা লাগানোই আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা।

বিরিডির কেবিনেই পাওয়া গেল ল্যারিকে। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে মাটিতে।

মুসা গিয়ে ছুরির কয়েক পোঁচে কেটে দিল তার বাঁধন।

উঠে বসে হাত-পা ডলতে শুরু করল ল্যারি। 'নেকড়েগুলোর কি অবস্থা? খুলে দিয়েছে নাকি?'

'কেন, খুলে দেয়ার কথা ছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ল্যারি, 'বিরিডি বলে গেল, দুটো নেকড়েকে ছেড়ে দিয়ে যাবে আমাকে খাওয়ার জন্যে।'

তিক্ত হাসি হাসল মুসা। 'সবাইকে একই কথা বলে ভয় দেখিয়েছে। নেকড়ের ভয়ে কাবু হয়ে থেকেছি আমরা, আর ও মনে মনে হেসেছে। ব্যাটা বদমাশ!'

***

ভলিউম ৪৫

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০